

KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGR 2007	Place of Publication : ৫৪ নম্বর ১০৬ নং, ১৫-১৬
Collection : KLMLGR	Publisher : শ্রী ১২১৫
Title : ৬০০২	Size : 7" x 9.5" 17.78 x 24.13 cm.
Vol. & Number : ৫০/১ ৫০/২	Year of Publication : ১৯৯৯-১৯৯৯ ১১ Aug 2000 ১৯৯৯-১৯৯৯ ১১ Dec 2000
	Condition : Brittle : Good ✓
Editor : ১৯৯৯ ১৯৯৯	Remarks :

C. D. Poll No. : KLMLGR



জুগুপ্সা

কলিকাতা পিটল ম্যাপারজিন লাইব্রেরি

বর্ষ ৬০ সংখ্যা ১ বৈশাখ-আষাঢ় ১৪০৭

সংস্করণ

৯/এম. ট্যামার সেন্ট, কলকাতা-৭০০০০৯



সঞ্জয় ভট্টাচার্যের একশাটি অপ্রকাশিত কবিতা-ভূমি স্তম্ভ গৃহ-...
ভূমিকা সহ।

আসন্ন দেশবিভাগ পর্বে বাঙালি মুসলিম জীবনধারার স্বরূপ-
সম্প্রদায়ী গৌরবশোভার ঘোষের ত্রয়ী 'জল পড়ে পাতা নড়ে',
'প্রতিবেশী' এবং বিশেষ করে 'প্রেম নেই' উপন্যাসটি নিয়ে
ড. বিজিতকুমার দত্তের অনুপস্থিতি বিচার।

'বাংলা উপন্যাসে স্বল্পালোকিত অন্য এক সমাজ' নিবন্ধে
অধ্যাপিকা বন্দনা রায় প্রশ্ন তুলেছেন, শহরবাসী আধুনিক
মধ্যবিত্ত বাঙালি মুসলমানের জীবনচিত্র রচনায় লেখকদের
অনাগ্রহ কেন?

ধারাবাহিক 'আলোছায়ায় পথিক': মুম্বাই থেকে কলকাতা
এসে তাপস সেনের বাংলা থিয়েটারের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার
প্রসঙ্গ এবং নাট্যক্ষেত্রে আলোকসম্পাতে নব নব উদ্ভাবনের
রোমাঞ্চকর দিনগুলির কথা।

সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত-র ধারাবাহিক 'বঙ্গসংহার এবং': এই
কিস্তিতে ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের মুখ্যমন্ত্রীদের সূচনাপর্ব।
গণতন্ত্রের উচ্চ আদর্শের বিকৃতির রূপরেখা ড. রেণুকা
বিশ্বাসের রচনায়।

রবীন্দ্রচর্চায় সজনীকান্ত দাসের বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়ে সম্ভব-
জন্মশতবর্ষে শ্রদ্ধাধ্যা।

'কবিমানসী' নতুন করে পড়ে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
স্বতন্ত্র অভিমত।

চেতনা-র 'তিস্তা পারের বৃত্তান্ত' সমালোচনায় ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি

With Best Compliments of :

Cable : ALMETAPAP

ASSOCIATED TRADERS

MANUFACTURERS * DEALERS * CONTRACTORS

1, NRITYA GOPAL GHOSAL ROAD

ARIADHA, CALCUTTA 700 057.

PHONE : 564-7768 & 564-6284

CITY OFFICE : 244-4283

CALCUTTA * MUMBAI

Please enquire for :

High & Low purity Aluminium Ingots, Alloy Ingots of all descriptions, Notched Bars, Shots, Cubes for Steel Foundries, Gravity & Pressure Die Castings for Electrical & Engineering Industries.



বৈশাখ-আষাঢ় ১৪০৭
বর্ষ ৬০ সংখ্যা ১

অপ্রকাশিত কবিতাপুঙ্খ

ধারাবাহিক সম্বন্ধ

আলোচ্যের পবিত্র

বঙ্গসংসার এবং

এমনভাবে

বিনি-চুত কৌতুহ

এই পদ্য—রবীন্দ্রনাথ

অমর

সামাজিক

বিকল্প

অপেক্ষা

বৃহল শিশি

শৌর্যকিশোর ঘোষের ত্রুটি

বাংলা উপন্যাসে স্বাক্ষরিত অন্য এক সমাজ

গল্প

মানুষের কী রইল

কীর্তিমুখ

সাহিত্য সমাজ সংস্কৃতি

সম্মানিকাজের রবীন্দ্রনাথ

ডেমনস্ট্রেশন ও অমরা

ঐশ্বর্যবোধের এক গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা 'বিতা'

প্রবন্ধমালা

স্বদেশ বঙ্গোপাখ্যায়

মুদ্রণ পাল

অভিজিৎ বসু

শক্তিসাধন বঙ্গোপাখ্যায়

মাসিকমালা

চেতনা-র তিন্তা পালের বৃত্তান্ত

মঙ্গল : মল্লিকী চাকী সরকার

চিরপথ

সম্পদ তত্ত্বাবধ

তাপস সেন

সুধরঞ্জন সেনগুপ্ত

নবকুমার মুখোপাখ্যায়

বৌদ্ধপ্রসঙ্গ বঙ্গোপাখ্যায়

বৌদ্ধী রায়

অমিতা অগ্রিহেত্রী

মতি মুখোপাখ্যায়

নীলানন্দ সিংহ

পার্বতীম মল্লিক

সাপ্তিক বৈ

বিক্রমকুমার বসু

বন্দনা রায়

বিক্রমকুমার ঘোষ

শীঘ্র তত্ত্বাবধ

সর্বানন্দ চৌধুরী

গোপিকা বিশ্বাস

সুপ্রভিৎ দাসগুপ্ত

মীরাচন্দ নাহার

মল্লিক দাসগুপ্ত

মেঘ বঙ্গোপাখ্যায়

প্রমোদ মল্লিক

গোপিকা বিশ্বাস

মূল্য : ১০ টাকা

ডাকে : ১৮ টাকা

শিগ্গ পরিচালনা : রঞ্জন আদ্য বসু

প্রথমতী মীরা রহমান কর্তৃক ইন্ডোপেন হাউস, ৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা-১

থেকে মুদ্রিত এবং ৫৪ গণেশচন্দ্র আর্টস্ট্রিট, কলকাতা-১০ থেকে প্রকাশিত

অক্ষা বিনায়েক— নয়া উদ্যোগ, ২০৬ বিধান সঙ্গি, কলকাতা-৬

মূল্য : ২০৭-৩৭৭০

সম্পাদক : আবদুল হক

নূতন সহস্রাব্দকে স্বাগত জানিয়ে
পশ্চিমবঙ্গের বৈদ্যুতিন শিল্পজগৎ নিঃশব্দ
বিপ্লব এনেছে।

দ্রুত পরিবর্তনশীল এই শিল্পক্ষেত্রে
পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্রে এক উজ্জ্বল
তারকার রূপ দিতে আমরা দায়বদ্ধ।

আপনাদের শুভেচ্ছা আমাদের পাথেয়।

ওয়েবেল

ওয়েস্ট বেঙ্গল ইলেকট্রনিক্স ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন
লিমিটেড

ওয়েবেল ভবন, ব্লক : ইপি ও জিপি, সেক্টর-ফাইভ
বিধাননগর, সল্টলেক, কলিকাতা-৭০০ ০৯১

ফোন : ৯১-৩৩-৩৫৭-১৭০২/০৪/৭৫৬৫, ফ্যাক্স : ৯১-৩৩-৩৫৭ ১৭৩৯/১৭০৮

সঞ্জয় ভট্টাচার্যের অপ্রকাশিত কবিতা

“পুরনো লেখা থেকে”

১.

ঘর থেকে বারান্দায় এলে
মনে হবে আসবাব থেকে পেলে ছুটি,
দু'একটি পাখীর আকাশে।
এক দিন ভালোবেসেছিলে
পড়বে হয়তো তা-ও মনে
ঘর থেকে বারান্দায় এলে
আকাশের খুব কাছাকাছি।

২.

তাকালেই সব-কিছু আছে :
ঘর-বাড়ি, গাছ।
কিছু আমি তাকতে জানিনে,
তাই শূন্য শূন্যতাই দেখি :
কেউ নেই, কিছু নেই এমন শূন্যতা!
তুমি এসে দাঁড়ালে কেবল
শূন্যখন পূর্ণ হয়ে যায়।
তখনই তাকতে যেন জানি।

৩.

দুপুরের দুম ডেও হঠাৎ দাঁড়ালে মুখোমুখি।
তোমার হৃদয় শাড়ি রোদে যেন বৃষ্টি হয়ে গেল।
তোমার নিটোল শ্বন, কটিতট, উরুর বিখার
স্পষ্ট প্রতীক্ষায়।
দুম কি ভেঙে নি তবে, আমি
তোমার যে-দুমে?

৪.

শিশুর কাছেই যেতে হয়
কেমনা সে পৃথিবী চেনে না।
পৃথিবীকে ভুলে যাওয়া খুব দরকার,
ভুলে যেতে যেতে হয় শিশুর কাছেই।
শিশুর কাছেই জানা যায়
সময় যে কতক হতে পারে।

৭. কালো-কোনো সন্ধ্যা যেন মোটেও সন্ধ্যার মতো নয়:

কাজ তীক্ষ্ণ করে পর-পর
আলো হ'লে ওঠে মুখে-মুখে
লেনদেন চলল।
মনেই হয়না রাত্রি হবে নিয়মিত
এবং যে যার ঘরে যাবে।

৬.

মেয়েরা অন্ধার দিয়ে হেসে উঠেছিল।
বেগমগোড়ার ডাল বেড়ে অমি ফুলগুলো খরিয়ে বিলাল।
লুপচাপ সব।
তারপর সন্ধ্যা হয়ে এলো।
মেয়েদের ছায়া শূন্য শুক বারান্দায়।
আলো স্বলল না।

৭.

দুয়ার কি বন্ধ রাখা যায়?
তুমিই বাইরে থেকে কড়া বেড়ে যাবে,
তুমিই ভেতর থেকে খুলবে দুয়ার।
দুয়ার ভাঙে না কেউ, খোলে ॥

৮.

বাতিগুলো নিখিয়ে দিলেও
হলে ওঠে, আর
সে-আলোতে সব অন্যরকম দেখায় :
যেন এই মধ্য মুত্তা হল
আমার এবং তুমি যেন
ঘরে এলে মুত্তা থেকে কিরে ॥

৯.

ঘটনা ঘটে না।
আধা-আধা ঘটে যায় বা-কিছু তা চকিত চোখেই।
অবশ্য তাতেই নুরু হতে পারে দুশাত ঘটনা।
কিছু কিছু শূন্যই হয় না।
হয়েতো বা চোখের শিকড়
পাতা বেড়ে মাটিতে নামে নি ॥

১০.

কিছুতেই বাঁচনা গেল না
দিনকে সন্ধ্যার হাত থেকে।
ভালোবাসা শূক হতে না-হতেই স্মৃতি।
সেই আলো আর আসবে না।
আলো চাইলেই আলো তোমার হয় না
না-চাইলেও অন্ধকার তোমার বিষয় হতে থাকে ॥

১২. মাঘ ৬০তম বঙ্গাব্দ

১১.

তুলে গেলে ফুলের বাগান
জীবনের শোভা আর নেই কোনাখানো।
এমন কি করডোর কিশোরীও হয়তো হঠাৎ অশোভন,
অশোভন উল্লসিত শিশু।
প্রাণের প্রথম শোভা তদগত এখনো
ফুলের বাগানে।

১২.

আলো হলো এক?
আলো যদি, নিক্ষেপে কি দেখতে পেতে না?
দেখতে কি পাও?
পাও না। বরা অন্ধকারে
মাঝে-মাঝে ভাবা যায় আছে :
অন্ধকারে বুঝ অন্ধকার হয়ে আছে ॥

১৩.

বা-কিছু করি না,
কারো যেন মানা থাকে কিম্বা অসন্তোষ।
সে আমার সম্পদে সৃষ্টি না,
যশে না, প্রেমে না।
আমাকে নিঃসঙ্গ করে সৃষ্টি,
যেন এক নিঃসঙ্গ কুয়াশা ॥

১৪.

ঘর থেকে বাইরে যাবার
পথ আছে, পথ নেই কিরে আসবার।
যানক্ষেত্রে, বাড়ি, লেন-শব্দের মতো
পথ দেখাবার চিন্তা নেই।
শূন্য এক শিতানী নদী
পারাপার হওয়া যা যায় না ॥

১৫.

মৃত ভালোবাসাগুলো যখন ফিরে আসে।
যন্ত্রণের জীবনে তারা সব অভিমানী।
অভিমানী যেন মুত্তা হয়েছিল বলে।
তথ্য যখন ছুঁতে যাই
জীবনের উন্মত্ত তাসের শরীর,
আবার তাদের মুত্তা হয় ॥

১৬.

যে-স্বকতা গান হয়ে ওঠে,
নক্ষত্রে-নক্ষত্রে হলে উঠি;
সে-স্বকতা এলো না জীবনে।
মুত্তার স্বকতা শূন্য কান্না :
শ্রেন শব্দ আকাশে গড়িয়ে
যে-স্বকতা আসে ॥

১৭.

রৌদ্রে কমা নেই:
পাণের কন্ডাল সব মুখ তুলে গেরে।
বুবতীরা রৌদ্রে বীড়াও
তোমাঘের সাহায্য আছে কি?
বুবকেরা-তোমাঘের?
একটি নিম্পাশ মুখ দেখে যেতে চাই ॥

১৮.

শ্মিতিকই ভালোবাসা যায়।
'সেনিন তুমিও শ্মিত হবো...'
তোমার গুণ্ডা মুক নিয়ে বলেছিলো তোমাকে:
'যেনিন তুমিও শ্মিত হবো'
সমস্ত শ্মতির মতো উন্মত্ত হয়ে বেবে মুক।
হয়েতো সেনিনই ভালোবাসব তোমাঘ।

১৯.

সোফা তাকালেই ভালো লেগে যেতে পারে :
এমন কি নন্দমণ্ড হেলেলেকার
কাগজের নৌকা ডাসানার সেই নদী।
সোফা তাকালেই হেলেলেকা
গাছের পাতাও
ফুলের মতোই ভালো লাগে ॥

২০.

কী ছুঁয়ে ডায়েতে পারো, আছে?
আছে তুমি আকাশের নীচে,
মাটিতে পা রেখে,
আছে সব সময়ের সুতোয় জড়িয়ে?
শূন্য এক ভালোবাসা ছুঁয়ে,
তা হাড়া কোথাও তুমি নেই ॥

২১.

সকালের কড়ি হাসি বিকলে ছড়িয়ে দিয়ে গেলে
বালিতারা এসে।
তারপর সন্ধ্যা হলই বা—
অমগ্নিন সন্ধ্যা তারপর।
এবং রাত্রিও তার অভিসন্ধি তুলে
সহজ সকাল হয়ে যাবে ॥

সঞ্জয় ভট্টাচার্য (৪.২.১৯০৯-৪.২.১৯৬৯) পরলোকগত হলে তাঁর অপ্রকাশিত এবং অপ্রতিষ্ঠ রচনার যে সামান্য সঞ্চয় আবিষ্কৃত হয়েছিল, তা প্রথমত ছিল তাঁর আকেশ্যের তুমচীবাচাঙ্গী বন্ধু সত্যপ্রসন্ন গুপ্তার কাছে, এবং তারপর তা হস্তান্তরিত হয়ে যায় তাঁর সর্বাধিক প্রিয়ভাজন জ্যোতীর্ষী শ্রীমতী ইলা ভট্টাচার্যের কাছে; এই যে তাঁর একশটি কবিতার গুচ্ছটি এখানে প্রকাশিত হল, তা হতে পারার শ্রীমতী ভট্টাচার্যের সৌজন্য-এবং অনুমতিক্রমে। কবিতাগুলি সঞ্জয় ভট্টাচার্য Principal প্রভেদের একটি ১৯২-পৃষ্ঠার ৬-নম্বর বাঁধানো রুল-না-টানা সাপা পাতার এক্সারসাইজ খাতায় খুব যত্ন করে তুলে রেখেছিলেন, খাতাটির এক থেকে তিন পৃষ্ঠায়। মূলপত্রের পৃষ্ঠায় দু'বার নিজের স্বাক্ষর লিখেছেন, এবং পেনসিলে লিখেছেন Cal-19 selected Poems; Sadhana 80/1 Kankulia Road Cal-10—এই টিকানাটিও লেখা আছে কলিতে। যে-একশটি কবিতার গুচ্ছ প্রকাশিত হল, তার নামও তাঁর দেওয়া : 'পুরনো লেখা থেকে'। কবিতাগুলি এর আগে প্রকাশিত হয়েছিল কি না বলা শক্ত; একেবারে অস্তিত্ব বহুরের লেখা, না হওয়ায়ই কথা; হলেও, কবিতাগুলি যেহেতু মূল পাত্তালিপি থেকে নেওয়া, তাই তাদের প্রকাশযোগ্যতা সূচ্য হচ্ছে না।

আমরা যখনই অনেক-অনেক বার সত্যপ্রসন্ন দত্তর নিকট সঞ্জয় ভট্টাচার্য সম্বন্ধে কথাবার্তা বলতে গিয়েছি, তিনি, যে-কোনও কারণেই হোক, গভীর অনীহা প্রকাশ করেছেন, এবং আমাদের জ্ঞানতে দিয়েছেন যে ইলা ভট্টাচার্যের কাছে সঞ্জয় ভট্টাচার্যের রচনাপত্রের কোনও অংশটি সঞ্চয় থাকলেও থাকতে পারে, তাঁর কাছে নেই। ইলা ভট্টাচার্যের সঙ্গে বৈয়াকরণে এই এত দিন হতে পারল, অমলেন্দু চকবর্তীর মধ্যস্থতায়, এবং সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর ঐকান্তিক সহযোগিতা অর্জিত হল, ভাষ্য বলতে হবে। এই প্রগাঢ় বিব্রী, কঠিন জীবনসমগ্রী এবং গভীর ধর্মপ্রাণা ১৯৮৮-এ বাসন্তী দেবী কল্লেকের অমায়িক হিসাবে সসম্মানে অবসর গ্রহণ করার পরে সম্ভবলক উপগম্যীর একটি ছোট আত্মনায় একক শব্দ জীবন যাপন করছেন; তাঁর সিদ্ধিহাস সঞ্জয় ভট্টাচার্যের অস্তিত্ব জীবনের লেখার কিছু নির্দেশ আমাদের দেখতে পাওয়ার সৌভাগ্য

অর্জন করলাম।

সঞ্জয় ভট্টাচার্যের কবিতাচর্চার ধারাক্রমে নামা রকম বাক্যপরিচয় আছে; একটা পর্বে তাঁর কবিতা বেশ দুরারোগ্য হয়ে উঠেছিল পুণ্ডিতহাস্য আশ্বদশন প্রচলিত সাহিত্যপ্রকৃতি ও ছন্দপ্রকরণ সাধারণ প্রলম্বিত ছায়াপাতের অপ্রাণীয়ভাবে; তবু, মূলত, তিনি লিরিক কবি, এবং প্রেমই তাঁর কবিতার প্রধান অবলম্বন, যে-প্রেম তথা তার পাত্রী একই সময়ে তাঁর প্রবল আকর্ষণ ও বিকাশের বিষয়, তা তাঁর বিশিষ্ট জীবনযাপনক্রিয়ায় সঙ্গে বুঝে মেলে। তিনি তাঁর সমকালে বাংলা কবিতার প্রধান লিরিক কবিতাকর্মী বলে স্বীকৃত হয়েছিলেন, তা তো তাঁর গুণ্যগ্রাণী ব্যয়োজ্ঞেষ্ঠ কবিতার বয়ানে আমরা বার-বারই শুনছি। তাঁর প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকাশিত বই কবিতার, এবং পরবর্তী অনেক বই-ই, যে-সব কবিতা বিশুদ্ধ লিরিক কবিতা, এবং প্রায়শই প্রেমের ক্ষীণ চম্ভালকিত ও সমুদ্রবেলায় সেনাপুত্র-সিক্ত; তাঁর কল্পনামি-স্পর্শরোমাঙ্কিত মৃত্যুর সময়ের প্রায় সমকালীন এই কবিতাগুলিও প্রায় তাই; মধ্য কালের বোম ও প্রবীণ অভিজ্ঞতাসঞ্চারী রোহিত্যপঞ্জারিত সীলিত পরিভ্রমের অবসাদে যে নির্লিপ্ত ও সুসম চ্রান্তিনে নিঃশব্দ বেলা এসে পড়ার কথা, সেই জ্ঞাত ও অজ্ঞাত সীমার মিলনবিমুগ্ধ এই সব কবিতাগুলিকে দেখে দিতে গিয়ে তিনি তাঁর সুম্যমজ্জিত কবিতাবলয় সুস্পন্দিত করেছেন, বলা যায়।

সঞ্জয় ভট্টাচার্যের ও তাঁর 'পূর্বকথা'র সব চাইতে ভাল সময়ের তারা উভয়েই যে-বাড়িতে থাকতেন, পি-১৬ ও গণেশচন্দ্র অভিষ্য, কলিকাতা, সেই বাড়িতে তখন, এবং এখনও, 'চতুর্দশ' পত্রিকার অফিস থেকে গেছে, যদিও সেনোজ পত্রিকার কর্মীদের আসা পালটেছে। সেই সময়ে এই দুই পত্রিকার অবস্থান ছিল পারস্পরিক পরিশূব্রকের মতো, এবং সঞ্জয় ভট্টাচার্য 'চতুর্দশ'-কর্মকর্তাদের অপ্রতুলতা ছিলেন বলেই আপত্তি উত্থাপন কথা নয়। খুবই সুসমত হল যে তাঁর বহুদূর বিগ্নিষ বহুর পুরে পুনরাবিষ্কৃত সঞ্জয় ভট্টাচার্য 'চতুর্দশ' পত্রিকায় সর্বপ্রথম প্রকাশিত হতে পারলেন।

ভূজেন গুহ

ধারাবাহিক আলাচনা

আলোছায়ার পথিক

তাপস সেন

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

১৪৭ সালের শেষের দিকে আমাকে আমার এক বন্ধু, প্রয়াত সুলীল বন্দ্যোপাধ্যায় একটা চিঠি লেখে, কলকাতায় চলে আয়, বহুতে পড়ে আছিস কেন? কলকাতায় অনেক কাজের সুযোগ আছে...ইত্যাদি। তখন কলকাতায় পেশাদার বন্ধুই কাজ হচ্ছিল বেশি। থিয়েটারপাড়ার পুরনো হলগুলি আমাকে আকর্ষণ করত ধূল-জীবন থেকেই। তাই কলকাতায় কাজ করবার আকাঙ্ক্ষা আমার ছিলই। দু'ব থেকে-কলকাতার থিয়েটারের কত কথা শুনছি। শুনছি নাট্যনিকেতন আর শিশির ভাদুড়ির কথা, রত্নমহল আর সত্য সেনের কথা। এরকম আরও অনেকবই কথা শুনছি, জেনেছি। পাণ্ডুরামদেবের চৈতন্যে না পেরে শিশির ভাদুড়িকে সেই শ্রীরম্বল ছেড়ে চলে আসতে হয়েছিল। ওখানে আমি 'মাইকল', 'সীতার' মতো প্রচলনা দেখছি; যদিও তখন ছিল ওই প্রতিভার অল্পমিত পরিণতির সময়। সেই শ্রীরম্বল ছেড়ে চলে গেলেম শিশির ভাদুড়ি, ছলে যাবার পরের দিন মত্রে মাধ্যমে তাঁকে বিশ্বরূপায় চহনা করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি আসেননি। নরেন্স দিত্র আমার সামনেই বলেছিলেন, 'তুই আয় তোকে ওরা যথায়ো সন্মান দিয়েই রাবে'। কিন্তু তিনি সম্মত হননি। বলেছিলেন, 'শ্রীরম্বল আমার দোয়া নাম।' এই নাম কাউকে দেবনা এবং অন্য কোথাও, অন্য কারও কাছে গিয়ে আমি দাখল করতে পারব না।' এই ঘটনার সাক্ষী টেলিফোনের অপর প্রান্তে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। এই সময় হাতবদল করে শ্রীরম্বল হয় বিশ্বরূপ। এই বিশ্বরূপতেই আমি প্রথম পেশাদার মঞ্চে কাজ শুরু করি।

কিন্তু এর আরও অনেক জায়গায় ঘুরেছি কাজের জন্য। রত্নমহলের প্রতি আমার একটা দ্বন্দ্বীত ছিল; এটা সেই রত্নমহল যেখানে সত্য সেন এদেশীয় উপকরণেই তৈরি করেছিলেন

রিজলিভি স্টেজ, করেছিলেন আধুনিক আলোর ব্যবস্থা। 'বিশ্বপ্রিয়া' নাটক করেন, 'মহানিধা' করেন, 'বহুভব রাস্তা' প্রযোজনা করেন। আসলে তখন আমার কেবলই মন হত, ভাল করে কাজ করতে হলে, যে কোনও একটা স্বাধীনমত পাশাপাশিতাবে যুক্ত হওয়া দরকার। তাই এ মঞ্চ থেকেও মঞ্চে কাজের জন্য ঘুরে বেড়াতাম। রত্নমহলে আমি দেখতে এসেছিলাম 'রামের সুমতি'। দেখতে আসার মূল কারণ, ওই প্রযোজনা সত্য সেন ছিলেন, ছিলেন বুদ্ধমেন মিশ্র, যাকে 'ভজরার' ছবিতে দেখেছিলাম একটা ছোট ছেলের ভূমিতে। সেখানে একটা ছবি বলত সে 'সোমোথর ডাকের/ভারি নামডাক্তার...'। তার নাম শুনে একটা আকৃষ্ট হয়েছিলাম। নাটকের টিকিট কিনতে গিয়ে একটা অবাক হয়েছিলাম, বুড়ি কলকাতার সত্য সেনকে সব থাকতে দেখে। আর পেস্টারের ছোট করে দেখেছিলাম একজনর নাম; দেবনারায়ণ গুপ্ত। নাট্যরূপ দিয়েছেন তিনি। শরৎচন্দ্রের অনেক বই তখন পড়া হয়ে গেছে; সেনোভাও কৃষ্ণিণ পড়েছি। রামের সুমতি ছেলেবেলায় পড়ে ভাল লেগেছিল। সব মিলিয়ে নাটকটা দেখার একটা অগ্রহ জন্মেছিল। তাই নাটকটা দেখতে গিলাম। পরে দেবনারায়ণবাবুর কাছ থেকে জেনেছি সাধারণ রঙ্গালয়ে ওটাই তাঁর প্রথম নাট্যরূপ।

সালটা ছিল, ১৯৪৪। ওই বছরটা নানাভাবেই গুরুত্বপূর্ণ আমার কাছে। ওই বছরেই 'নবান' প্রযোজনা হয়, ওই বছরেই মিনার্ডায় আমি শ্রীনি সেনগুপ্তের 'মাতৃবিদ্রাব' নাটক দেখে মুগ্ধ হই। বিশেষত সেটা আমার খুব ভাল লেগেছিল। নানা ছোটের কাগজ দিয়ে সেটা তৈরি করা হয়েছিল; কেবলমাত্র একটা জানালা দিয়ে ভাঙমহলে দেখা যাচ্ছিল; সাজাহানকে নিয়ে হয়েছিল নাটকটা। এই ত্রুণারি সাহায্যে মঞ্চসজ্জার অভিনব

একদিন নিয়ে গেল প্যারাডাইসে কাজের আড্ডায়। প্রায় সকলেরই পকেট পড়েছে মার্চ। সকাল থেকে এককাল কি বড়জোর দু-কাল চা নিয়ে ভিন্নভাগ দাঁড়া থাকবে কাটা। একটা সময় প্যারাডাইসে কাজের মাঝে ফেমুণ্ড বিসম বন্ধনে টেনেছিল থেকে উঠতেন আর অমরাও কৃতজ্ঞতা আমদেরও উঠতে হবে। ওটা ছিল সিঁদাল। সেই আড্ডায় নিমিত্তি ছিলাম আমি, মৃদাল আর শব্বিক। মৃদাল পার্শ্ব সার্কাল থেকে হেঁটে আসত। শব্বিক হলি মৃদালী রেডে ওর দানা মৃদীর মাটিকের বাড়ি থেকে আসত আর আমি হাজার পার্শ্বের একটা মেয়ের ভার্কসে থাকতাম। কারন, ওই ঘরে বিশেষ স্টেড থাকতে চাইতাম না। তাহলে আমার সুবিধা ছিল, আমার লাইটের জিনিসপত্র ঘরের ভেতরে রেখে দিতে পারতাম।

প্যারাডাইসে কাজেতে তখন অনেককেই আসতেন। বিজন উড্ডাম্ব, নুনেস গান্ধু, বন্দী চন্দ্রগুপ্ত, উৎসল দত্ত, সলিল চৌধুরী, শাদু দাস, কালী যান্নালী এরকম অনেককেই। আর মাধ্যয় তখন কিসলি করছে নাটক আর সিনেমা। আমদের মধ্যে সিনেমার ব্যাপারে ছবি আর শব্বিকই অভিজ্ঞ। ছবি নিয়ে দিলিট্রোস্টে কাজ করছে আর শব্বিক বিমল রায়ের সঙ্গে 'ডাবলি' এবং নিমাই ঘোষের 'হিম্মত' ছবিতে কাজ করছে; মৃদালও কিছু কিছু কাজ আক্স করেছেন। অবশ্যে অনেকের পকেটেই তখন সিনেমা ভেরির খোঁজটা থাকত। একবার টিক হল, ধুলিয়ায় এক প্রোডিউসারের কাছে যাওয়া হবে। সবাই মিলে চিনা তুপে আমার আর মৃদালকে উপর দাড়িহি মিলে মিলে ধুলিয়া যাবার। সেই টিকা নিয়ে আমি আর মৃদাল সিঁদাল স্টেশনেও গেলাম। কিন্তু ডিকি দেখে আর কী গেলান হলে কানি না, অমরা আর গেমাম না। শব্বিকের ঘোষাল বদা জেনেও নাগে না। এই রকমই ব্রুপ দেবার দিন ছিল সেগুলি। বিজনা মায়ে মায়ে এসে নতুন নতুন আইডিয়া দিত। অনেক বললেন, একটা ছাপানো সন্ডে, একটা সিনেমা নিয়ে গিয়ে চলবে, আমি মাঝপথে থামিয়ে বললাম, 'অকস্মেৎ নী হলে দেখাবেন কী করে?' উনি বললেন, 'করবি'। আমি বললাম, 'ও'!

শব্বিক মায়ে মায়ে গেল শোনাও; তবে ওর নাটকগুলিই আমাকে আকর্ষণ করত। হঠাৎ একটা নাটক নিয়ে এল। ওর ভাবনার মধ্যে বেশকিছরের ছাড়া অরহৎ ছিলত। কোনও ও আর সত্যজিৎ রায় প্রেনে কর ওপার বাঙালয় ঘাছিল কেনও একটা অতীতনে যোগ দিয়ে। পুনর্জি, ওপর থেকেই যখন ওপার বাঙালয় মাঠগাট দেখতে গেল তখনও হাউসটি করে কেঁদে ফেলেছিল। একসময় অবশ্য গেল ওর। বেশকিছরা নিয়ে একটা নাটক লিখল 'দিলি'। সেখানে একটা গ্রাম দেখানো হয়েছিল, যে-গ্রামে সব সম্প্রদায়ের লোককেই সুখেখুশি কবাস করত। তারা দেশজাতির দিন সম্ভার প্রেভিও মারতক জানতে পারল, এই গ্রামটি পড়ছে পূর্ব পাকিস্তানে। তখন তাদের দিলার অবস্থা, দিলেদের মারাজি,

কলহান সব ছেড়ে ছলে আসতে হয়েছিল, এসে প্রথমে উল্ল শিয়ালদায়। কলকাতায় তখন লারি-পুলি-ট্রায়ারগাস চলছে। সেই অবধিই অবধাটা ওর নাটকে মুচিয়ে তুলল। সেই নাটকটা অনেক জাগ্রায় অভিনয় হয়েছে। সেই নাটকটি ব্যবহৃত আই.পি.টি-এর সর্বভারতীয় সম্মেলনে আমদেরকে পেল। অমরা গেলাম। গিয়ে তো চোখ ছানাবাদ। এদীওটি ডি সিলতা মূল মালের বিরাজ মক আর প্রচুর আলোচনা অবধা। এই আলো তখনও পর্যন্ত চোখে বেগিনি। এত কাজে লগ্যাব কি করে? কিন্তু লোগেও সমালোচনা পারার না। ওখনকার একজনকে বললাম, পন্যারটের গেলোটা শাওর যাবো। হিন্ডুসনসের ডাকা। সেই ড্রাম ব্যাকসনে একজন 'ড্রামবন্দক'। গেরে গেলাম। নাটকের আগে সেটা একটা মিউজিকের সঙ্গে সানা পর্দায় আলোতে ফেললাম আর একটা আতুল নাড়ুলায় কিছুক্ষণ আলোর সামনে। কী করলাম জানি না, কিন্তু করে ফেললাম। অত্যাৎ হলাম, সবাই যখন দারুল হয়েছ বলে এই বের উল্ল। শিন্ধনের সানা পর্দা আর তখনো আলো কাজে লগ্যাবার জন্যই নাটকের পুরুত সানা পর্দা একটা প্রায়ের আলো মুচিয়ে তুলতে চাইলাম। গাছালা, গ্রামের বাড়ি, মন্দির, মসজিদ, একটু একটু করে রাত কেটে গিয়ে ভোর হয়েছিল। সঙ্গে মণ্ডি ঘোষের গানের, আজনের শব্দ সব মিলিয়ে যখন পদ্য ভেসে উল্ল তখন বেশি মাত্রায় প্রায় হাজার দশক লোক হাততালি দিয়ে উল্ল; একেবারে বদা বদা করে উল্ল, নাটক তখনও পুরুই যিনি, শব্বিক বলল, কী করলি গান্ধু! আমি বললাম, আমি কী করলাম! তোর সকল ছিল সকাল করলাম। বিমল রায়, বলরাজ শাহসনি সহ অনেককেই ছিলেন। যাই হোক, সেদিন তো শো হল। কিন্তু তিন ডিভায়ড আর একটা সো কবাস প্রস্তুত এল। আমার তাত অমৃবিধা, কার্য কলকাতায় অন্য একটা কাজের কথা কেওয়া ছিল। তাই বললাম, আমি থাকতে পারার না। তখন নিরঞ্জন সেনা বললেন সানা পর্দা একটা সো কবাস প্রস্তুত এল। আই.পি.টি-এর সর্বভারতীয় সম্মেলন সম্পন্নক ছিলেন। নিমারত বংগেরদের কাজ করতেন; তাঁকে তো এখন কেউ মনেই রাখে না। তিনি কবি শৈলেশ্বর কাছ থেকে ঢাকা এসে আমার সঙ্গে রেনে ফেরার ব্যবস্থা করেছিলেন। ওটাই আমার প্রথম প্রেনে যাত্রা। শৈলেশ্বরকে নিরঞ্জনলাই এলাহাবাদ থেকে এনে বংগেতে সেউল করিয়েছিলেন। বুৎ নাম ডাক ছিল শৈলেশ্বর। সেই স্টেজলেনে ডাডতরফের নানাপ্রান্তরে প্রযোজনা এসেছিল, কিন্তু শৈলেশ্বর সন্মান প্রেরেছিল 'দিলি'। অনেক পরে শব্বিকের আর একটা নাটকে কাজ করতাম। সেটা ব্যহতে। গোলকির গল্প অবশ্যন 'মৃদালসের কী লিখে', শূদ্রশেখ রায় আট ডিকেরট ছিলেন আর কলকাতা থেকে আমি গিয়েছিলাম আলো করলাম। বলরাজ শাহসনি নায়কের ডুমকিয়ার ছিলেন। একটা মার 'শো' হয়েছিল।

তখন শূদ্রশেখ রায়ের সহকারী ছিলেন দেশ মুখালী। পরে

তিনিও বিখ্যাত আট ডিকেরটর হন। যখন বংগেতে শান্ত্যারামের কাজ করছি তখন দেশে মুখালী গভর্টা বলেছিলেন, সকালের দৃশ্য দেখাবার জন্য আমি শিট বেলে কাটাছি তখন দেশ নাকি ভেবেছিল, একী রে বদা! শিটবেল কাটার জন্য প্রেনে করে লোক অনন্তে হল, কলকাতা থেকে।

শব্বিক পরে বংগে হয়ে গিয়েছিল। একদিন হঠাৎ ওর সঙ্গে বয়ে এরায়শাট দেবা। দু'জনেই বয়ে থেকে কিরছি। আমি খোলা তরিকি। শব্বিকই শিটে একটা খাঙ্ক মেয়ে বলল, 'ভল শালা, আজ ভকে একটা গল্প শোনাও।' প্রেনে বংগেই একটা চিনামটা শোনা। শুনতে শুনতেই মনে হল, দারুণ শুনতে গিয়ে ঘনি একটু বমদাম হই বা কিছুনি আসে তা হলেই শিটে চড় মেয়ে দিয়ে বংগে, 'এই শালা ঠিক করে শোন।' সেই ছবির নাম 'জুটি তকো গরো'। এই ছবিটাও সত্যজিৎ ঠিকই কিছু মারা যাবার পর ছবিটা রিলিজ করেছিল। সত্যজিৎ রায়ের পথের পাঁচালির অনেক ছবিই কিছু 'নাগরিক' করেই শব্বিক সাজা ফেলে দিয়েছিল আমাদের হলেন। মনে আছে, কত মায়াবিনটি পেরিয়ে যারনাম করে দিয়েটা শেষ করেছিলেন। অনেকেরা তো কাজ বন্ধ হয়ে বিরোহিত, ভূপতি নন্দী, সন্নীয়ার দত্তরা অফিস থেকে টাকা ধার করে, বাড়ি বন্ধক রেখে ছবিটা টাকা দিয়েছিল। পরে 'অখ্যাতি' ছবির জন্য টাকা দিয়েছিলেন প্রথমে লাইটি। একসঙ্গে ডিনটে ছবি করলেন তিনি।

সত্যজিৎ রায়ের 'পরশপাথর', তপন সিনহার 'লৌহকপাট' আর শব্বিকের 'অখ্যাতি', সুবোধ ঘোষের গল্প। কালী যান্নালী, জ্ঞানেশ মুখালী, কারাণ গুপ্ত সব ছিলেন। 'অখ্যাতি' ছবিটি রিলিজ করার আগের দিন ভাঙা জগদম্ব মোটর গাড়িটি বসুঠী সিনেমা হলেন ঘুরে তুলে আলো করার দায়িত্ব আমাকে দিয়েছিল শব্বিক। 'অখ্যাতি' দেখে তো আমরা মুগ্ধ। তাকে বললাম হলে লোক হয় না। রোজই আমি আর শব্বিক হাজার মোড়ে এসে গাঁজতাম। আর শব্বিক বলত 'আজ লোক হলেই কিছু লাভ হবে, এ ছবিতে লোক হবে না।' রোজ দাঁড়িয়ে থাকতাম এই আশায় আর এক আনার কিং স্ট সিগারেট খেতাম আমি আর শব্বিক খেত বিটি। আগে ওর বিড়ির পয়সা মায়ে মধ্যে মৃদাল-আমি শোখ করতাম।

তখন আমাদের ধারাবাকি করাটা নিত্যদিনের ব্যাপার ছিল। টোপারামের ওরা রোডের দোকান থেকে আমাদের কী যেন ডাকা নিয়েছিল। একদিন মৃদাল ওটকেই নিয়ে গেল অমরা, আমি তো থাকোদের সামনাসামনি হয়েই চোঁয়ে উঠলাম, 'ওটকে নয় ওটকে নয় ওটকে চক' বলে গলিতে ঢুকে ছেলেন। আমার গলিতে ঢুকে আর এক বিপদ। 'ওটকে'বান্ধকে খেয়ে খালি ফেরে ওঠে। ওর সঙ্গে বোহয় মহাজন-শাওনারার সম্পর্ক ছিল, ঠিক মনে নেই কিন্তু শাওনা টেনেহিঁকতে অনাবিধে আমাকে নিয়ে ঢুকে পড়ে ভাঙাতাডি। পরে দু'জনে বৃৎ হেসেছিলাম।

খবরের কাগজ নিয়ে আমাদের এক বিপদ ছিল। সেই সময় আমি আর বন্দী-এস. আর. দাস লোকের একটা ছোট ঘরে থাকতাম। যে-খবরের কাগজগুলো কাগজ বিক্রি, সে দিন মাস টালো পাব। আমি আর বন্দী রোজ সকালে কাগজগুলো আসবার আগে ঘর থেকে পালাতাম। একদিন কীভাবে মনে হল, আমরা কাগজগুলোর সামনে পড়ে গেলাম। হা মেনে আগে এবেছিল নড়ে আমরা পালাতে মেরি করেছিলাম। কাগজগুলো ছোরা কাগজ বন্ধ করতে পারহই না, বন্ধ করলে তো আর কাগজ পাবে না। সামনাসামনি পড়া মারাই আমি উল্টে কাগজগুলোর কাছে কুড়ি টাকা ধার চেয়ে বললাম। সে বেলে না। অনেক বন্ধ করে, কালই দিয়ে মেনে বংগে দশটা টাকা ধার চেয়েছিলাম। আমার কাভ দেখে বন্দী অবাক হয়ে বলল, তোর মাধ্যয় এল কি করে? আমি বললাম, জানি না তো। মনে হল করলাম। চার্লি চ্যাপলিনের সার্গান ছবিতে বোহয় এরকম এক মুখা ছিল। এভাবেই চলছি। তখন কিন্তু আমরা ভাবিনি যে সপ্রাম করছি, স্বলন্ত বিল্লব করছি। ভাঙতাম, এভাবেই সব করতে হয়, লিফটাটা একসময়ই তুলারি।

বৃদ্বিনি আগের কথা এসব। প্রায় অনেককেই পুরে অবধা পরামো। কেবল মৃদালদের সঙ্গে এমদও হিরহর আদায় মতো হয়ে গেছি। কলকাতায় দু'জনেই থাকলে প্রায় টেপেলেনে কথি না।

কলকাতায় আসবার পর এই সমস্ত কাজকলানামা হাওয়া অন্য কতগুলি অখ্যাতিভীরদের মধ্যে জড়িয়ে পড়ি, অন্য এক এরায় অফ ইন্টারেস্টের। ডিকি ভাঙতে ভাঙতে তিনটি ঘনতর সন্দের দিলি শাওয়ার যে কর্তৃকলন ফাউন্ডার মেথের ছিলেন তখনও তারই আমিও একজন ছিলি। সেখানে নিরঞ্জন, সেনা, শালা, প্লাস্টা, মৃদাল, বিনোদ মুখালী এসে সব ছিলেন। ঘনি রানীমতি ভাঙে, বংগে ওই টুকুই। কিন্তু কলকাতায় আমি অখ্যাতিভিই একটা বামশরী বলের সঙ্গে মুক্ত হই এমনকী কিছুদিনের জন্য পলিট হয়ে টাকারও হয়েছিল। হ্যাঁ, এস.ই.পি. মানে সোমোমিটি উইনিটি সেটেরের সদস্য ছিলাম আমি। পোটার মেয়েছি রান্ধায়। শিয়ালদা থেকে হাওয়া-পুরো হারিসন রোডে; শামাবাজার থেকে গুলিটো ফোয়ার, রাসবিহুরী এডিনিটি, আতুবেয়া মুখালী রোডে রাতের পর রাত জেগে পোটার মেয়েছি, 'পদলবী' কাগজ বিক্রি করেছি গুলিহাওটে, হাফনা মেয়েছি; হাটোবাজারে কৌটায় করে পয়সা তুলেছি। তখন যে কাকটাই করতাম, তা করতাম অত্যন্ত জেদের সঙ্গে। কাগজ বিক্রি করলে সবায় চেয়ে বেশি বিক্রি করত, পয়সা কলেকশন করলে সবায় চেয়ে বেশি পয়সা তুলত।

একবার পোটার মারতে এসে হাওয়া স্টেশনে বসে থাকা এসে আঠার বালতি উল্টে দিচ্ছিল আর স্টেশনে বিনা প্রয়োজনে থাবার অপর্যাপ্ত পুলিশ কন্সটবল আমাকে ধরে নিয়ে গেল গোলাবাড়ি দানায়। ওই প্রথম আমার হাজতবাস। তারপর আর

বঙ্গসংহার এবং

সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

‘দ্য গুড ম্যান’ পত্রিকার A good man goes সম্পাদকের নিবন্ধের মধ্যেই ড. প্রমুদচন্দ্র ঘোষের পদত্যাগের বিতর্ক সীমাবদ্ধ ছিল না। সে সময়কার বাংলাভাষার প্রকাশিত সবমিতি প্রচারিত সংবাদপত্র ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’ ১৯৪৮ সালের ১৫ জানুয়ারি ‘স্টারফ রিপোর্টার’ পরিবেশিত একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে। ওই রিপোর্টের শিরোনাম ছিল ‘ড. প্রমুদচন্দ্র ঘোষের পদত্যাগ’।

১৭ জানুয়ারি (১৯৪৮) ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’ ড. প্রমুদচন্দ্র ঘোষের পদত্যাগ সম্পর্কে এক দীর্ঘ সম্পাদকের নিবন্ধ প্রকাশ করে। সংশ্লিষ্ট সম্পাদকের এখানে অগাধগাঢ় তুলে দেওয়া হল ড. ঘোষের পদত্যাগ।

‘ড. প্রমুদচন্দ্র ঘোষ গত বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস পার্লামেন্টারী দলের নেতৃত্ব পদ ত্যাগ করেন এবং গবর্নরের দিগন্ত মন্ত্রিমণ্ডলের পদত্যাগপ্রার্থী দাখিল করেন। পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস পার্লামেন্টারী দল ড. ঘোষের পদত্যাগপ্রার্থ প্রহণ করিয়াছেন এবং তাঁহার স্থলে ডা. বিধানচন্দ্র রায়কে দলের নেতা নির্বাচন করিয়াছেন। ডা. রায় দ্বিতীয় ইউনিয়ন সিস্টেমের পদে নিয়োগ নতুন মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিতে আহ্বান করিবেন। নতুন মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত না হওয়া পর্যন্ত বর্তমান মন্ত্রিসভা কাজ চালাইয়া যাইবেন। পশ্চিমবঙ্গ আইনসভায় কংগ্রেস দলের নেতৃত্ব ত্যাগ উপলক্ষে ড. ঘোষ সংবাদপত্রে যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহাতে প্রকাশ, পার্লামেন্টারী দলের ২৫জন সদস্য ১২ই জানুয়ারি ড. ঘোষকে এক পত্র জানান যে, বর্তমান অসুস্থতা ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে মন্ত্রিমণ্ডলের পুনর্গঠন তাঁহারা কামনা করেন। দলের অধিকাংশের অভিপ্রায় অনুযায়ী ড. ঘোষ পদত্যাগ করিয়াছেন এবং নতুন মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হইয়া যাহাতে সাক্ষ্যমানভিত্তি হয় তাহাই

তিনি কামনা করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস পার্লামেন্টারী দল ড. ঘোষের পদত্যাগ পত্র প্রহণ করিয়া সেই সঙ্গে বঙ্গ বিভাগের দল হইতে যে কেউরো প্রম কষ্ট ও উদ্বেগের মধ্যে ড. প্রমুদচন্দ্র ঘোষ পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী এবং দলের নেতা রূপে প্রদেশের সেবা করিয়াছেন, তাহার তৃপ্তি প্রশংসা করেন। এই প্রশংসা দলের অংশীদার প্রাপ্য।

‘মাত্র কয়েকমাস হইল নতুন পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ গঠিত হইয়াছে। ইহারই মধ্যে মন্ত্রিমণ্ডল তিনবার পরিবর্তন ঘটিত। ড. ঘোষ প্রথম মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিবার কিছুদিন পরেই একবার উক্ত মন্ত্রিমণ্ডলের রদবদল হয়। এখন আবার পুনর্গঠন হইবে। নতুন রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া প্রদেশের জনগণের প্রতি গুরুত্বপূর্ণ পালন করিতে হইবে। সেই গুরুত্বপূর্ণ পালনের দায়িত্ব যেমন মন্ত্রিমণ্ডলের তেমনই পার্লামেন্টারী সদস্যগণের। মন্ত্রিমণ্ডলে যান ঘন রদবদল এই পদে পটুভাবে পালনের অনুকূল নহে। সুতরাং অত্যাগরণ যে মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হইবে সেই মন্ত্রিমণ্ডল যাহাতে স্থায়ী লাভ করিতে পারে তাহাই সকলপক্ষে দেখিতে হইবে।

‘প্রদেশের জনগণের অর্থনীতি হ্রাসলাভ হ্রাসের সমস্যা যেমন রহিয়াছে, তেমনই আছে হ্রাসের উৎপাদন বৃদ্ধির সমস্যা। প্রদেশের সম্পদ সৃষ্টি করিতে হইবে, প্রদেশের সীমানার নিরাপত্তা দেখিতে হইবে, অভ্যন্তরীণ শান্তি ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কলিকাতায় ও উত্তর সীমার অঞ্চলে বাসস্থানের অভাব দূর করার প্রশ্ন এতদ্বারা হইয়া উঠিয়াছে। শিল্প প্রসারের সুবিধা পরিকল্পনা, এবং উৎকৃষ্ট কার্যকরী কলার দ্রুতি প্রসার করিতে হইবে, মজির উৎকৃষ্ট শক্তি বৃদ্ধি এবং বন্যা-প্রাধান্য হইতে কৃষিসম্পদ রক্ষার ব্যবস্থা, রাজা-মজা নথ-নিরাপত্তা সাধারণ সাধন, সেচের ব্যবস্থা, ম্যালেরিয়ার প্রচেষ্টা প্রভৃতি পশ্চিমবঙ্গের দায়িত্ব বহন করা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও শিল্পের

প্রসার, প্রদেশের যুগান্তের জন্য সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার সুব্যবস্থা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ পালন করিয়াই মাত্র নতুন রাষ্ট্রকে সমৃদ্ধ ও সমৃদ্ধতা করা সম্ভব। প্রদেশবাসীর দায়িত্ব দুইয়ের অর্থনীতি নাই। দুইয়ের কথাই তাহাদের জীবনব্যাপার মান বুদ্ধি পায় না—ব্যাপার বৃত্তির ব্যবস্থা ও আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের দ্বারা। তাহা সম্ভব হইতে পারে। রাষ্ট্রকে যদি জনগণের প্রতি সম্যক কর্তব্য পালন করিতে হয় তাহা হইলে ব্যয়ক শ্রমিকবিত্তি গঠনমূলক কার্যে আর্থনিয়েয়ন করিতে হইবে। এই কার্য সূচকরূপে সম্পাদ্য করিবার দায়িত্বই মন্ত্রিমণ্ডলের। কিন্তু কোন পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার সময় সুযোগ ও নিরুদ্ভিগ্ন পরিবেশ না হইলে কোন মন্ত্রিমণ্ডলের পক্ষেই কোন পরিকল্পনা কার্যকরী করা সম্ভব নহে। মন্ত্রিমণ্ডলের স্থায়িত্বের অভাব ঘটিলে অমুখ্য সময় শক্তি ও অর্থের অপচয় ঘটিবে। জনসাধারণের বৃত্তান্ত স্বার্থ রক্ষিত হইবে না। ইহারই জন্য আমরা পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস পার্লামেন্টারী দলের সদস্যগণকে তাঁহাদের বিভাগিত ও সমাধিবদ্ধ গুরুতর দায়িত্বের কথা শ্রবণ করানো কর্তব্য বলিয়া মনে করিতেছি।’

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের রাজনীতিতে যখন এই টানাগোড়েন চলছে, তখন দিল্লিতে গান্ধীজি অনশনরত। তাঁর অনশনের কারণ ছিল পাকিস্তান সম্পর্কে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার একটি সিদ্ধান্ত। দেশবিশিষ্ট এবং ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় ১৯৪৭ সালের ২০ জুলাই কমন ট্রেজারী (Common Treasury) সম্পর্কে ভারত ও পাকিস্তানের ভারী সরকার প্রতিনিধিদের মধ্যে একটি হিউ সাক্ষরিত হয়েছিল। ভারতীয় লর্ড মাইটল্যান্ডের সভাপতিত্বে যে ‘দেখবিভাগ পরিষদ’ (Partition Council) গঠিত হয়েছিল, ওই সংশ্লিষ্ট পরিষদের সিদ্ধান্তের ফলেই কমন ট্রেজারী গঠিত হয়। ‘ভিত্তি তারফ’ ছিল এই যে ভারতের রিজার্ভ ব্যাংক একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পাকিস্তানের রিজার্ভ ব্যাংক হিসাবেও কাজ করবে এবং ‘কমন ট্রেজারী’ থেকে পাকিস্তানকে যে টাকা দেওয়া হবে, তা ভারতের রিজার্ভ ব্যাংকই পাকিস্তানকে সরবরাহ করবে। কিন্তু ১৯৪৭ সালের নোভেম্বর-অক্টোবর কালীয়ে পাকিস্তানের হানাদার অভিযান, কালীয়ের ভারতভুক্ত মনোতে পাকিস্তানের স্বত্বাধিকার এবং হানাদার অত্যাচারে রাখার পাঠ্য ব্যবস্থা হিসাবে ভারত সরকার ‘কমন ট্রেজারী’ থেকে পাকিস্তানকে টাকা দেওয়া বন্ধের সিদ্ধান্ত নিরেন এবং তা সঙ্গে সঙ্গে কার্যকর হল।

গান্ধীজি ভারত সরকারের ওই সিদ্ধান্তকে ‘অনিচ্ছক কাণ্ড’ আখ্যা দিয়ে জানুয়ারি (১৯৪৮) প্রথম সপ্তাহে আশ্রয়র অনশন আত্মক করলেন। প্রথম সপ্তাহ ভারত সরকার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে নিরেন চিঠিই। কিন্তু কংগ্রেসের অনশন তাঁর স্বাস্থ্য একেবারেই ভেঙে পড়ল এবং চিকিৎসক হিসাবে ডা. বিধানচন্দ্র রায়কে দিল্লিতে থাকতে হল গান্ধীজির কাছে। বিধানবাবু দিল্লিতে বসে জামেতে গেলেন যে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস পরিষদীয় দল তাঁকেই

নেতা নির্বাচন করে পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী (প্রিমিয়ার) করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তিনি গান্ধীজিকে কংগ্রেস পরিষদীয় দলের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে ২০ জানুয়ারি সকালে কলকাতায় স্থির প্রেরণ করেন।

ওই দিনই বিধানবাবু দুপুরের আগে তাঁর ওয়েস্টমিনস্টার স্ট্রোমের বাড়িতে কংগ্রেস পরিষদীয় দলের সভা ডাকেন। বিদ্যায় মুখ্যমন্ত্রী ড. প্রমুদচন্দ্র ঘোষ ওই সভায় কিছুক্ষণের জন্য যোগ দেন। তারপর ড. ঘোষ দিল্লি চলে যান। ডা. রায়ের বাড়িতে অনুষ্ঠিত সভায় পরিষদীয় দলের অধিকাংশই তাঁকে পরেরদিন অর্থাৎ ২১ জানুয়ারি প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব নিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু ডা. রায় তাঁদের প্রস্তাবকে, ‘সভাস্থানের জটিল ২৩শে জানুয়ারি আমি শপথ নেব তাহাই।’

২২ জানুয়ারি রাজাপাল রাজাগোপালচাঁদী বিধানবাবুকে পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী গঠনের জন্য আত্মক জানালে ওইদিনই বিকাশে তিনি রাজাপালের সঙ্গে দেখা করে অল্প কয়েকজন মন্ত্রীর নামের একটি তালিকা রাজাপালকে দেন। রাজাপালের সঙ্গে দেখা করার পর ডা. বিধানচন্দ্র রায় সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদেশের রাজনীতি ও প্রশাসনিক অত্যা সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন।

ডা. রায়ের এই সাংবাদিক সম্মেলন সম্পর্কে ‘স্টেটসম্যান’ (২৩ জানুয়ারি, ১৯৪৮) পত্রিকা লিখেছে যে সাংবাদিক সম্মেলনের বিধানবাবু বলেন, ‘এতদিন যখন যে স্থির শাসনব্যবস্থা হচ্ছে আসছে তা বিপজ্জনক এবং মারাত্মক। আমাদের এমন দরকার একটি গতিশীল প্রশাসন। এই লক্ষ্যে আমি চেষ্টা করছি কিছু নতুন লোককে মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করান। মন্ত্রণা গান্ধীজির ইচ্ছা অনুযায়ী একটি উৎকৃষ্ট মন্ত্রিসভা গঠন করাই আমার উদ্দেশ্য। আমার ইচ্ছা, আইন সভার সদস্য নানা এবং যারা যোগ্য ব্যক্তি আছেন, তাঁদেরও মন্ত্রিসভায় নিয়ে আসা। আইনটি আমি ডা. প্রমুদচন্দ্র ঘোষকে আমার মন্ত্রিসভায় যোগ্য দিতে অর্পণ করছি। তিনি রাজি হলে সেটা কেবল তাঁরই মহানুভবতার পরিচয়ক হবে না, মন্ত্রিসভাও অনেক শক্তিশালী হবে এবং দেশ মান কলি। ডা. ঘোষ বর্তমানে দিল্লিতে আছেন। আমি তাঁর উদ্ভবের অপেক্ষায় আছি।’

এই সাংবাদিক সম্মেলনে ডা. রায়কে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, মুখ্যমন্ত্রীর সকলের নাম রাজাপালের কাছে স্পষ্ট করতে বিলম্বের কারণ কি কংগ্রেসের গোষ্ঠীত্ব এবং উপলব্ধি (যোগাযোগ) এর উত্তর ডা. রায় বলেন, ‘আমাকে কংগ্রেস দল সম্পর্কিত নেতা নির্বাচন করেছে। আমি কোনও গোষ্ঠীর মধ্যে নেই এবং এমনকি কোনও গোষ্ঠীর দ্বারা আমি পরিচালিত হতে চাই না। এটা স্বীকার করতেই হয়, বাধ্যতাবদ্ধ বর্তমান সমস্যার একটা বঙ্গ বিক ছুড়ে আছে গোষ্ঠীত্ব, ইচ্ছা এবং অবিদ্যায়। আমার মন্ত্রিসভায় যত বেশি সম্ভব যোগ্য মন্ত্রিরাই নিযুক্ত হবেন, যাতে শাসন ব্যবস্থা আরও গতিশীল হয়।’

এটা উল্লেখযোগ্য যে ২২ জানুয়ারিতে ডা. রায় রাজপালের কাছে মন্ত্রীর যে স্মৃতিচিহ্ন তালিকা পেশ করেছিলেন, তাতে তিনি ড. প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষকে তালিকা দ্বন্দ্বের স্থানে ব্রহ্ম ব্রাহ্মদ্বন্দ্বী হিসাবে উল্লিখিত করেছিলেন। বঙ্গ রাজনীতির এই ঘটনার প্রায় ত্রিশ বছর পরে ড. ঘোষ তাঁর 'জীবনস্মৃতি'তে বলেছেন, "ডা. রায় নেতা হয়ে আমাদের তাঁর মন্ত্রিসভায় ব্রাহ্মদ্বন্দ্বী হিসাবে যোগ দিতে অনুরোধ করেন। আমি তাতে রাজি হইনি। আজও মনে হয় ঠিকই করেছিলাম।" (পৃষ্ঠা ১১৩)।

কমরবার রাজনীতি থেকে ড. প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের বিদায় কেবল পশ্চিমবঙ্গের অর্থশাস্ত্রীর নয়, ভারতের জাতীয় রাজনীতির একটি অতি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। তারগ, সত্যভা, কৃষ্ণসাবন এবং সর্বোপরি গান্ধীজির চিন্তার বৈভবের প্রাঙ্গণ থেকে যে সব ব্যক্তির বালার জাতনৈতিক মঞ্চে এসেছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ছিলেন তাঁদের অন্তর্গত। এমন একটি লোকের মুখামুখি থেকে চলে যাওয়ার ঘটনাপ্রবাহের প্রবাহ, ওড়িশা, গুজরাট, মাদ্রাজ, ত্রিপুরার কোমলি এবং উত্তর প্রদেশের কংগ্রেস সংগঠনগুলির বঙ্গীয় এসে আছে পড়ল। ঠিক আড়াই বছর পর এই ঘটনার পরিণতিতেই আচার্য কৃপালিনের নেতৃত্বে কংগ্রেসের জাতীয় বিভাজন ঘটল।

ডা. বিধানচন্দ্র রায় ১৯৪৪ সালের ২৩ জানুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিলেন। নেতাজির জন্মদিনের শ্রুতি নেওয়ার দিন হিসাবে বেছে নেওয়ার মধ্যে সূভাসচন্দ্রের পদ ভা. রায়ের তাঁর মন্তব্যের সঙ্গে মিলেছে রাজনীতিও ছিল। সেই রাজনীতি ছিল নেতাজি-অগ্রজ শরৎচন্দ্র বসুর কাছে টানার চেষ্টা। বঙ্গ রাজনীতিতে সেনাবল্লভ ঘরানার অন্যতম ডা. বিধানচন্দ্র রায় এলগিন রোডের বসু বাড়ির বুড়ি ঘনিষ্ঠ ছিলেন। সূভাসচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর রাজনৈতিক মতামতের কোনও ঘটনার কথা শোনা যায়নি। শরৎচন্দ্র বসুর সঙ্গে ডা. রায়ের ঘনিষ্ঠ ঘনিষ্ঠতা ছিল। কিন্তু ১৯৪১ সালের সূভাসচন্দ্রের মহানিষ্ঠা এবং তার পরবর্তী কালের পাঁচ-ছয় বছরের জাতীয় ও প্রাদেশিক রাজনীতিতে যে সঙ্গম ঘটনা ঘটে, তাতে বিধানবাবুর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের মানসিক দূর থেকে বেড়ে গেছে। এমনকী ১৯৪০ সালের প্রকৃষ্টিতে শরৎচন্দ্র বসুর মৃত্যু পর্যন্ত এই সম্পর্ক বৈরিতার পথেই শেষ হয়। শরৎচন্দ্র বসুর কাছে টানার জন্য ডা. রায়ের চেষ্টা সন্দেহভর অনুপ্রাণিত বিদ্যাত সাহিত্য পত্রিকা 'শনিবারের চিঠি'তে সমালোচনা মত প্রকাশের তাঁর 'সংবাদ-সাহিত্য' কলামে এই চটকি মন্তব্য করেছিলেন, "...বিদ্য বসুকেই বলা চলেও না

যাবে কিন্তু মোরা ভাই ভাই..."।
সেনাবল্লভ মৃত্যুর পর এবং সূভাসচন্দ্রের দীর্ঘ কারাবাসের ফলে ও সর্বোপরি সেনাপ্রিয় বহীরাহেনকে প্রাদেশিক কংগ্রেস নেতাদের সর্বময় ক্ষমতা থেকে দূরে রাখার জন্য বঙ্গ রাজনীতিতে 'বিদ্য

বসু' বা 'পঞ্চ প্রধান' নামে একটি গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। এই পঞ্চ প্রধানরা ছিলেন, শরৎচন্দ্র বসু, বিধানচন্দ্র রায়, কৃষ্ণদ্বন্দ্বী ঘোষাধী, নির্মলচন্দ্র চন্দ্র এবং নরসিংরতন সরকার। এই পঞ্চ প্রধানরা বেশ কয়েক বছর প্রাদেশিক রাজনীতিতে নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন।

বিধান রায়ের সঙ্গে প্রফুল্ল ঘোষের মানসিকতার অনেকগুলি বড় তফাৎয়ের মধ্যে প্রধান একটি হল প্রফুল্ল ঘোষ কংগ্রেস সংগঠনের মধ্যে থেকে নেতার পদে উঠে এসেছেন। কিন্তু বিধানবাবু তা না। কংগ্রেসের প্রাঙ্গণে তাঁর অবস্থা বিস্ময় ছিল। কিন্তু সেটা প্রধানত চিকিৎসক হিসাবে। তাঁর আশাধার এবং বিশ্বাসের চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান জন্য গান্ধীজি তাঁকে খান্না দিয়েছিলেন 'সেফটি হাউস অব ইন্ডিয়া' (Safety House of India)। ১৯২৫ সালের জুন মাসে সেনাবল্লভ মরহেব শিয়ালদহ স্টেশন থেকে তাঁর ভাবনীর পুরের বাড়িতে নিয়ে আসার পর ডা. বিধান রায় যখন বাস্তবী বৈরাগ্য কাছে নিয়ে ধাঁড়ালেন, তখন বাস্তবী বৈরাগ্য নিয়ে কেন্দ্র থেকে বলাগেলেন, "বিধান তুমি থাকতেই না। তুমি চিকিৎসায় চলে পেরো..."। (সেনাবল্লভ স্মৃতি-হেমেন্দ্রনাথ কলগুপ্ত)। ১৯২৫ সালের ২৪ জুন রাত শেষ হওয়ার মুখে শ্যামপ্রসাদের মরহেব তাঁর বাড়িতে শৌচাগার পর বিধানবাবুর যখন গিয়ে তাঁর মা'র কাছে দাঁড়ালেন, ঠিক প্রায় একই সূত্রে আনন্দার করে শ্যামপ্রসাদ জননী বলেছিলেন, "বিধান তুমি থাকতে আমার মাঝা মাঝি চিকিৎসক হয়ে যো।" ১৯১১ সালে ঢাকার বাড়িতে 'ফজলুল হক সাহেব শ্যামাশ্রায়ী এবং ইউরোপীয় তাঁর সারা দেহে ছড়িয়ে পড়েছে, তখনও আজ্ঞা হক সাহেব তাঁর চিকিৎসকদের বলেছেন, "তোমরা কলকাতায় একবার বিধানকে জানাও।"

এ ছাড়া বিধানবাবু রাজনীতিতে এবং জাতীয় লীগনে একটি বড় সুবিধা পেয়েছেন তাঁর ব্যক্তির দাপটে নয়। সেনাবল্লভ, রত্নাশ্রায়ী, মহাশয় গান্ধী, মতিলাল নেহেরু ও ফজলুল হক সাহেবকে ছাড়া ভারতীয় উপমহাদেশের জাতীয় সঙ্গম নেতা ও ব্যক্তিত্বের বিধানবাবু নয় ধরে নিতেন। চৌধুরী বালকৃষ্ণচন্দ্রনাথ সাহেব তাঁর পথিকৃত Pathway to Pakistan গ্রন্থে 'ফ্রাঙ্কা পাঠ' সম্বন্ধে বলতে গিয়ে সপ্রসঙ্গভাবে সেনাবল্লভ ঘোষ আর যে 'বৃন্দ সেকের' নাম উল্লেখ করেছেন, তাঁরা হলেন সিরাজুল রায় ও ডা. বিধানচন্দ্র রায়।

বালকৃন্দ জীবনে ড. প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের মত একটি জায়গায় মিল ছিল। সোটা হল, তাঁরা উভয়েই অকৃত্যদার। কিন্তু বিধানবাবু অকৃত্যদার হলেও তাঁর ব্যক্তিত্ব রাজনীতির একটা আশ্রয় ও অনুপ্রাণিত ছিল, সেটার সঙ্গে ড. প্রফুল্ল ঘোষের সংঘাত ও সংঘর্ষ ছিল প্রবাসস্থিত। কিন্তু উভয়েই বাঙ্গালা ও বাংলায় গান্ধীজি কে বেছেই জীবনের সেন্দেবী পছন্দ—একজন নিঃস্বপ্ন অবস্থায় আর দ্বিতীয় জন ক্ষমতার আসনে থেকে।

২৩ জানুয়ারি সূভাসচন্দ্রের জন্মদিনে ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা হু'মাস বসুরের পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের দ্বিতীয় মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণ করেন। মন্ত্রিসভার সদস্যরা এই মন্ত্রিসভায় যারা ছিলেন, তাঁরা হলেন (১) ডা. বিধানচন্দ্র রায় (২) নরসিংরতন সরকার (৩) হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী (৪) প্রফুল্লচন্দ্র সেন (৫) কালীদাস মুখোপাধ্যায় (৬) নীহারেন্দ্র দত্ত মজুমদার (৭) মাদনমো নাথ গাঙ্গা (৮) হেমচন্দ্র নন্দার (৯) বিমলচন্দ্র সিংহ (১০) তৃপ্তি মজুমদার (১১) নিরুদ্ভবব্রাহ্মী মাইতি (১২) মৈত্রীসিঁদাহেন বর্মদা।

২৪ জানুয়ারি তারিখের 'আনন্দবাজার পত্রিকা' ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের মন্ত্রিসভায় শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের বিস্তৃত সংবাদ প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই সংবাদের সঙ্গে এক কথাও লেখা ছিল 'উল্লেখযোগ্য যে ড. প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মন্ত্রিসভায় যোগদানে অক্ষমতা জ্ঞাপন করেছেন' ২৫ জানুয়ারি (১৯৪৪) তারিখে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় প্রদেশের নতুন মন্ত্রিসভা সম্পর্কে একটি সম্পাদনাত্মক প্রকাশিত হয়। সম্পাদনায়টির শিরোনাম ছিল 'নতুন মন্ত্রিসভা'। পুরো সম্পাদনাত্মকটি হল এই

নতুন মন্ত্রিসভা

'মাস কয়েকের মধ্যেই মন্ত্রিসভার বারকয়েক রদবদল হইয়াছে। কেন রদবদল হইয়াছে এবং পরিণতিতে ড. ঘোষের মন্ত্রিসভায় যা কেনে ভাসিয়া নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করিতে হইল জনসাধারণ তাহা সম্বন্ধ অগত্য নহে। ডা. রায় মন্ত্রিসভা গঠনের সঙ্গে সঙ্গে এক ভবিষ্যতে এ সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, বাঙলা বর্মদনে যে দুর্ভোগে ভুগিতেছে, সচীর্ণ বুদ্ধি, উপলব্ধতা ইচ্ছা ও অবিশ্বাসের ফলেই সহিষ্ণুতা বাঙালী শাসনভুক্ত পরিচালনার গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ করিবেন উদাহরণেই এই সচীর্ণতা, ইচ্ছা ও অবিশ্বাসের ফলেই উচিত হইবে। আমরা আশা করি, মন্ত্রিসভার সদস্যগণ এবং তাহাদের সমর্থক পশ্চিমবঙ্গের আমি সভার কংগ্রেস পার্লামেন্টারী দল এই সকল ভ্রটি পরিহার করিয়া উচিতের সম্বন্ধ হইবে।

'ডা. রায় ঘোষণা করিয়াছেন 'আমি কোন দলের অন্তর্ভুক্ত নই। আমি দল বা উপদলের সহিত যুক্ত থাকিতে আমি স্বীকৃত নই। আমি এই পদ গ্রহণ করিয়াছি এই কারণে যে, আমরা দুই বিশ্বাস পরিচয়ের বিভিন্ন দলের সদস্যগণ এবং জনসাধারণ এই একটি মন্ত্রিসভার জন্য অপ্রতীক্ষিত বহির্ভাগে কখন দলগত অনুরক্তি থাকিলে না।' মন্ত্রিসভার কোন দলের প্রতি অনুরক্তি থাকিতে পারে না, থাকা কর্তব্য নহে। জনসাধারণের প্রতিই তাঁহার সুদূর অনুরক্তি থাকা প্রয়োজন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু মন্ত্রিসভাকে নিষ্ঠার সহিত শুধু পশ্চিমবঙ্গ লইয়া কাজ করিতে হইলে পরিচয়ের অন্তঃ পরিচয়ের কংগ্রেসী সদস্যগণের সহযোগিতা ও সমর্থন আবশ্যক। তাঁহাদের অতিমত দ্বি-ক্রম পরিবর্তনশীল হয়, ব্যক্তিগত ও উপলব্ধতা ইচ্ছা ও অতিপ্রিয় বাগ্যার ঘটিলেই যদি সহযোগিতার

অভাব ঘটে, তাহা হইলে কোন মন্ত্রিসভাই সাফল্যলাভ করিতে পারিবে না।

'প্রধানমন্ত্রী রূপে ডা. রায় মাদুরী গতিহীন মন্ত্রিসভার পরিচয়ে একটি প্রাকসত্ত্ব জীবন্ত গতিশীল মন্ত্রিসভার গঠন করিবার অতীক্ষণীয় হইয়াই নতুন মন্ত্রিসভার গঠন করিয়াছেন। এই প্রদেশের নতুন মন্ত্রিসভাও তিনি আমদানী করিয়াছেন। একটি অ-দলীয় মনোভাব তাঁরা ডা. রায় মন্ত্রিসভা গঠনের চেষ্টা করিয়াছেন তাহা মনে যায়, তবে তিনি নিজে কোন দল বা উপদলের না হইলেও দলের প্রশ্ন বা দলীকে তিনিও সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিতে পারেন নাই।'

কিরে আসা যাক ড. প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ প্রদেশে। বিধানবাবু মুখ্যমন্ত্রীর পদে শপথ নেবার আগেই ড. প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ চিল্লি গেল। তিনি তাঁর 'জীবনস্মৃতি'তে গান্ধীজির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে লিখেছেন—'২৩ জানুয়ারি তাঁর সঙ্গে সন্ধ্যা ৩টা তারত সরকারের উপর অসম্মতি। বললেন, 'প্রফুল্ল, এই স্বাধীনতা হোয়েছিল?' আর ১২৫ বছর বয়সের আকাশনা নেই।' ২৪ জানুয়ারি হতে ৭ দিনের মধ্যে কিছু মন্ত্রিসভা গঠনকারী ডাকবাক্স কী করা যায় স্থির করতে। আমাকে অবশ্য যেতে হবে বললেন। আমিও যাব বললাম। কিন্তু যেতে হল না।...

৩০ জানুয়ারি গান্ধীজির হত্যা প্রসঙ্গ ড. ঘোষ তাঁর স্মৃতিচারণা লিখেছেন, "এই সময় বঙ্গভঙাই কেন্দ্রে ব্রাহ্মদ্বন্দ্বী। আমি তখনও মনে করতাম এখনও করি যে একদম দলীল ঘটলে সেনাকার ব্রাহ্মদ্বন্দ্বীর পদত্যাগ করা উচিত। আমি ব্রাহ্মদ্বন্দ্বী থাকার সময় যদি পশ্চিমবঙ্গের এরশাদ ঘটনা ঘটত তবে আমি নিশ্চয় পদত্যাগ করতাম। পদত্যাগ না করলে তাঁকে মন্ত্রী পদ থেকে বা দেওয়া উচিত। এই মধ্যে কংগ্রেসের মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। বঙ্গভঙাই পদত্যাগে ডাকবাক্স নেই না, বঙ্গ আবার ওপর বৃহৎ অসম্মতি হয়। কৃপালিনজি বললেন, জাপানে একদম দলীল ঘটলে ব্রাহ্মদ্বন্দ্বী হেঁচকি করতেন।"

এ প্রসঙ্গে প্রায় একই রকম উক্তি করেছেন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ তাঁর 'India Wins Freedom' গ্রন্থে। মৌলানা তাঁর ওই স্মৃতিচারণা শিরির রামলীলা মধ্যস্থলে অন্তর্ভুক্ত গান্ধীজির জন্য শোকসভায় জগদপ্রকাশ নারায়ণের বক্তৃতার প্রসঙ্গ করে বলেছেন যে ওই সভায় একমাত্র জগদপ্রকাশই সর্বদা বঙ্গভঙাই-এর মূলের উপর নির্ভর করে বলেছিলেন, গান্ধীজির প্রদেশের অব্যবহার জন্য ব্রাহ্মদ্বন্দ্বী বঙ্গভঙাই প্যারিটেলের পদত্যাগ করা উচিত।

দেশ বিভাগ এবং তার পরিণতিতে বঙ্গভঙাধারণের সময় থেকে ড. প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে সর্বদা বঙ্গভঙাইয়ের সম্পর্কের অবনতি প্রকৃতি হয়ে পড়ে এবং গান্ধীজির হত্যার পর তা এক নতুন মাত্রা পায়। ড. ঘোষ তাঁর স্মৃতিচারণা ও উল্লেখ করে বলেছেন,

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য হিসাবে ১৯৪৮ সালে ওয়ার্কিং কমিটি ড. যোমের উপর একটি বড় দায়িত্ব অর্পণ করে। ওই দায়িত্বটি ছিল, ভারতের দুই দেশীয় রাজ্য ময়ূরভঞ্জ ও কোচবিহার কোন কোন প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হবে, তার সুশাসিত করা। ময়ূরভঞ্জের উপর বিহার এবং কোচবিহারের উপর অসমের দাবি ছিল। ওয়ার্কিং কমিটিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার প্যাটেল কোচবিহারের উপর অসমের দাবির সমর্থনে বক্তব্য রেখেছিলেন। কিন্তু ড. প্রমুদচন্দ্র শোখ ওয়ার্কিং কমিটির কাছে এই রিপোর্ট দেন যে, ভাষাভাষ এবং সংস্কৃতিভাষে নিক দিয়ে সর্বোত্তমভাবে ময়ূরভঞ্জ ওকীলাহা এবং কোচবিহার পশ্চিমবঙ্গকে দিতে হবে। ওয়ার্কিং কমিটি ড. যোমের মতই প্রবল করে এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতরকে এই মতই আইনানুগ বাধ্যমান নিতে বলে।

১৯৪৮ সালের মাঝামাঝি সময়ে বিশিষ্ট কংগ্রেস এম এল এ যোগেশ চন্দ্র গুপ্ত (যে সি গুপ্ত নামে সমধিক পরিচিত) বিমানসড়ি রাস্তার মল্লভাভার বিক্ষিপ্ত প্রকাশ্য কতগুলি অভিযোগ করেন। অভিযোগগুলির গুরুত্ব বিবেচনা করে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু তার তত্ত্ব করত কলকাতার আসনে। জওহরলাল গুপ্তজিগিলি মেঘোরে কংগ্রেস কর্মীদের এক সমাবেশে বক্তব্য করেন এবং ডা. বিধানভঞ্জন রায়কে সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে সতর্ক হতে বলেন প্রকাশ্যে। জওহরলাল ওই সভায় অবধার পরিবর্তনের জন্য পশ্চিমবঙ্গে একটি আশু নির্বাচনের কথাও বলেন। এর পর পরই ড. প্রমুদচন্দ্র শোখকে আবার মুখামুখি করার উদ্দেশ্য নেওয়া হয়। ড. যোম বলেনছেন, “এরপর আমার বক্তব্যটা চা। রাস্তার উপর বিক্ষিপ্ত হয় এবং আমাকে মুখামুখি করতে চান। তার সঙ্গে একটি নথি ছিল। মহাযাজির হত্যার পর বঙ্গভটাই’র পদত্যাগ করা উচিত ছিল, আমরা এই মহাযাজির সম্মোহন চান। তা বলা সম্ভব নয় তাই আমি এগোয়ামি।” (জীবনশ্মৃতি, পৃষ্ঠা ১২০)

ওই অকল্পনীয় ভ্রুততার সঙ্গে গান্ধীজির হত্যার সংবাদ ঢাকা এবং পূর্ববাংলার প্রচলিত গ্রামগুলিতে ছড়িয়ে পড়েছিল। জেলা ও মহকুমা শহরগুলিতেই যেখানে থানা ও ডাকঘর আছে, সেখানে পূর্বপাশিনা প্রদেশিক সরকার নানাসামর্যকে বিভক্ত উপমহাদেশের সবচেয়ে শোচনীয় দণ্ডা জানিয়ে দিতে কার্যপা করতেন। ফলে স্টিমারের সারং, শালসিরা এবং নদীর ঘাটে ঘাটো বাঁধা নৌকার মাঝিরা পর্যন্ত ৩০ জানুয়ারি সকালে মারা জানতে পেরেছিল যে কলকাতার হেলগ্যাটার অবস্থান করে অনশনের মধ্য দিয়ে যে মানুষটি বঙ্গ প্রদেশের দুই বিভক্ত অংশের লক্ষ লক্ষ হিন্দু ও মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রাণরক্ষা করেছিলেন, তিনি নিহত হয়েছেন।

ঢাকায় তখনও কোনও দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হতে আরম্ভ করেনি। মুসলিম লিগের পূর্ণপেশাকর্তব্য গড়ে ওঠা হতে

সংবাদপত্র ‘আজাদ’ এবং ‘মনিং নিউজ’ তখনও কলকাতা থেকে ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়নি। ফলে কলকাতার খবরের কাগজগুলিতেই পূর্ববাংলার লোকেরা জানতে পারল কীভাবে ঘটনাগুলি ঘটেছে। পূর্ববাংলার কোনও কোনও শহরে ৩০ জানুয়ারির সন্ধ্যার নিশ্চলতার মধ্যে ব্যক্তিও নেমেছিল। তবে কলকাতার ওই সন্ধ্যার চেহারা ছিল কিছুটা স্বভাবত। ওই সময়কার বিখ্যাত ফটোগ্রাফার সুশীল জানার তোলা একটি ছবি ব্লু নাম করেছিল। ছবিটি ছিল শিয়ালদা স্টেশনে খবর কাগজ বিক্রির এক দৃশ্যের।

৩০ জানুয়ারি বিকালে গান্ধীজির হত্যার খবর নিয়ে কলকাতার বাংলা ও ইংরেজি সব দৈনিক কাগজের এক পাখার বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। খবরের শিরোনামগুলি ছিল একমুখ্য: Mahatma Gandhi shot Dead, Gandhiji Assassinated (Long Live Gandhiji), Gandhiji, Killed, মহাত্মা গান্ধী নিহত, মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুপ্রাপ্ত, আততায়ীর গুলিতে গান্ধীজি নিহত। একজন হত্যার তাঁর চতুর্দশতর পাঁচ আশ্রয়ের ঠাকুর সব কাটি কাগজের ডেসলাইন ঘরে শিয়ালদা স্টেশনের নিশ্চলতার সন্ধান দিয়ে গিয়েছিল। মুখে কানও কথা নেই, চোখে শুধু শব্দবিহীন।

কলকাতা তার চরিত্র অনুযায়ী লোকের ও শ্রুত থাকে না। সন্ধ্যার পর একদল মারুমুখী লোক ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ‘হিন্দু মহাসভার’ মুখপত্র বলে বিবেচিত ‘হিন্দুধ্বা’ পত্রিকার অফিস আক্রমণ করে। ওই বছরের কাগজটি ডুবানীপুর এলাকার হাশিম মুখার্জি রোডের একটি বাড়ি থেকে প্রকাশিত হত। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তখন হাশিম ভারতের প্রবল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় মন্ত্রী। কিন্তু যেহেতু ‘হিন্দুধ্বা’ পত্রিকা গান্ধী বিরোধী সেহেতু আক্রমণকারী ওই জনতা পত্রিকারটির কর্মচারীদের লক্ষিত করে এবং হামাচারার বিভিন্ন টাইপ বস্তুপাশে কান ছোট্ট নীত করে দেয় ও ছাপাখানার যন্ত্রপাতি ভেঙে ফেলে। কিন্তু ৩০ জানুয়ারি হত্যার সবচেয়ে বড় হামলা ঘটে হিন্দু মহাসভার সভাপতি নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (ভারতীয় রাজনীতিতে যিনি এন সি চ্যাটার্জি নামেই বেশি ছবিচিত্রিত এবং সি পি এন নেতা সোমেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ভ্রাতা) বাড়িতে। মারুমুখী জনতা তাঁর থিয়েটার রোডের বাড়িতে অসংখ্য গুলি করে। বিদ্রোহ ও জল সরবরাহের লাইন বিচ্ছিন্ন করে। ৩১ জানুয়ারি পশ্চিম অসংখ্য অগ্ন্যহতে থাকে। যেন পশ্চিম নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে বশীরা প্রদেশিক হিন্দু মহাসভার সভাপতির পদে বসিয়ে দিতে হয় এবং এর পরকার নির্মলবাসু কলকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। হাইকোর্টের বিচারপতি পদে তাঁর নিযুক্তি যোগ্যতার পর তাঁদের থিয়েটার রোডের বাড়ির চারপাশে অসংখ্য ও বিক্ষোভ সঞ্চার হয়।

ড. প্রমুদচন্দ্র শোখ তাঁর Mahatma Gandhi As I Saw Him গ্রন্থে একটি বিষয়ে দুঃখের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন যে গান্ধীজির কলকাতা থেকে সরাসরি ঢাকায় যেতে মন্থ

করেছিলেন। কারণ, কলকাতার হেলগ্যাটার ঘাটার সময়ে লাহোরে ও রাওয়ালপিন্ডি থেকে শিশু ও হিন্দু মেয়েদের উপর অত্যাচারের শোনা সহ কয়েকখানা মর্মান্তিক টেপিয়ায় গান্ধীজির কাছে পৌঁছায়। কিন্তু জওহরলাল নেহেরু তাঁকে বাধ্য দিলেন। গান্ধীজি কিন্তু শীতালোচনা পর পাঞ্জাবের লাহোর, রাওয়ালপিন্ডি, গুজরানওয়াল্লা, লয়াপুর্, শেখপুর্, মটওয়ালার দামার বরজার আরও সংবাদ গান্ধীজির কাছে আসতে থাকে। পাঞ্জাবের প্রতিভাবান দিল্লির পরিহিতরও ভ্রুত অবনতি হতে থাকে। এই নিরাশর মানসিক হস্তান্তর মধ্যেও গান্ধীজি শেখাবাদের খান আবদুল গাফফর খানের কাছে সংবাদ পাঠান যে তিনি লাহোর যেতে চান এবং গাফফর খান তাঁর কিত থেকে যা করণীয় তা যেন করে রাখেন। গাফফর খান কয়েকখানা খুদা-ই-বিখমবারকে সঙ্গে নিয়ে লাহোরের দিকে রওনা হন। বোয়াইয়ের ‘The Current’ পত্রিকার বিখ্যাত সম্পাদক ডি এফ কারাকা (D F Karaka) ছদ্ম পাঠ্যাবার বাঙালির ঘোষণে ব্রিটিশ সামরিক অফিসারদের সঙ্গে সাক্ষাৎযোগে গান্ধীজি করেই অন্তিম ফল লাহোরের পৌঁছানো। সাক্ষাৎযোগে গান্ধীজি বলেন তিনি খুব তৃপ্তলেন, উল্লস রক্তক শিশু ও হিন্দু মেয়েদের হারস্কি দিয়ে বেঁচে লাহোরের রাস্তায় যোয়ানো হচ্ছে। (D.F. Karaka ‘Freedom must not stink’ গ্রন্থে লিখিত এবং Leonard Mosley এর The Last Days of the British Raj, গ্রন্থে ওই ছবিগুলি সন্নিবিষ্ট আছে)। এ সব ঘটনা জেনে গান্ধীজি আর স্থির থাকতে পারতেন না। তিনি লাহোর যোগায় প্রস্তুতি নিলেন।

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকৎ আলি সরকারিভাবে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুকে জানান যে গান্ধীজি বেনে লাহোরে না আসেন কারণ গান্ধীজির লাহোর উপস্থিতি পাকিস্তানকে ক্ষতি করবে। কিন্তু লিয়াকৎ আলি কখনওই বলেননি যে পাকিস্তানি পুলিশ গান্ধীজিকে লাহোরে টুকবে বাধা দেবে। কিন্তু জওহরলাল লিখেই গান্ধীজিকে লাহোর যেতে দিলেন না। পরিস্থিতিতে লাহোর রয়ে গেল গান্ধীজির জীবিত পদক্ষেপের প্রতীক এবং কলিকাতা মোসলমার ভাষায়, “১৯৪৭ সালের ভারতীয় মহাশক্তি বিপর্যয় হয়েছিল Year of Violence - লুকুনিয়ের বছর হিসাবে।”

গান্ধী জীবিত পর তাঁর ভিত্তিমুখ পূর্ববাংলার লাললবঙ্গের সন্ধ্যা (নারায়ণচন্দ্র অবধি) বিবর্তন দেওয়া যায়। পর ড. প্রমুদচন্দ্র শোখ তাঁর শ্রুতিভাষায় (জীবনশ্মৃতি পৃ.৯৬) বলেন:

“...পূর্ববাংলার মুখামুখি হওয়া’ পর তাঁর সঙ্গে অনেক ব্যাপারে যোগাযোগ হতো। ফলে একটি ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তাঁকে অনেক ভ্রমলোক বলে কবি। কলকাতা থেকে যা দিলে তা থাকত। তাঁর এক উদারতার অভিযুক্তি ছিল। মনে রয়েছে। ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকায় মাই মহাযাজির ভিত্তিমুখ

নিয়ে। তখন আমি মন্ত্রী নাই। খবর দিয়েছিলাম নাকিস্তানকে সাহায্য। তিনি আসেন ঢাকা বিমানকোয়ার্টারে। আকোকে বলেন— ‘ইসলাম একশ শ্রুতিভাষায় বিশ্বাসী নয়, তবে আপনাদের মনোভাষের প্রতি মনোনিবেশে আছে। পক্ষ যা করা সম্ভব তা করতে প্রস্তুত। এই ড চাই। নিজ ঘরের প্রতি আবার অনুরোধ বিশ্বাসের প্রতি প্রকাশ্যে ডাব। লাললবঙ্গ থেকে ভিত্তিমুখ বিবর্তন। পূর্ব বাঙালির প্রত্যাশীরা ব্যক্তিরা সেখানে একটি গান্ধীজি তাঁরী করে। আমি বঙ্গ গান্ধীজি দেখেছি, তার মধ্যে কান্ধীনাথের এই ঘাট আমার কাছে সবচেয়ে ভাল লেগেছে।...”

গণটানির মধ্য দিয়ে একটা বিষয় স্পষ্ট যে, সমসাময়িক বঙ্গ রাজনীতিকদের সঙ্গে গান্ধীজির যে মানসিক ও ভাষাতত নৈকট্য ছিল তেমনই হিন্দু মুসলমান নির্বিদ্বেষ বাঙালির মনেও গান্ধীজির একটা স্থান ছিল, যেখানে জওহরলাল বা বঙ্গভটাই গ্যাটেলের মতো বিশিষ্ট রাজনীতিকরা কখনওই পৌঁছতে পারতেননি।

গান্ধীজির হত্যার তিন সপ্তাহের মধ্যে ১১ ফেব্রুয়ারি তারিখে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির এক দলটির বৈঠক হয়ে। বৈঠকে আন্দোলনার প্রসার বিষয় ছিল দেশবাসির পর ভারতের যে সব প্রদেশ এবং বিভক্ত প্রদেশের যে সব জেলা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সেই সব অঞ্চলের জাতীয় কংগ্রেসের প্রদেশিক ও জেলা শাখাগুলির ভবিষ্যৎ কী হবে? এই প্রশ্নে ওয়ার্কিং কমিটি জাতীয় কংগ্রেসের গঠনভ্রমের সম্মোহন করে একটি প্রস্তাব প্রবল করে। প্রস্তাবটিতে একশ বলা হয়েছে যে, “ভারতীয় যুক্তফ্রন্ট এবং উন্নীত প্রদেশগুলিতে কংগ্রেসের কার্যক্রম সীমাবদ্ধ থাকবে। আছমী, মডোভার, বিহার, অসম, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বোয়াই নার, মিলি, নাগপুর, গুজরাট, পূর্ব পাশাব, মহারাস্ত্র, মারাঠা, ত্রিপুরা, কোচিন, যুক্তপ্রদেশ, মহাফকাল, উৎকল ও বর্ধা।”

২০/২/১৯৪৮ তারিখের খবরের কাগজগুলিতে কংগ্রেসের গঠনভ্রমের পরিবর্তন এই সংবাদটি প্রকাশিত হলে পূর্ববঙ্গ ও সিন্ধু প্রদেশের কংগ্রেস নেতারা প্রতিবাদে সাজায় হন। কারণ, কংগ্রেসের কর্মক্ষেত্র সীমাবদ্ধ হবার ফলে দেওয়ার তালিকায় পূর্ববঙ্গ, সিন্ধু, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বেলুজিস্তানের নাম নেই। সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুজিস্তানের কংগ্রেস নেতারা (আবদুল গাফফর খান, ডা. খান সাহেব, ও বাহাদুর গান্ধী, খান, আবদুল সামান খান) কংগ্রেস হাইকমান্ডের কাছে ওই প্রস্তাবের বাধ্য চান। অর্থাৎ কংগ্রেস কি পাকিস্তানে তার শাখা সংগঠনগুলি গুলিয়ে ফেলতে চায়?

কিন্তু পূর্ববঙ্গের কংগ্রেস নেতারা ওয়ার্কিং কমিটির ওই প্রস্তাব দেখেই ঘরে নিদ্রায় যে কংগ্রেস জাতি ভাঙের দ্বারা না এবং ভাঙের প্রতি কংগ্রেসের নাম ফুরিয়ে গিয়েছে। গান্ধীজির পরিচয় কংগ্রেস পরিচয়ই দলের ওয়া বিরোধী পক্ষের নেতা কিশোরলায় রায় ঢাকা থেকে কংগ্রেস সভাপতি ড. রাজেন্দ্র প্রসাদকে একটি

টেলিগ্রাম পাঠিয়ে ওই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করেন। টেলিগ্রামটি ছিল এরূপ : "The proposed liquidation of the congress organisation in East Bengal in the absence of advice as to how to keep non-communal political organisations there, has caused dismay among congress workers and the minority community. It will cause other disintegration, breakdown of morale and mass exodus. A ban by the Pakistan government would not have been so disastrous. Please reconsider the decision and wait till the next A.I.C.C. meeting." ঢাকা জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মরিশপুর জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি প্রতাপ চন্দ্র গুহরায়, এবং পাকিস্তান গণপরিষদের কংগ্রেস দলের সেক্রেটারি অধ্যাপক রাজকুমার চক্রবর্তী। ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদকে পাঠানো রাজকুমার বাবুর টেলিগ্রামটি ছিল বৃহৎ আকর্ষণীয়। তাঁর টেলিগ্রামটি হল এই : Proposed abolition of the Congress in Pakistan would be disastrous. By partitioning Bengal you have sacrificed East Bengal and now Congress liquidation will result in the total exodus of its minorities from East Bengal, who were already helpless and whose last resort was the Congress. East Bengal contributed its full quota for Independence deserves no shabby treatment." (হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড, ২১.২.৪৮)। সিদ্ধ প্রদেশের কংগ্রেস নেতা চৈত্রাম গিদ্দানি (Chaitram Gidwani) ঠিক পূর্ববঙ্গের কংগ্রেস নেতাদের মতো কংগ্রেস সভাপতির কাছে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন।

২১ ফেব্রুয়ারি এ-আই-সি-সির অধিবেশন বসলে পাকিস্তানের প্রদেশগুলি থেকে আসা কংগ্রেস সদস্যরা প্রস্তাবের বিরুদ্ধে খুব শোরগোল তোলেন। বন্ধন এ-আই-সি-সির সাধারণ সম্পাদক শঙ্কর রাও দেও ফুল সদস্যদের বলেন যে, কংগ্রেস সংগঠনের কার্যকলাপের ভৌগোলিক সীমানা নির্ধারণ করে ওয়ার্কিং কমিটি যে সুশাসিত করছিল, তা বাত হয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাহলেও যে সব সদস্য পাকিস্তানে কংগ্রেস সংগঠনের বিশেষাণ সাধনের বিরুদ্ধে তাঁরা এ-আই-সি-সির কাছে এই বক্তব্য রাখেন যে, 'বিশ্বী শাসিত কংগ্রেস সংগঠন চাপু রাখতে অসুবিধা থাকলেও এখনই পাকিস্তানে কংগ্রেস সংগঠনের শাখাগুলি বন্ধ করে দেওয়ার অবস্থা সৃষ্টি হয়নি। তাঁরা আরও বলেন যে, স্বাধীনতাপন্থী সম্প্রদায়ের লোকেরা কংগ্রেস সংগঠনের মাধ্যমেই ভারতভূমির সঙ্গে সম্পর্ক রাখছে। দেশ বিভাগের সময় সরকারি কর্মচারীরা কে কোন 'ডোমিনিয়নে' কাজ করছেন, তা বেছে নেওয়ার সুযোগ পেয়েছেন। কিন্তু দেশের আশামের জনগণ সেই সুযোগ পাননি। সুতরাং কংগ্রেসের মাধ্যমে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার সুযোগ থেকে তাদের বঞ্চিত করা ঠিক নয়" (আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৩/২/৪৮)।

দেশ বিভাগের পর করাচিতে পাকিস্তান গণপরিষদের কংগ্রেস দলই বিরোধী দলের মর্যাদা পায়। পূর্ববঙ্গের আইনসভাতেও কংগ্রেস ওই একই মর্যাদা ভোগ করে। সীমান্ত গাছী বান আবদুল গফফর খানের যে জীবনীশ্রুতি তেজলকর লিখেছেন, তাতে সীমান্ত গাছীর বয়সের কথা হয়েছে যে, পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনের উদ্বোধন করার পর রাষ্ট্রপ্রধান মহিউদ্দ আলি জিয়া কংগ্রেস দলের সদস্যদের সঙ্গে আলাদাভাবে মিলিত হন। পূর্ববঙ্গের কিরণশঙ্কর রায়, বীরেন্দ্রনাথ দত্ত, অধ্যাপক রাজকুমার চক্রবর্তীরা এই সাক্ষাতে মিলিত হন। সীমান্ত গাছী উল্লেখ করেছেন যে, জিয়া সাহেব কংগ্রেস সদস্যদের সঙ্গে গ্রাম ভ্রমণ এবং গ্রামীণ অর্থনীতির সমস্যা নিয়েই বেশিরভাগ কথা বলেন।

এটিকে ভারতীয় গণপরিষদের উত্তরপ্রদেশ ও বিহার থেকে বেশ কয়েকজন মুসলিম লিগ সদস্য ছিলেন। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিলেন মৌদুদী খালিকুজ্জামান। খালিকুজ্জামান সাহেব পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে অন্যতম মুসলিম লিগ নেতা। গণপরিষদে ভারতের জাতীয় পতাকা সংক্রান্ত বিলের আলোচনাকালে খালিকুজ্জামান এত নোংরাশ্রী বক্তৃতা করেছিলেন যে কংগ্রেস সদস্যরা হর্ষধ্বনি করে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। সুতরাং সেই সময় কখনওই পাকিস্তানে কংগ্রেসের অস্তিত্ব মুছে ফেলতে উদ্যোগ নেওয়ার মতো পরিস্থিতির উদ্ভব হয়নি, যেটি করতে চাইছিল কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি। যে কংগ্রেস নেতার হাতে ওই প্রস্তাবের স্বস্বাভাবিক তৈরি হয়েছে, তাঁর মনোভাব অতিপ্রিয় ছিল পূর্ববঙ্গের কংগ্রেস কর্মীদের নিক্তান্ত ও উদ্ভ্রান্ত করে দেওয়া এবং সেটা নিশ্চিতভাবেই সম্ভব হয়েছে।

ওই ঘটনার এক সপ্তাহের মধ্যে বঙ্গ রাজনীতিতে আবার একটা বড় আলোড়নের সূচনা হল। সরোজ চক্রবর্তী তাঁর "মুখামস্তিদের সঙ্গে" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময়ে মুখামস্তি বিধানচন্দ্র রায় ঢাকার কংগ্রেস নেতা কিরণশঙ্কর রায়কে ফোন করেন এবং তাঁকে কলকাতায় আসতে বলেন জরুরি আলোচনার জন্য। এরপর একদিন বিকালে কিরণশঙ্কর রায় ঢাকা রাস্তার সঙ্গে দেখা করতে আসেন ওয়েলিংটন মেয়াদের বাড়িতে। অনেকক্ষণ ধরে তাঁদের দু'জনের মধ্যে কথাবার্তা চলে। তারপর কিরণবাবু আবার ঢাকা চলে যান। ওই সময়ে কলকাতা ও ঢাকার রাজনৈতিক মহল্ল রটে যায় যে কিরণশঙ্কর রায় পূর্ববঙ্গের কংগ্রেস নেতৃত্ব গ্রহণ করেছেন এবং তিনি পশ্চিমবঙ্গের মহিলাসভা যোগ দিতে চলেছেন। এ মার্চ (১৯৪৮) আনন্দবাজার পত্রিকা এই সংবাদ প্রকাশিত হয় যে কিরণশঙ্কর রায় বৃহস্পতিবার বিকালে 'গভর্নমেন্ট হাউসে' পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম মন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন। গভর্নর রাজা গোপালচন্দ্রী তাঁকে প্রদেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করেন। (ক্রমশঃ)

এমনভাবে শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

বলছ যখন, এমনভাবে বলে
যে, বলটি কষ্টসাধ্য,
বলতে হবে বলছি এই মুখটুকু নেওয়া।
নইলে কেন কোরের কোণে এক কোঁটা নেই জলও?

করছ যখন, এমনভাবে করো
শব্দ না হয়, পাড়ার লোকে
তুলাখণ্ডে টের না পায় যে
কোথাও বিপুল কান্না হয়েছে জড়ো।

যাচ্ছ যখন, এমনভাবে যাও,
থেকে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল
তেনন তাঁড়ে
মেয়ালে সেগে না থাকে কোথাও।

বিনি-ছুঁচে ফোঁড়া দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিনি-ছুঁচে ফোঁড়া, খুন নয়, জাগতেই
দেখছিলাম চোরা কুঁঠুরির খোলা দাঁতে
আগুনের নীল উঠছে—কত মিন ধরে দেখি, মনে পড়ে
লাল-ধরা মুখে ধরনার বসদর্প;
গোটা এলাকার দান তাম্রপট্ট লিখে নিজেদেরই
তুলে দিয়ে, কৃত্তাশাল নিয়ে ঘুরছিলে।
নির্ভয়ে গড় পার হয়ে যাও। তারপর হত
দেখতে পাও উজ্জিয় বনেও মূলে আছে
হাশিশের উর্গা, চোখে ময়া অস্ত্র আছও।
ওড়া তড়িতের কাঁচ পাখনার চুম্বক
দুপি নীটটোতে ডুবতে পারতে—কৃত্তাশাল ঘিরে আছে,
শেছনে পাশজাল নিয়ে নগরহেলির পৌঁচা সোনা।
আর ওই অব্যাব্য লোক, শ্রমানের ছাড়পত্র পেয়েও
মরতে চায় না যে! কবে সাজ বেছে ওঠে
ভাবতে ভাবতে, দেখ, নাটের পুতুল সাজছে আছও
কুঁঠুরির গ্রীনকমে ঢেকে বসে!

এই পদ্মায়—রবীন্দ্রনাথ দেবী রায়

পদ্মার পাড়ে উপস্থিত হয়ে 'হানিক' নামাঙ্কিত বাসটি
গেল দাঁড়িয়ে।
কারও জন্য কি তার এই নির্বিড় অপেক্ষা?
বরং, তার চেয়ে.....
'নারে বাপু, না! প্রকৃত অর্থে-ই ঘাট খালি নেই।
একটি নয়, দুটি নয়—চারটি-তেও অবস্থা এই।
গোয়ালন্দ ঘাট, এরি নাম?
'আচ্ছা'র নামে চলিলাম।
দু' ঘোর! চোখে বিহ্বলতা, মনে কাটে না—কাটুতি চায় না—
রবীন্দ্রনাথ, এই পদ্মায়—বজরায় চেপে, দু'চোখ মেলে
মেডভেনে ঘুরে! ওই দূর, নক্ষত্র নীল ওই আকাশ
এলোমেসো বাতাস কেবলি মন উচটন বাতাস
ওই দূরের সার্গেইট এপারে যায়,
ওপারে যায়!

কমা করে দিলাম তোমাকে, অন্ধর আর মাত্রাবুন্দের তফাত না

ঝুমেই

তুমি বর্ণের আগুনে হাত দিয়েছিলে।

বিসর্গ কতমাত্রা, গতকালও জানতে না তুমি।

পাহাড়ের পা পর্যন্ত শূন্যে না ঘাসের জঙ্কল।

কানুনের মতো চন্দ। এক ঝুঁয়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছ। উদ্ভাস।

দুলতে দুলতে আগুন আগছে আমাদের অন্ধর বসন্তের

দিকে।

ধরপোড়া প্রাণীরা দৌড়ছে, চিংকারে কাণায় কঁপে উঠছে

সাবধানী গাছ,

গৃহটিয়া বলবল করছে অন্ধকারে।

আকাশের-কানাত ধরে গেছে, তারামণ্ডল বেঁকেচুরে ভেঙে পড়ছে

অন্ধকার জলে। তোমার সারা শরীরে আগুন।

বলতে বলতে তুমি দেখছ বন পৃথিবীর অট্টহাস। ও পাগল।

অর্ধ ও মাত্রাবুন্দের তফাত তোমার কোনও কাজে লাগেনি।

বিসর্গের মাত্রা প্রকৃতি

না জেনেই তুমি তুলে নিয়েছিলে শব্দের আতশ কাচ

আর আমাদের কমা কথা জানতে পারার আগেই

তুমি অন্ধার।

সামাজিক

মতি মুখোপাধ্যায়

হিঁড়ে ফালাফালা করছে দ্বালন্ত

বাঁচতে চাই তাকে

পরম মমতায় লালিত একমিন

যে ছিল অতি নিকটের

সন্তানের জন্য নাড়ির টান

চন্ডাল বাতাস

উড়িয়ে পুড়িয়ে দিতে দিতে বলে

বাঁচতে চাও তেো নিজের দিকে ফেরো।

আমি মানে আমি তবে একা

স্বয়ং সত্তা কি

এও কি সম্ভব

আশেপাশে যারা একমিন

কেউ তারা কারও নয়

মাত্র ছায়া

ভালপালা ময়াদবুকের

রোন সরে যেতে যার চিহ্ন থাকে না।

আত্মীয় অনাত্মীয় মানুষেরা তবু

অশ্রমান ধুয়ে নিয়ে

ফিরে আসে আমারই দরজায়

কড়া নাড়ে।

বিকল্প নীলাঞ্জন সিংহ

বড়ই ভয়ঙ্কর খেলায় নামালে প্রভু, বড়ই শূন্যতম খাড়ে
প্রদীপ জ্বলিয়ে দিয়ে,
পথ দেখে চিনে যেতে আদেশ গোনালে;

এখনও শিখিনি আলো হাতে ঢেকে ঝড়ে পথ চলা;
আলোকে বাঁচতে গেলে হাতের আড়ালে
তোমার দেখানো পথ, পথের জ্যামিতি
চকিতে অদৃশ্য হয়,
তোমার নিয়মে পথ সহজে হারায়;

তবু তুমি পথেই নামালে!
প্রদীপ না পথ, আমি কোনটা বাঁচব!

অপেক্ষা পার্থপ্রতিম মন্ডল

একদিন শহরের তীর কোলাহলে ঝাড়া হয়ে
যান্ত্রিক ধোঁয়ায় ছায়া আকাশ, একেঘেয়ে ব্যস্ততা
অহংকার ও প্রতিষ্ঠার পথ মেলে

ছুটে আসি
চোখের দুমের জন্য, বিরতির জন্য
প্রান্তরশী সন্জ্ঞা বিস্তারে জ্বলন্ত স্বাদ পেতে
শৈশবের স্বাদ পেতে
এই লাল মাটি, এই বর্ষণ, এই ভূমি অঁধার করা কালোমেঘ,
ঝড়, দারুণ ব্যক্তিগত দুপুরের সন্ধী এই বন,
চলন্তহীন, ডাঁতিহীন, চেতনার আটপেটে জড়ানো এই বন,
নির্মূমে মঁড়িয়ে থাকে পৃথিবীর বিবর্তনের সাক্ষী এই বন,
বৃষ্টি অন্ধকার আকাশে ছড়ানো নিম্নত নক্ষত্র,
শান্তি, অলসতা, ব্যক্তিগত সুখের কাছে।
পৃথিবী তবুও শিখুঁশি আসে আমার,
জীবন তবুও কিছুতেই আমাকে ছেড়ে অন্যত্র
যায় না চলে।

এখানেও, এই নগ্ন, নির্জন, মুক সন্ধিনীকে নিয়ে মস্তিষ্কের
দুমের মাঝেও
তার এসে পড়ে,
যেখানেই যাই সেই গভীর অসুখ ত্যাগ করে
বেড়ায় আমাকে, আর তখন
এই নিম্নত নক্ষত্র, বিবর্তনের সাক্ষী এই বন, এই সবুজের শান্তির বিস্তার
মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়
যান্ত্রিক ধোঁয়ায় ধোঁয়ায়, ইম্পাতের শব্দে, ব্যস্ততায়।
মৃত্যুর পরেও এক জীবনের কথা ভেবে
আমি বহুবার অর্থ বুঝিছি,
উত্তর বুঝিছি, পরলম্বে নয়, মৃত্যুর পরে এই মহাবিশ্ব,
এই জড় অথবা শক্তিরূপী অনন্ত অস্তিত্বের বিষয়ে
পূর্ণজ্ঞান জানার কথা ভেবে
তবুও এই দেহ সম্পূর্ণ উৎসর্গে বার্থ,
মানুষের সাফল্য আর ব্যর্থতায় তিলে তিলে মৃত্যুগামী,
অপেক্ষায়....অপেক্ষায়....

বুকুল পিসি সাগ্নিক দেব

বুকুল পিসি, তুমি যেখানটায় পড়িয়ে আছে
দ্বাসের রূপ হলুদ হয়ে আসছে.....

সূর্য লুকিয়ে আছে—
নিরাপত্তার অভাবে—

বাতাসের বেহে আলম পলন
এ-ভাবই আশ্রির পতনের দুর্ভাগ্যের
করে নিয়ে যায়—
একটা নতুন ঘরের দিক.....

আর ক'টা দিন তো ব্যক্তি বুকুল পিসি
আরাম ঘরের দরজা খোলা হবে—
কেমন হবে সে ঘরটি?

প্রদর্শন

গৌরকিশোর ঘোষের ত্রয়ী

বিজিতকুমার দত্ত

গৌরকিশোর ঘোষ বাঙালি মধ্যবিত্তের ব্রহ্মপুত্র
বিদ্রমণ করেছেন 'জল পড়ে পাতা নড়ে'
উপন্যাসের চরিত্র মেজোকর্তার উচ্চারণে, 'আমরা মধ্যবিত্ত'
অতীতের কিছুই বর্জন করিনি আমরা। শুধু একটা নতুন কুর্ভা গায়ে
চলিয়ে পুরনো চেহারা ঢাকা দিয়েছি। ইংরেজের মারফত আমরা
এই মধ্যবিত্তদের সচেতন। নেন যেকর্তি লাগালের নিলামখানা
থেকে কেনা পুরনো সোফা কোচ দিয়ে মানসচেতনার চর্চামন্ডপটী
সাজিয়ে দিই। তাই আমাদের ব্রাহ্মণ্য খোঁচে নি, হিন্দুয়ানি যায়
নি। তাই প্রতিবেশী হিসেবে বাস করলেও মুসলমানদের আমরা
মানুষ বলে ভাবতে শিখি না। এবার মুসলমানও মধ্যবিত্ত হয়ে
উঠছে। বিশ শতকের প্রথম দুই দশকে হিন্দু মানসিকতার কারণে
কারণে ওরো ধরা পেয়েছিল হিন্দু মধ্যবিত্তের চরিত্র। আর ওই সময়
পেচকই মুসলমান সমাজেও মুসলমানের তার চেয়েও দারুন বেগে
মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। মেজোকর্তা অসহযোগতাকে অনুভব করেন,
'মুশল থেকে মানব-প্রেম, মাজা নিরপেক্ষতার হস্তে দীক্ষিত হয়ে
এসে ইংরেজ এদেশে বিভেদ, বিবেচ আর ধর্মার মীল বপন
করছে।' ইংরেজের মুসলমানদের যোগা-কসার উৎসাহ বেড়ে
গেল সাম্রাজ্যিক টাঁকিয়ে রাখার জন্য। মুসলমান মধ্যবিত্তদের
বড় প্রয়োজন ইংরেজের। বিদ্রোহী সুধাময় লক্ষ করে মুসলমান
কমিউনিস্টরা তাই হলে চাকরি পাওয়া যাবে না। মাইনরিটি
অধিনীতির মধ্যে শিক্ষার প্রচারকে আর্থিকার দেবার জন্যই
মেজোকর্তার ইচ্ছাকে অনুমোদন দেওয়া সম্ভব নয়।

'জল পড়ে পাতা নড়ে' উপন্যাসের উপসংহারে লেখক
মাইনরিটি কমিউনিস্টের ভোগের ইঙ্গিত দিয়েছেন। আরও উল্লেখ
আমরা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনর রাজনৈতিক আদর্শের কথা। কলকাতা
করাপেয়শনের মেসার চিত্তরঞ্জন এখন কাউন্সিল নতুন প্রতিষ্ঠিত
যুগরাজ শাট্টিং নেতা। গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতার
কথা বলেছেন। উপন্যাসের অন্তিম প্রধান ব্যক্তি। চিত্তরঞ্জন
বলেছিলেন কাউন্সিল বর্জন নয় কাউন্সিল ঢুকই ইংরেজের সঙ্গে
লড়াই করতে হবে। এই পর্বেই যুগরাজ অর্জন সম্ভব। মধ্যবিত্তের
একটা চেহারা ধরা পেড়েছে এই উপন্যাসের বড় মেজো এবং ছোট
কর্তার জীবনযাপনের কথায়। তাদের এই যৌথ সংসার ঘিরে ঘিরে

ভেঙে যাচ্ছে। গ্রামশহরের দম্ব ও সেখানে ইশারায় জেগে উঠছে।
আর নতুন কালের সংবাদ নিয়ে আসছে ওই যৌবনসংসারের ছক
থেকে বেরিয়ে আসা মধ্যবিত্তের মধ্যে। সুধাময় যার প্রতিনিধি।
মধ্যবিত্তদের রংও বদলে যায়। মেজোকর্তার পর সুধাময় বিদ্রোহী
দলে ভিড়বে? একদিকে প্রচিনের প্রতি অনুগত (ব্রহ্মচর্য, সংঘম
ইত্যাদি যার সামনে) অন্যদিকে হাতে গীতা নিয়ে দেশোদ্ধারের
প্রত। সুধাময়ের হিন্দুয়ানির প্রতি অনুগত মুসলমানের চাকরি
পাওয়ার সুবাদে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এটা কি ইংরেজদের
সাম্রাজ্যিকতার নতুন চাল? বাংলার তথা ভারতের বহুতা
জীবনধারণ জেগে ওঠা নতুন চরা। ঘিরে ঘিরে এই চর বিস্তৃত হতে
পাকে। নদী বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। মেজোকর্তা একে মেনে নিতে
পারে না। চিত্তরঞ্জনের বক্তৃতাকে মেজোকর্তা শ্রবণ করে।
ভারতকে 'নৈতিক বলেই ইংরেজ বশ করাইল। সাম্রাজ্যবাদী
ইংরেজ যদি সে কথা মনে না রাখে তবে তা হবে absolutely
base and quite unworthy of an Englishman. কিন্তু ক্যাপ্ত
ইংরেজ base এবং unworthy ক্যাপ্তই করে গেছে দেশাচারের
অগো পশ্চাৎ। তা হলে কি এই বিভ্রান্তকে আমরা ইংরেজকে
বলেই মেনে নেব? গৌরকিশোর কি এভাবেই দেশকে দেখেছেন।
মনে হয় না তা। কেননা মেজোকর্তা চিত্তরঞ্জনের ঘিরে যে
প্রশ্ন তৈরি করেছিলেন তার মূল্য কোথাও আছে। সে মূল্য দেশের,
মাটি এবং মানুষের সজীব স্ফূর্তি একদিন প্রতিষ্ঠিত হবে। এ জন্য
ওঁর ত্রী উপন্যাসে (১৯২২-৪৪) জল পড়ে পাতা নড়ে, এবারে
সেই এবং প্রতিবেশী-তে এই সমস্যা এবং সমস্যাকে ঘিরে
ভেবেবিভেদে প্রব্র বিস্তৃত হয়েছে। 'প্রেম নেই' উপন্যাসে তারই
পরিচয় দিয়েছেন স্টুটয়ে স্টুটিয়ে। দেশকে দেখেছেন তিনি, এবারে
মাটির পরিচয় সংগ্রহ করেছেন। দেশ নিরক্ষর একটা আইডিয়া।
ভৌগোলিক একটা আকার মাত্র। তার সঙ্গে মাটি যুক্ত হলেই
দেশকে আমরা ধরতে পারি, ছুঁতে পারি আর সেই সঙ্গে যখন
জীবনের আর্তি যুক্ত হয়ে যায় তখন মানুষকে পাি। যেখানে আছে
'চিরকাল এ কি জীলা গো, এ আনন্দ কলসাল।' (১৯৩৩)

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের আকস্মিক মৃত্যু বাংলার রাজনীতির
ক্ষেত্র মণ্ডিতক আঘাত। দেশবন্ধু জীবনকালে যতটা রাজনীতির

ক্ষেত্রে আলোড়ন এনেছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পর যীর্ষে ঘীর্ষে বাঙালি বুঝছিল দেশের অসুখীয় কবির কথা বেশি করে। চিত্রব্রহ্মই এমন একজন নেতা ছিলেন যিনি স্বাধীনতার রাজনীতিসম্বন্ধে জ্ঞানসঞ্চার এবং নেতৃত্বের মধ্যে সর্জনসৃষ্টির নতুন মাত্রা যোগ করতে পেরেছিলেন। আর বাংলার বিভিন্ন মহাব্যঙ্গের ক্ষেত্রে এটা সামরিকবাহিনীর প্রয়াস চিত্রব্রহ্মের রাজনৈতিক মতবাদে ছিল। গণকিশোর আরোপ উদ্বোধন (‘কল পড়ে পাঠা নড়ে’) চিত্রব্রহ্মের আসাধারণ জনপ্রিয়তার দৃশ্য অব্যবধান কলমে ক্রিতিত করেছেন।

‘তিনি ব্রী’ (‘জল পড়ে গ্যাত নবের’, ‘প্রেরে নের’, ‘প্রভিবের’) উপন্যাসের প্রধান নায়ক চিত্রাধর বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টা এবং উদ্বোধনকালে তৈরি মানুষের প্রাথমিক রূপটি তুলে এনেছিলেন। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে যৌন পরিবারের ধারণা এবং সেই ভাঙনের ইংগিত। শূন্যরূপী তরুণমায়ার মূদ্রণি এবং সেই সঙ্গে রাজনীতিবিদদের পক্ষে পড়তে হয়েছে আরও কিছু দিন। যৌনপরিবার প্রথম পর্বের মতো হয়েছে। মূল্যবোধ আর্জনের রূপরেখাও এই উপন্যাসে লভা। আবার সেই মূল্যবোধে আবার হারানোর প্রশ্ন চকিত হয়েছে মাঝে মাঝে কোনও কোনও চিত্রাধর।

এই উপন্যাসেই হিন্দু-মুসলমানের মিলন-বিচ্ছেদের কিছু কিছু কথা বাংলা দেশে বাংলা 'প্রেম রোই' উপন্যাসে গৌরীকিশোর দত্ত বিবর্ত করেছেন। হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কটি লেখক কুটিলে সুচিরে দেখতে চেয়েছেন। দামাধর পদ নামে এবং সাম্প্রদায়িক প্রীতি প্রতিষ্ঠা দেখেছক ভূবরঞ্জন করের, নিজের কোথাও কোনও অপ্রিয় কথা-কথা উল্লেখিত হয়েছেন, কিছু কাহিনেও নিজের যুক্ত করেছিলেন গৌরীকিশোর দত্ত। আর অভিজাত পদে পণ্ডিত এতটাই প্রতিষ্ঠিত তাৎপর্য নিয়েছিলেন পদ মনে হয়। সেই কাহিনেই 'প্রেম রোই' উপন্যাসের পটভূমি তিনি এতটা বড় অঙ্কলকে নিয়ে চিত্রিত করেছেন। বালোদেবের এই গদ্য সমগ্র বাংলাদেশে নিখতিত মানুষের সেরে প্রয়োজ্য। না এরকম কাজ প্রচুর উদ্ভূত পারে। মূল্যবোধ বুলি, তারশঙ্কর বীরভূমের কান্দিয়া রজনা করেছিলেন। সোনারগাঁও কৃষ্ণ মন্দির হিম্মত করে কাকের কাহিনে। সম্পর্ক তারশঙ্করের মিলন পদে গৌরীকিশোরের অভিজ্ঞতা এবং নাও হতে পারে। কাজে লেখক দু'জন—দু'জনের দুটিভক্তি আলাদা হতে পারে। হুজুরত, শিমকরদের গুণ্ডার হুজুরত হুজুরত কৃষ্ণের সাম্প্রদায়িকতা, মানসিক পূর্বপদে মূলমন্ত্র মূলকর প্রাণনা সন্ধ্যার মিল থেকে। তৃতীয়ত, শূর্বপদে জমিদার মূলকর হিন্দু আর প্রজা মূলমন্ত্র। গৌরীকিশোরের প্রজা এই মূলমন্ত্রে মানসিকতা যুক্ত হয়েছেন। হাজারে জীবনবাহুর প্রজা হতে হয়েছে। 'প্রেম রোই' উপন্যাসে প্রজা সূচনা, ব্যাপ্তি, গভীরতা। গৌরীকিশোরের এককবো গুণ্ডার মূলমন্ত্রে হতেই। (পাশ্চাত্য উপন্যাসিকদের সেরে এটা এখন

পোষার একটা nor-m) মুসলমান-পরিভ্রমিত বাস করেছেন হয়েছে।
গম্বাযের মধ্যেই (টানা পোষেন) তাঁর পরিবার দৃষ্টে হয়েছে।
গম্বাযের স্তোত্রের সঙ্গী নিজেরও নৌকা তাঁর পরিবারে। গৌরীকিশোর
সাম্প্রদায়িক বাধা অতিক্রম করেছেন। প্রচুর পোষেন। তবে তাঁর
না পড়েছেন তার চাইতে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই অতিক্রান্ত সঙ্কর
করেছেন বেশি। ডকুমেন্টারি কাহিনীর মাত্রা তাঁর উপন্যাসে এরের
পত্র এক তরঙ্গ সঞ্চার করে যুক্ত করেছেন। কবিতা কবিতা নয়
একটু বেশি মাত্রাভেই ইসলামের ধর্ম, সমাচার, নীতির উৎস
সমকাল করেছেন। মানুষগণের জীবনব্যাপার এই ইসলামি সিদ্ধান্ত
কীভাবে রক্তে রক্ত পড়েছে তার সন্ধান করেছেন
গৌরীকিশোর। তেরোওয়াত, নবিসহ, কোরানের হাদিসের নিবিড়
অধ্যয়নের উজ্জ্বল নিদর্শন উপন্যাসটি উজ্জ্বল। অযায়র এই ধর্মের
মধ্যে কোথায় কীকরকার করে গেছে কী না গৌরীকিশোরের
সৈনিকও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। হিন্দুধর্মে যেমন সংস্কারকরা গৌরীকিশোর
মার্কসের দৃষ্টিতে কোমোরাভোর দাপট দিয়ে মেয়েই শিক্ত
মূল্যবান নয় মধ্যও এই মেতনা যৌর যৌর জেগে উঠিছেন।
গৌরীকিশোর উপন্যাস লেখার সময় যে-কালকাল ইতালির
ধারাবাহিকতার প্রেরণাধীন বৈধ দৃষ্টি দিয়েই মুসলমান সমাজকে
দেখছেন, হিন্দু-মুসলিম যৌর রাজনীতির যন্ত্রণার সন্ধানও এই
উপন্যাস লোক করেছিল। আনন্দিক বা আশ্চর্যের মধ্যে
দিয়ে পূর্ণকর মুসলমান হিন্দুধর্মের পরে যা ছুর এসে পৌঁছেছে
সেই স্তরে তার আশ্রয় সন্ধানের আশ্রয় অবিস্মার এবং তার প্রতিষ্ঠার
নিয়ে সন্ধানের দায়। গৌরীকিশোর এই সমস্যাগুলিকেও করেছে।

উপবিবেশনা-সিদ্ধিগণা যে ব্যাকুলি জাত সমগ্র বাংলাদেশে রূপান্তরিত হয়ে দিয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার যে ভৌম প্রকাশের কথা আমরা বলি তা অনেকবারই তুলে বাখ্যাত হলে বিদ্রোহণ ঘটত না, তার চাইতে বেশি স্বাভাবিকত্বিক ব্যাপারটাকে ব্যাখ্যাস্থ দেওয়া। গোপাল শিল্প-সম্প্রদায়ের উপস্থাপিত রূপান্তরের বহুদৈর্ঘ্য উপলব্ধি-শিল্প-সম্প্রদায়ের উপস্থাপিত যতটা হয়েছিল তা শতকরা এক শতাংশ। বাকি ৯৯ শতাংশই এই টোলা মাসাদা নিয়েছিল। এই এক মাসাদা টুলের দৈর্ঘ্য দশ শতাংশের বেশি ছিল কিন্তু তার বেশি নয়। আবার এই অঙ্গকায়ের নিয়ন্ত্রণই জরুরি কথা মুসলমানই ছিল স্বাধীনগণিত। গৌরীকায়ের এই পট্টাবলি পরিণত করতে হয়েছিল। এবং দেশোত্তরোত্তর রাজনৈতিক পরিণতির কারণেও একে পূলে এনেছিল উপলব্ধি তার উপন্যাস। ঐতিহাসিক যেমন ইতিহাসের সম্ভাব্য মুহূর্তে দৃষ্টান্ত এবং একেবারে কাছের সব কারণগণিত তা ত্যাগ করে যোগ্যে গৌরীকায়ের সেই পথেই অলসন করত। এও মধুর কথা কথ্য যে ১৯৯৩ সালের তার ভ্রম। ক্ষুধিত ভ্রম বাঝেবোরেই আক্রান্ত করেছে। মুখ্যত তার অভিজ্ঞ যশোরের জেলাই এই উপন্যাসের রঙ্গমঞ্চ। সেই ভাষাকেই তিনি অধিকাংশ চরিত্রের পক্ষে বিদ্যমান।

উপন্যাসটিকে তিনটি পর্বে সাজিয়েছেন ধৌরকিশোর। 'আওয়াতে হাসিনা' (সুন্দরী মহিলা), '...মধ্যখানে চর', '...কালবৈশাখী'। আমরা বলতে পারি প্রথম পর্বটি অস্ত্রবিরোধী আন্দোলন। বিশ্বচর হাজি সাহেব এবং তার মেয়ে ছবি বা বলকিস, স্ত্রী নয়মেনে হাজি শফিকুল, তার বাবা সাজ্জাদ এই শফিকুলের মায়ের কাছিনী। হাজি সাহেবের আত্মীয়স্বজন এই কাছিনীতে হান পেয়েছে। বিশ্বচর নামের বোন মূটকির আত্মীয়স্বজনের বিবৃতি দিয়েছেন। মূটকির মা ডাউডের উজ্জ্বল চৌবানকে লেখক যেন গুরুত্ব দিয়ে বর্ণনা করেছেন।

এই পন্থেই গৌরাক্ষর শ্রমদান সমাজের গারিবিক
চলিতের কণ্ঠ মধু বিকটি সত্যসত্যে উৎসান করছে।
শুক্লেট্টোনি এই পন্থেই গন্যমান্য পন্থেছে। এই সমাজের
ভাষকে ধরেছে চাইলে দেখে। শ্রমদান শ্রুটিটিও যাতে মন
করে সেটিকে গুণপাণি সজ্ঞান। ছবির সত্যে হয়েছ
ছবিফুলের। শ্রুটি গরিবদের অর্থিক সাজ্জার ব্যবসান
করছে। তুই হাঙ্গি সাধে সাধে শ্রুটিফুলের সত্য বিয়ে
করছে। শ্রুটিফুলের শ্রুটিফুল দিকে তাকিয়ে। আর ছবি তার
ছবিফোলা এবং কৈশোরে যে শিক্ষা, যে কটি, যে মধুর বাতায়ন
দান। শ্রুটিফুল তাকে শ্রুটিফুলে লেখক তার তাকিয়ে কটি করেছ।
শ্রুটিফুল মিলিয়ে শ্রুটিফুল কটি দেখেই তুমি ছবিফোলা মন, শ্রুটিফুল
কিভাবে যে ছবিফুলের শ্রুটিফুলে ছবিফোলা মন। আরও
শ্রুটিফুল যে সমাজ শ্রুটিফুলে শ্রুটিফুলে ছবিফোলা মন। আরও
শ্রুটিফুল তুলে ছবিফুলে শ্রুটিফুলে শ্রুটিফুলে মিলিয়ে
শ্রুটিফুল। শ্রুটিফুলের শ্রুটিফুল আর শ্রুটিফুলের শ্রুটিফুল
শ্রুটিফুলে উঠে আসে। এই শ্রুটিফুলের উৎসাহদান
শ্রুটিফুলের শ্রুটিফুল। এই অর্থ শ্রুটিফুলের কণ্ঠে পড়ে।

পিতৃহত্যা অনুমান বাংলা উপন্যাস ছুঁতে। বহিষ্কৃতের
পন্যাসই তাকে প্রমাণ। এই শাসনের স্বকৃপ স্বপ্ন নিয়েই পথে
বাংলা বাল্য উপন্যাসের পথ নিয়েছি অনেককাল পর্যন্ত
স্বাধীনতায় পিতৃহত্যা অনুমানো এখনও বোধ করি বাংলা
পন্যাসের অন্তিম একটী উপনিধান। গৌরবোন্মীয়া বাল্য উপন্যাস
তার সমস্ত অর্থ দিয়ে নির্ঘণ্টে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। যে জন্য বোধ
হবে তার উপন্যাস উঠে আসে কোরান, হাদিস এবং নবীহরে
বা। হিন্দু সমাজ প্রতিবেদী হতেও মূলমন্ত্র সমাজের পারিবারিক
মনে সহুদ্র দ্বারা অজ্ঞ। বহিষ্কৃত নিম্ণাই আছে। ভাই
বহিষ্কৃতের কথা কে না জানে? আমাদের মনে হয়েছে
গৌরবোন্মীয়া এই হিন্দু সমাজের কালো বাল্য তার প্রতিবেদী
পন্যাসের পারিবারিক জীবনের অর্থটি রচনা করবার প্রয়াস
হয়েছে। আর এই জানার অনিবার্যতা তিনি ছুঁতে ছুঁতে মুটিয়ে
ছোঁতে ছোঁতে। হিন্দু আর মূলমন্ত্র বাঙালি এই যে বিজ্ঞান
ও, গৌরবোন্মীয়া দেখিয়েছে, কত নবত্ব, কত অসীক, কত

মিথ্যা অনুমানের উপর দাঁড়িয়ে আছে। এবং যেখানে বিভেদ সংস্কারের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে, সেই সংস্কারের মূলেও যেন গৌরবিশ্বের আঘাত দিতে চেয়েছেন।

শ্রেম নৈঋত্য়দিকের আরম্ভে গৌরীকান্ধের চমৎকারভাবে তার অভিগম্য প্রবেশ করছে। দ্বিবি ও টার ইহা সর্বা। দুইদলই বিরাট। টাঙ্গের আরবি গল্প, গল্প দ্বিবি দুই বিস্ময়ে ও গুণ হয়ে ওঠে। বিভোর হয়ে বিলসিত নুনে যায় সিন্ধু টাঙ্গের দাম্পত্য জীবনের শিক্ষিক আদিশ সমস্যা। দাম্পত্য। বিলসিত যে কটি ও বাতায়নগে মেয়েদের অতিক্রম করেছে তার সঙ্গে ব্যবসায় চৌক্যিহি হয়ে গেল। যামিনী সঙ্গে ব্যবসায়ি হলে যে ওঠা সুখি হয়ে পাল্প বিলসিত যা পড়ছে, মৌল্যবির কাছ থেকে যে শিক্ষা পেয়েছে, কোরো মানসে স্থিতিস্থাপক সম্পর্কে যা নির্দেশ তারই বিজিত গায়েও যায়। বিলসিত বিস্ময়ে যে বিস্ময়ে তারই সর্বা মানব সত্ত্ব হয়। সর্বাশ্রয়ান ক্রিয় মূহুর হল না শেষ পক্ষ। মানবীলা শেষ করে তার আর বিলসিত উঠে এসে হল বিলসিত হয়ে দেয় টাঙ্গের। টাঙ্গ মূল্যমানের সম্পর্ক অতিক্রম ওঠে। কলসির কল সে ঢেলে দেয়। মাত্রিক কলসি হলে সে কলসি ভেঙেই ফেলেতে হয়। কলসির কল 'গাঙ্গাভ' গল্প গড়িয়ে এসে ওঠে। কলসির মূল্যমান কেননা মোটা মান কেউ নানী দিলেই নেমে যাচ্ছে। কোমটা সত্য? 'মোটা মার্গের' রেখা না মানবীলাকার কলসি হলে, নিভু মূহুর? লেখককে এভাবেই পেশ্যমান অতিক্রম করা মানেই তেজবিত্তের স্বপ্ন কানার অগ্রহ। তিনি বেছে হয়ে শিন্দু-মূল্যমানের মাধ্যমের এই দাগকে, সেও নেয়। মানব প্রের নেয়। প্রেরই হয়ে পাল্প এই কলসির সত্য। 'তীর্থ' শেষ ওঠার পরই প্রেরের ও অন্তিমা এই ভালবাসাকে বুঝেছে। দামিহিরই প্রের কাছ সম্পর্কভূত সূর্য্যদায় দেখে অমিত্যভার ব্যবসায় এই ভালবাসার কল মনে ছিল। পর পর তিনটি মামুষের কাছ বার্ষ হয়ে পাল্পে ভালবাসার এক বিজিত রূপ হ্রিষ্টম্বে, বিগলিত ধ্যাম অমিত্য ভালবাসাকে পেয়েছি। কিন্তু মামুষের সমস্যাের সন্ধান অমিত্য প্রেরই। মামু নিস্রম 'প্রের হই'—উপকাল শঙ্কিল নিকিরি চম্বীর সন্ধান অমিত্য প্রেরে কটি মেয়েকে বিয়ে করলে যাকে সে ঠিক নিস্রম করে নিতে পারে না। এই এতটা অনুভব করায় অমিত্য বৈশ্য। শঙ্কিল বি.এল পাশ করে এসেও যা দামিহির পুরের মান ভান, বা সামজ্য কটি অর্থাৎ পাঠ বোনে। কিন্তু পাঠেই বিজিত ভালবাসার এমন সঙ্গে ব্যবসায় অমিত্য ও উপকালগে কোকাস হাচ্চা কোকো ও উপায় থাকে না। পাঠের দর নেমে যায়। মহাজনের মতো, স্বার্থপরতার এই মূল্য। সামজ্য কটি অর্থ পাশ বাজার, এর মূল্য নিস্রমি আর নেমে পড়ে। বাজিতে অমিত্য হাফকার, দর অমিত্যিক উপাহরণ গৌরীকান্ধের দিগেছনে বশিরের সমস্যাের সন্ধান অমিত্য প্রেরের পাশে। ক্ষুদ্র তারস্রয় মেয়েরা ক্রিয়াকার মূল্য মানির মেয়েরা গলা চিৎসে ধায়। চিত্রকর্ম মূল্য শঙ্কিল নিস্রম

বাড়িতে নিয়ে আসতে চায় তখনও সে দ্বিধাজড়িত। সে দেখে এসেছে প্রচণ্ড ম্যালেরিয়ায় বাবা দুৰ্বে। কঁধার পর কাঁধা ছাপিয়ে তার উপর পাটের বোঝা দিয়ে কাঁপুনি খামায় শমিকুল। ভাল বেশের প্রসূই নেই এখানে। ভাল খাবারের প্রসূই নেই। বিবাহের পর হবিক এখানে নিয়ে আসতে তার ভাবনার কথা সহজেই বোঝা যায়।

কিছু ছবির প্রত্যাশা, আকাশিকা, শাস্ত্রির আদর্শ কিকিৎ আলাদা। সে কথা আগে বলেছি। ছবি মানিয়ে নিতে চেয়েছে এই অতল-অনমনের সমস্যাতে। ভা, আশা ছাপিয়ে ছবি শমিকুলের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। প্রায় পৌরাণিক সাহিত্যীর সমর্থন ছাড়া অন্যদিকে টগর, লালসা, জোলেগর কান্দিরা তার চিত্রে এনে দিয়েছে স্বামীসাহায্যের বার্তা। বসিমাছ সূর্যমুখীকে তুলে এনেছিল মেয়ে তার অসঙ্গ তুলনা না করেও বলা যায় গৌরবিশ্বের নড়ো অনেকটা সেইরকম। ছবি অন্যায়ের শমিকুলের পাণের দুলা ফালি দিয়ে মুছে নিতে পারে। ছবি তার মেয়েবেলা আর ইচ্ছানুরে মনের নিয়ে স্বামীর দর করতে গিয়েছে। মা বাবার একতারা সেবায় ফেটেও ঘনিষ্ঠতা সে অর্জন করতে পেরেছে তা সে শেষেই রোমাণ্টিক প্রবন্ধকান্দি পড়ে।

শমিকুল নিজেও রক্ষণশীল। সেও কোরান, হাদিস, নবীগণের নির্দেশের কথা জানে। তার ধর্ম আত্ম আত্মিক। কিন্তু কলকাতায় মিস পালিত তাকে আর এক মস্তিষ্ক দীক্ষিত করে। সে সব মেনে নিতে পারে না, আবার প্রত্যাখ্যানও করতে পারে না। শমিকুলের মধ্যে কেগে ঠেটে উল্লসিত সমাজ আর হাফের মনোভা ভ্রান্তি মিলেছে সমাজ। সে দেখে করি দ্বিমিত্রের অস্তিত্ব। সুতরাং ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় সে মিস পালিডের সঙ্গে দৃষ্টি রেখে কথা বলে এবং একটা সন্তান জাগিয়ে রাখে মিস পালিডের প্রতি। এ সন্তান মিস পালিডের বিবকে কেন্দ্র করে, এমনকী পালিডের গোটা জীবনযাত্রাকে কেন্দ্র করেছে। এখানে সম্পর্ক প্রায় অনুপ্রস্থিত-অনুপ্রস্থিত, শমিকুল সেইভাবেই মেনে নেয় না। এই হৃদয়কে শমিকুল টান মেরে ছিড়ে ফেলেছিল। সন্তানকে সঙ্গে যেতেই সেম কেগেছে তা শিশুগোপন পরিহিত নাইটদের কথাই শ্রবণ করিয়ে দেয়। মিস পালিডের নির্বিড় আশ্রয়ে শনি ছাড়া শমিকুল। সে সুযোগ পালিডই করে দিয়েছিল। কিন্তু শমিকুল তা গ্রহণ করতে পারেনি। এ কেবল মধ্যবিত্তের দ্বিধা নয়। নিকির যন্ত্রের জোয়ালকাঁখে একটা মানুষ।

প্রায় যখন শমিকুল দ্বিধা এল তখন সে টোপে শিল্প প্রদায়ের সঙ্গে তার দ্বিধাঘট ঘটে গেছে। প্রায়ের মাটির গন্ধ সে রক্তে শায়, বাবার কাছে এসে অতীতকে চুয়ে যায়, মা-কে আগের দিনে ফিরে আসতে চিত্তে বসে। কিন্তু এল শমিকুলের মন হয় এসব কৃত্রিম। সে পালটে গেছে। হবিকে সে যুদ্ধসভারই গ্রহণ করে, মিলনে সন্ধমে সে শিশুণ্ডি হয়ে ওঠে আর কেবলই পুরুষের পাখির সংকেত সে সচেতন হয়। আগেই বলেছি ছবির ভাঙ্গা কিকিৎ আলাদা। ছবি

অবশ্য শমিকুলের স্পর্শে নিজেকে চিনে নিতে চেয়েছে। বসিমাছের নায়িকার মতো তুলে বানানে সে শমিকুলকে চিত্রিত করেছে একবার। এটা সে জানে নায়ীর ধর্ম আত্মিকের, স্বামীর সেবাই তার কর্তব্য। 'প্রতিবেশী' উপন্যাসে গৌরবিশ্বের বেগম রোকেয়ার বই থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে সেবিদ্যেছেন নারীমুক্তির কী আশ্বর্ষ সব দ্বিধা সেখানে সঞ্চিত। পুরুষের বজ্রজতির প্রসঙ্গে দৃঢ়ভাবে বিচার দিয়েছেন বেগম রোকেয়া। 'সেমে নেই' উপন্যাসের ফিকিৎ এই আশঙ্কায় উদ্বেজিত করেছে যে তার কোনও বাহ্যের শমিকুল 'নারায়ণ' হচ্ছে বা হবে। ভালবাসার উৎসেই এই আশঙ্কা একটা বড় প্রতিবন্ধকতা। এই প্রতিবন্ধকতায় ছবি ভুগেছে। শমিকুলের আরগেব দুক্ক হলও সে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠতে পারেনি। কেননা শামুল্লাবানর মতো অপরায় সে করতে পারে না। প্রতিবাদ মানে সোচ্চার তার স্থান। এই সম্ভবতার স্থানে লেখক তার মনোবাহু নিবন্ধ রেখেছেন। বলা বাহুল্য গৌরবিশ্বের মূলসমান সমস্বরে অস্বস্তি অংশের ভূমিকাকে বিবৃত করেছে।

শমিকুল নারীমুক্তির একটা আদর্শ চেয়েছিল কলকাতায়। হাইস্কুলের প্রতি ব্যবহার বা পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়া আর কিছু নয়—শমিকুলকে পুণ্য, লজ্জায় কুণ্ঠিত করেছিল। তার চিত্রায় রেখাপাত করে নারীকে 'নারিয়ে' রাখা নয়, পুরুষের 'আফ্রেল' যতটা মেয়েদেরও আকর্ষক ততটা—এই বোধে সে রূপান্তরিত। পুরুষের ইমান আর নারীর ইমানও যুগসম্পর্ক। ছবি কেন পারবে না সে মাত্রায় শৌক্য। শমিকুলের চিত্রায় এই মাত্রা মধ্যবিত্ত মানসিকতার। পিছার ললও বলতে পারি।

এখানে বলে নেওয়া প্রয়োজন গৌরবিশ্বের তাঁর উপন্যাসে ফিকির চরিত্রের অবতারণা করে, মূলসমান সমাজের আর এক গোষ্ঠীর ধর্মবোধ, তাদের শর্ন, তাদের আচরণ, তাদের সংস্কার সমাজ সমুদ্রে ধারণার পরিচয় দিয়েছেন। শীর্ষ ফিকিরদের প্রসঙ্গে একটা 'মিথ' তৈরি হয়ে গিয়েছিল শিল্পী সমাজে প্রায় হাজার বছর ধরে। হিন্দু মূল্যবোধে নারীশ্রমে পীরত্বিত মধ্যযুগের ধর্মসাধনার একটি বড় পর্যায়। ইতিহাসের বিচার এখানে নিম্প্রয়োজন। আমার বলতে পারি শীর্ষ ফিকিরদের প্রতি দেশপীরের ভাৱ ভক্তিতালবাসা বাস্তবিক জীবনযাত্রায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সকল জীবের প্রতি ভালবাসা ফিকিরের কথায় বাবার উজ্জ্বলিত হয়েছিল এই উপন্যাসে। হাফি সাহেবের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতি। শমিকুলের বাবা-ইচ্ছার পরেই ফিকিরের নির্দেশ। শমিকুলের উল্লসিতগর বাসনা জাগিয়ে দিয়েছিল পীরত্ববোধই। হিন্দু-মূলসমান উভয় সম্প্রদায়ের উৎসাহে শমিকুল এগিয়ে গিয়েছে। অন্যদিকে ছবির জীবনও প্রত্যক্ষ পক্ষেই ভাবে পীরসাহেবের ভূমিকা কম নয়। সুফি বাবাদের উদারতা এই পরিবারে স্থায়ী হয় পীরের ভালবাসার মন্ত্রে। শমিকুল যখন সাম্প্রদায়িকতার শিকার হয় খুল্লনার চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে তখনও

যে সে বিব্রত ভূত্বতে পারি পীরের বাণীতেই। প্রেম নেই—নয়, প্রেমের বিস্তার যে তখনে তখনে ভাবে মান্য করতে শমিকুল যেন খারও লজ্জা হয়। তার সৌখ্য দিকটাই হয় না। এই সৌখ্যের কাড়কী পীরসাহেব। মুড় পীরা সাহেবের উদ্দেশ্যে প্রত্যেক মানুষের শ্রদ্ধাভক্তি ভালবাসার যেসব ধর্মীয় বাণী উজ্জ্বলিত হয়েছে আশা বৈশ্য ইসলাম ধর্মে মানুষের প্রতি প্রেম প্রেমের কথা। এই পাশাপাশি গৌরবিশ্বের সাক্ষ্যে সেসব মাঝে মাঝে যৌলি সোচ্চার অতি সাধারণ সব উচ্চারণ, তাদের আচরণে ধর্মভিত্তা, তাদের বাস্তবিক জাতির প্রতি অসজ্ঞা। গোটা এই ছবিতে সোচ্চার মূলসমানের বিধি দিয়ে যেতে চাইছে আরব মুসলিম। সেমে চেয়েছিল শামুল্লাবান নাম বাস্তবিক নিজেই নাম ভূমি দিয়ে দিতে। আবার হিন্দু সম্প্রদায়ের শিক্, শিক্তভজনও মুসলিম বিব্রত কীভাবে প্রকাশ করেছে সেখানও গৌরবিশ্বের সাক্ষ্যে তুলে আনেন। এইই মধ্যে গৌরবিশ্বের থেকে তোছেন পীরসাহেব, সাক্জন, শমিকুল, যেকোনো-কে। কিন্তু বড় মাগে প্রত্যেক ব্যক্তিত্ব ছাড়া শমিকুল ছাড়া কনি দিয়ে পাগিয়ে যায় হৃদয়করা। ফলে এই মানুষটি হয়ে যায় এটা, দ্বিধা, নিঃসঙ্গ। প্রেমিক দ্বিধেই কাহন হয় একটা অন্ধকার।

শমিকুল ছবির ঘন সারিগো নিজেকে নতুন করে গড়ে তুলতে চাইছে। রোমাণ্টিক যন্ত্র সে খনন বিভোরে। শমিকুল যেন মেলাতে চায় সারেশী নাইট, নিবেদিত আর কোম রোকেয়াকে। ফিকিৎ সে মালি দেয়, নারীর মাগে। প্রেমের আশা থেকে শমিকুল একটা অবশ্যন সরিয়ে বেলে। টান মেরে ছিড়ে দেয় জীর্ণ কানকে। গৌরবিশ্বের প্রেমের আয়োজন করেছেন ঘটা করেই, সেহে তৃপ্তশমনকে বিধিয়ে দিয়েছেন নিকি আফ্রেলের মতো। শমিকুলের শরীর ভুজ্জ তখন তরুণ পুরুষের মুখ। হবিরও পরম সুখ নিজেই তৈরি করে বাবার উচ্চারণের কাছে সোম্পণ করতে। পারশ্পরিক সংঘর্ষ আর আবেগের উচ্চারণটা সাহেব উৎসেই কমন করিয়ে দেয়। ছবি সেমে সাক্ষ্যেই ডেমেই শমিকুলের ছবির সাক্ষর অশেখা প্রেমের মূল্য মাত্রা নিয়ে আসতে চায়। অবশ্য ছবি শিকার এবং নতুন 'পাঠ'। কমনও কমনও ছবি বুকেই পারি না শমিকুলকে। গৌরবিশ্বের তাঁর উপন্যাসে 'আজগোটে হাফানা' শব্দ বেশিকম কোরান হাদিস, ফিকির বাণী উচ্চারণ করেছে। কী করে আশ্বর্ষ গৃহীত হওয়া যায় তার অনুশূন্য হিন্দু পাণ্ডা বাবা এই সব ধর্মতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্বের। পারশ্পরিক আবেগে সাবেক কালের ধারণাগুলি বাস বেঁধে আছে। পরেও কোরান ইত্যাদির কথা গৌরবিশ্বের নিটর সঙ্গে উল্লেখ করেছে। কিন্তু প্রথম পর্ব থেকে তা অনেক কম গেছে। গৌরবিশ্বের উপন্যাসে এই সহজাত রচনাশৈলী লক্ষ্য করবার মতো। আনুসঙ্গিকমানে দেখেছেন মূলসমানদের রচিত ভাল উপন্যাসে এইরকম রচনাশৈলীই পরিচয় দেয়। এ থেকে আরও অন্য়ম করলে পারি লেখকের অভিজ্ঞতা। কী সে অভিজ্ঞতা?

প্রতিবেশী হিন্দুসমানের অভিজাত বা অধিকশ্রেণী মূলসমান মধ্যবিত্তের তৎসার রূপান্তর কালের সঙ্গে মিলিয়ে লসার প্রসঙ্গ।

ভালিক, বহুবিবাহ সমুদ্রে নতুন চেতনার জাগরণ লক্ষ্য করি। হিন্দু-মূলসমানের বিভাজনের বোঝা যেভাবে বিধিয়ে আছে তা বিব্রত বিশেষ কতগুলি ক্ষেত্রে। কিন্তু হিন্দুসমানের অস্বস্তি এবং দাপট যেখানে সেখানে বেধতে পায় তাদের চিত্রায় পরিবর্তিত। উপনিবেশ থেকে যতদূর সম্ভব পাশ্চাত্য চিন্তাকে হিন্দুসমান গ্রহণ করেছে। এর ভালমন্দ বিচারের জায়গা এখন মূলভূমি থাক। অন্তঃসূচক হিন্দু সম্প্রদায়ের পরিবর্তন বোঝা দিয়েছে তা বড়ই শনি পদে হোক না কেন। মূলসমান সমাজ এটা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছে। শমিকুল তো পালিত পরিবারের সঙ্গে কলকাতায় থেকে এই পরিবর্তনকে দেখেছিল। সে চাটখিল তার পরিবারের সেরকম করে গড়ে তুলতে। আসলে সে বুঝতে পেরেছিল মানুষের বিচার মানুষের মূল্যবোধেই। সেখানে হিন্দু মূলসমানের মধ্যে কোনও ডেব্রিভেড নেই। উপন্যাসে বারো বার হাফি সাহেবের হাফিগেজ দিয়ে চমৎকার প্রবন্ধের প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়েছে তাও হিন্দু কনিবাদের ঠেককথানায়ও হুজ্জ পাওতে। কিন্তু না, এখানেই গৌরবিশ্বের খেমে যাননি। হবিকে গিরে যে ভিত্তি মানুষ প্রথমে আশা পাই—মা, ঠিকানা আর বাবা—উভয় সাক্ষ্যের ছবিতেই ভালেবাসা, সন্তানেরও মা-বাবার প্রতি অবদান, জামাইদের জন্য মা নয়মানের যে উৎসবের আয়োজন, জামাইকে তোরায় করা, হাইয়ে, যারের বাবাশুড়ি যে ভূমি গৌরবিশ্বের তাঁর ভিত্তি-এই উপন্যাসে তুলে এয়েছেন। ছবির মূলধর্মবোধিত যোগ্যতার প্রকাশে উপন্যাসে যে দৃঢ় এবং ভিন্ন গৌরবিশ্বের লিখেছেন তাও উমার শিরে ব্যক্তি যোগ্যতার সেক্ষেই তুলনা করা যেতে পারে। এই 'কিন্মা' প্রতিবেশী মূলসমান গ্রন্থের ব্যক্তিগত নিভা সম্বোধিত হচ্ছে। কিংবা ঠাকুরা নাতনির জন্য কারা—অজস্র উৎসব-উৎসব, ষ্টাটাইনার উভয় সম্প্রদায়ের প্রতিদ্বন্দ্বি। মিসি মুকুন্দের বোন-খি' সঙ্গে হাসিতামাশা এবং মাসির দ্বিতীয়লীও ডেব্রিভেডকে মনে করিয়েই দেয় না। ফিকিরের কথা আগেই বলেছি। টগর-ছবির সবচেই এই ন্যায়ের। শমিকুলের পরিচয়গর জীবনের পারিবারিক ছবি সাক্জন আর চাকিরির মাতৃসহেই হয়ে উঠে যায়। শমিকুলের মা-কে ভোলানোর চেষ্টা, ফাপের জন্য উৎসব সর্বই তো উভয় সম্প্রদায়ের সৃষ্টিঃ বিরহমিলনের বিশিষ্ট ছবি।

যে-সম্ভট ছবিকে পুরুষের চিত্র তৈরি হয়েছে তাও হিন্দু মূলসমানের যে কোনও দর্শনিকদের তৈরি হয়েছে পাওতে। শমিকুল চল এসেছিল একলাতি ব্যবসার দিকে। এটা একটা সগ্রামের মতো। এই ব্যবসা প্রায়শই হিন্দুদের লক্ষ্যই ছিল। মূলসমান উকিল ছিল না এমন নয় কিন্তু সাক্জন তা নয়না। চাকরিতে মেজারি সম্প্রদায়ের মানুষ মাইনরিটি হয়েছে এটা একটা স্বাভাবিক কথা। অসব কটনের দিক কাগও কাগও মনে হতেই পারে। যেমন পালিডে অত্যাচার রক্তচাপন মহাজন অধিকারই

হিন্দু সম্প্রদায়ের। সে সব কথায় পরে আসছি। শমিকুলের নিজেই কল্পিত আসি। উদ্ভাষিত পরিভ্রম করে সে সাক্ষ্য বাড়িতে মিলেছে হরিবর অত্যাচারের জন্য নিশ্চয়ই উদ্ভূত থাকত। কিন্তু আমরা দেখি হরিবর এককরমের হীনমান্যতার ভোগে। দেহনানের জন্য সে সর্বদা প্রস্তুত। হরিবর নিজেই মনে করে সে শূন্যের ভোগের সামগ্রী। বলা বাহুল্য ওকালতির সূত্র কৌশল নিয়ে শমিকুল হরিবর সঙ্গে কথাবাদী বেশিদূর নিয়ে যেতে পারে না। তা হলে এই নির্বাক্তব প্রকৃতি শমিকুল মনের শিশুপাশকে কী দিয়ে মেটাবে? হরি যখন প্রতিভা ম্যালেসিয়ায় বেঁচেই পড়ে আর নিম্নোক্ত যখন শমিকুল হরিবর মুখানুখি হয় তখন হরিবর সে দীর্ঘের দীর্ঘ করে তোলে। ওকালতি বসায়তে ব্যর্থতা শমিকুলকে অস্থির করে তুলেছিল। আর হরিবর হেঁচক শব্দে এসে বাশমানদের প্রিয়তা আহুত। আর তার অন্তর মথিত করে হাতকায় জেগে উঠেই মৃত্যুর জন্য। যে মুচুকি হামি দাঁড়ের বিদ্যামাতকতায় জড় হলে আত্মহারা হয়েছিল। তখন সে অতীত হার। তিরিকভাবে সেই ডাং হার একটা ছায়া নিষ্কার করে। ছায়া কাঁপতে থাকে। হরি বলে শমিকুল তার উপর নারাজ হয়েইছে। সে কথা চাইছে শমিকুলের কাছে। গ্রীষ কতই সে পান করছে পারছে না। শমিকুল কাঠের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিরূপতার কথা ডাব। এই অবস্থায় একটা বিরতি শমিকুলকে দেবে বসে। সে বিরতি একটা ভূমিকা তৈরি করে এই দশপতির মধ্যে বিচ্ছেদের পথ।

শমিকুলের দারিদ্র বাড়তে থাকে। ওকালতির রাজনীতিটা সে বুঝে নিতে চেষ্টা। শমিকুল প্রতিষ্ঠা থাকলে ওকালতিতেও হাত প্রকৃতি পাওয়া সম্ভব। শমিকুলের পর উকিলের কাছে সে জুনিয়র হয়ে থাকতে চেষ্টায়ে কিন্তু নিকিয়ার চম্বীর ছেলেকে কেউ-ই সে সুযোগ দেয়নি। অন্যদিকে শমিকুল শূন্যের অত্যা প্রচলিতও এসেছে। এটা তার কষ্ট করে। হলেও কথকতা হরিবর। হরিবর বুঝতেই স্কুল হয়। অশক্ত বৎ সে শ্রমীকে দিতে পারে না। কিন্তু শমিকুল ব্যর্থতার প্রাণী ভুলতে তার হরিবর সঙ্গে সম্মতি। হরিবর থেকে প্রত্যাশান করতে তার শিকার হয়। শমিকুল আত্মনির্ভরতা ভোগে। বিবির অসম্প্রতিভাও সে সঙ্গমে লিপ্ত হয়। এখানে মথাবিত মনুষ্যমান হরেক্ষত্রিয়ারবাহকে গৌরবিকেশের নিপুণতাকে বলে ধরেছেন। শমিকুল হীনমূল্যমানের বিবাহ কেনোবাবর মিলি। কানিনামা বা নেনমোহর ইংরেজের আইন এ ডিভ অফ সেল। নিমিত্ত মূল্য কল্পিত কন্যাকে কিনে নেয়। তা হলে সে তো সত্যিই বিলকিসের কন্যা বীরি মনে করছে। গ্রীষ ইচ্ছার বিরুদ্ধে, গ্রীষ সম্প্রতি না নিয়ে সঙ্গমে লিপ্ত হওয়া নারীধর্মের সম্ভব। শমিকুলের মনে হল সে আলমতের আসামি। উকিল তাকে ধরনের দায় দেখী করছে। আর্ত শমিকুল তখন কানিনামার উপরই নির্ভর করতে চাইছে। সত্যিই হরি তার কন্যা বীরি।

শমিকুল তার মনোভাব প্রকাশ করে হরিবর কাছে। হরিবর মনে

হয় মায়ের কথা "শরীল গ্যালো তো জেনেদিয়েই বরবাব"। হরিবর মনে হল সে শমিকুলকে সন্তুষ্ট করতে পারছে না। একটা শূন্যতা হরিবর প্রাস করে। শমিকুলকে বলে। দু'ছানের টানপোন্তে কিন্তু দুটো দৃষ্টিকোণের, হরিবর সম্মল নলিহত আর শমিকুলের বৃত্তি আইনের। প্রেম যেন কুহুর উপর দিয়ে চলছে। হরিবর শমিকুলকে বারবার নারাজ করে এবং করে। শমিকুল দূর্বল সাহেবে হরিবর বরতে চায় কিন্তু কানিনামা যানে "কেনা বীরি" এটা সে মানতে চায় না। প্রতিদ্বন্দ্বিতা মনে তীব্র হয়ে ওঠে।

গৌরবিকেশ এখানে আবার বিবর্তিত শমিকুলমানের দুল্লতা এবং তার থেকে উত্তরণের প্রচেষ্টাকে লিখতে চাইছেন। মথাবিরের এই বিবাহ অনুশ্রিত কালের। হরিবর দৈনন্দিন-নিয়মে কিছুটা আলগা হয়ে যায়। এই উপন্যাসের অন্তর্নিহিতচেয়েই মূলমানেরও শেষ পর্যন্ত দারিদ্রের চাপে মহাভ্রমের কাছ থেকে সুখ নিতে বাধ্য হয়। পরিবেশ এবং কালাভ্রমের সঙ্গে স্বপ্ন ধর্মের গোঁড়ামি যে শিলি হয় নাহুৎ গৌরবিকেশের তাকুৎ খোবাত খোবাত। কিন্তু হরিবর ধর্মের বেরাটোপ থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না। হরিবর সারাবাণী জন্ম বাগের কাছে চলে গেছে। জন্মদীর্ঘের মেয়ে সইলু তার দেখানো করে। জন্মদীর্ঘ তার চিত্র দ্রুতিবাহিত। ছেলে চাকরি না পেয়ে বর্মপ্রবাসী। মূলমানের একা সে চায়। মৌলির ক্রিয়ামর্মে আহুতান জন্মদীর্ঘ। মেয়ে সইলুকে লেখাপড়া শেখানি। মেয়ে লেখাপড়া শিখে কী করবে? সইলুকেও মেনে নিয়েছে এ জীবনকে। শমিকুল মামলার ছেরে পালিতকে এ মামলার ছেরে মনন করে। আত্মদত্ত রিগ্রায় সে তখন বিবাহ। কখনও হরিবর কখনও পালিত ভেদে উঠেই উপরিভুক্ত তখন সে সইলুকে বুকে টেনে নিল। তার সংঘর্ষের বীধ ভেঙে গেল। সইলুকে জড়িয়ে আদ্রয়ে "অশ্রু" সুখের রমণীয় উভাত। হরিবর পড়ে শমিকুলের শরীরে। ক্রিয়াকর্মের মথাবে শমিকুল মনে চেতনা খিরে পায়। নিজেই চাকরিতে চায় শমিকুল। এই আত্মদত্ত শিলিত মূলমানের। অন্যদিকে লম্পট, অপারূ নদিত বাইতির বউকে বুকে ধরে এরকম দাহই ভোগে না।

৪

হায়কুল শমিকুলকে বুঝিয়েছিল মূলমান আজ কী সঙ্কটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। আমরা এখানে মূলমান তথ্যের আশ্রয় নিয়ে উপন্যাসটিকে বুঝতে চেষ্টা করি। আমরা দেখি ১৮৮০ সালে উচ্চপিতার হার এইরকম : বি.এ. পাশ মূলমান ৩০৮, এম.এ. ৪৫, বি.এল. ১১৬, এম.বি. ২, বি.ই.এ. আর হিউমের হার এইরকম প্রাপ্ত সম্প্রদায় বি.এ. ১০৪০, এম.এ. ২২৪, বি.এল. ৫১৪, এম.বি. ২০, বি.ই. ৯। বাংলাদেশের জনসংখ্যা তখন অদম্যুপায়ী অনুগামী মূলমান ৫২-আর হিউ তুলনায় অনেক কম। চাকরিতে ১৯১১ সালে অনুপাতিক বি.এ. সার্টিফিকেট ১৯১১, মূলমান ২, আইনজীবী ১: ১, চিকিৎসক ৫: ১, শিক্ষক

৭:২ এবং পুলিশ সার্টিস ২১ : ১। মূলমান চাকুরিজীবীর মধ্যে আবার গৌরবিকেশ মূলমানও ছিল। হায়কুল এইরকম বৈষম্যের কথা বলেছিল নিশ্চয়ই শমিকুলকে। এইই মূল চাকাকে কেন্দ্র করে জাগরণের যন্ত্র দেখেছিল মূলমান সম্প্রদায়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে হিন্দু জমিদারের সংখ্যা ছিল সংখ্যায় বেশি, মূলমান জমিদারেরাও আবার হিন্দু জমিদারদের সঙ্গে বিশেষ প্রজ্ঞাপ্রদানে সমান উৎসাহ দেখিয়েছে। ফলস্বরূপ হক এলাসেই তাঁর আশ্রয় দেখতেছিলেন। কিন্তু নিম্নোক্ত ফলস্বরূপ হক হল ৩৬ আর মুসলিম লিগ পেন্স ৩৯। রাজনীতির কুটিলতা এবং জটিলতা এই পথ দিয়ে ঢুকে পড়ল। হায়কুল নীরব প্রোক্ত শমিকুলকে জিহবে কয়েকটি কলকাতার মানুষ কী ভাবছে? শমিকুলের উত্তর, কলকাতার কোলাহলের মধ্যে সে দেখতে পায় এগার গম্বা ওগার গম্বা, মথিগোলা চর। শিবে সনাকরণের মতেই সে একা। গম্বার থিয়ারা ডাং করে নিজেই বড় সম্প্রদায়ের। হিন্দু-মূলমান চরিত্রের মধ্যে বদলেছে ইতিহাসের ভূমি। আসলে এই বিজ্ঞানজনের বৈরিতা আর হিংস্রতা ব্যাঙ্গার জলবায়ুতে তখন বিস্তৃত হয়ে যাচ্ছিল। আর অতিক্রমণ মূলমান জগৎ দেখতে পেল ১৯১১ সালের নির্বাচন মূলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে পাঁচ জন সোহরাওয়ার্দী, দুই জন খান্না, পাঁচ জন সৈয়দ, এক জন নবাব। প্রজ্ঞার কী আশা করছে পাঁচ এদেশে কাছ থেকে? গৌরবিকেশের ফলস্বরূপ হরেক সখী হয়ে দেখালেন আসলে সমস্যার জড় অর্থনীতি প্রকল্প। সেজন্য তার উপন্যাসে সাজান, বশির, বাণু ইত্যাদি প্রজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত। তারাও উপন্যাসে মুখ্য চরিত্র এবং তাদের সৃষ্ট ঘটনা উপন্যাসের পরতে পরতে। কানহুদ মিহরের তোরগম এক দৃষ্টান্ত। গৌরবিকেশের সম্মিলিত ভাবনায় (হিন্দু-মূলমান) তোরগমের মূল্যবোধকে তাঁর উপন্যাসে এঁকেছেন। বাণু (হিন্দু) যখন প্রায় ছেড়ে ছেড়ে যেতে চায় তখন সাজ্ঞানের অঙ্গ এয়ে ছেড়ে না যাওয়ায় জন্য তার কাতর মনিত এই উপন্যাসে দীর্ঘ ছায়া দেবে। দুই সম্প্রদায়ের মেরে বিক্ষণ প্রেমের কান্না হাফাফার। উপরিভুক্তের জুল-বোম্বাখি, গোঁড়ামি, মোহান্তর আর দুর্ভাহিত তরুরে জটিল জালে বৈশি প্রজ্ঞা-কৃৎ। রাজনীতির মধ্যে ন্যায়নীতির পোষাক নেই।

শমিকুল হায়কুলের কথায় বিচলিত নিশ্চয়ই হয়েছিল। কিন্তু পরে গৌরবিকেশের একটি দৃশ্যে দেখিয়েছেন যার লাইব্রেরির উকিলের আড্ডার বহকে সেখানে সম্প্রদায়ের যে বৈরিতা ডাং কখনও কীমালো, কখনও সন্ধীর স্বার্থের চিকিৎসা, কখনও ধর্মকীর্তি। অন্যদিকে হায়কুলের বক্তব্য সে সম্পর্ক মেনে নিতে পারেনা না। হায়কুলের চিত্রা স্পিরিটি আর কলকাতার কোলাহল-দুই-ই-তার কাছে অপরী। এখানে প্রেমের পিষ্টটিকে সে পান না আর কোলাহলে নিজেই কী হারিয়ে দেবে। আবার কবে গম্বার সমাজদার থিয়ারা দৃশ্যেই হারিয়ে দেবে।

হায়কুলের যন্ত্রণা কিংবা উত্তরণের সর্বকথক শমিকুল উপকণা করতে পারে না, কিন্তু কথেরসের আদর্শ, গোটা ভারতবর্ষের জন্য তার বৈশা, হায়কুলকে সে মেনে নিতেও পারে না। আদর্শ তাকে সরিয়ে দিয়ে আসে উত্তরণের। কথেরসের রাজনীতিতেও সে বীতপ্রভ হয়ে ওঠে। হিন্দু মূলমানের শূন্য ভোট ব্যবস্থা শমিকুলের কাছে পরিত্যক্তা, আবার সেই কথেরসেই যখন তর্পণশীল জাতির জন্য শূন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতার দাবি করে শমিকুল তাকে বুজিয়ে পারে না। সে সরে আসে কথেরস থেকে। রাজনীতিতেও সে একা হয়ে যায় কিংবা মৃতিময়ের কয়েকজনকে সে নিজের মতে আশ্রয় দেবে।

মূলমান সম্প্রদায় নতুনভাবে যখন সাম্প্রদায়ের জাগরণের প্রস্তুত তুলেছে তখন তারা সর্বত্র দেখেছিল হিন্দুসম্প্রদায়ের আশ্রয়। হায়কুল বেছেছে বিজ্ঞান নিয়ে বি.এসি পাশ করলেও বিজ্ঞানের লগ্নেইই হিউর অধিকারে, সেখানে মূলমানদের মায়াগা নেই, জন্মদীর্ঘ দেখেছেন তাঁর ছেলের চাকরি হয় না, চাষীদের মধ্যে সমতত্ত্বো হিন্দু জমিদার, হিন্দু মহাজনের বিরুদ্ধে। এখানে মর্থ একটা খান করে নেওয়ায় অনুকূল পরিবেশ পায়। বার লাইব্রেরির আড্ডায়ও দেখতে পাই মূলমান চরিত্রকে হয়ে করেছে। নির্বাচন যখন আসে তখন কৃষক সে ডাং আনু তালসে সব বুঝেও, সম্প্রদায়দত্ত হানাহানি নিশ্চল। জেনেও সমসংকেতের কওয়ের কথা বলেন। তিনি নিজে নির্বাচনে না দাঁড়িয়ে এক মৌলবিকে দাঁড় করিয়ে সেনা মূলমান প্রগ্রহ বহনগরেনে জন্য। গৌরবিকেশের মৌলবির হিউর কথায়, বাসাহকে চিত্র এঁকেছেন তা উপন্যাসের দিক থেকে একেবারেই বৈমান। মোল্লা-পুরোহিততন্ত্রের সঙ্গে মূর্ত হয়েছেন সাম্প্রদায়িক রাজনীতি। রাজনীতি সব বলেই ছিল। কিন্তু ঔপনিবেশিক পরিস্থিতি তার চরিত্র পালটে দেছে। সেজন্য লাইব্রেরি আশ্রয় নিতে হয় একরকম রাজনীতির বুঝেশের, আর কলকাতার রম্যমানকে পরতে ছয় সেই বুঝেশের অন্যদিত। শমিকুল প্রজ্ঞা পুরি প্রাণীকে দেখে সার্টিফিকেট হারান মনে করেছে। শমিকুল রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেনি। দূর থেকে একজন দর্শকের ভূমিকা পালন করেছেন। আর আদমবাব তাকে সক্রিয় হয়ে উঠতে সাহায্য করে না। উপন্যাসের দিক থেকে শমিকুলের ভূমিকা কিছুটা আলগা। গৌরবিকেশের সাজ্ঞা, বশিরকে রসকেতে যেভাবে তুলে এঁকেছেন। শমিকুলের ভূমিকা মহাভারতের সঞ্জয়কে মতো। হায়কুলের মধ্যে সে মূলমান সম্প্রদায়ের উত্তরণের বিশেষ যেতে পারে না। তার মনে হয়েছে দেশের মানুষ কী সবই মূলমান? মৌলবির মোল্লাদের বসন্তের তার মনোভাব অত্যন্ত কঠোর। এক একজন মথামের স্পিরিটি মতক পাশ কাটা নির্বক। কিন্তু মথামের শূন্য কথ। যে-মানুষ এ প্রস্তুত তোলে সমস্যার উত্তরণের মুহুর্তে সে তো একা হয়েই। মথিককে এক আদর্শ ব্যক্তি মোহাতের চৌধুরী বলেছে মূলমানের

রক্তে দুই ত্রিহোর টান। এক বিদেশগত আর এক বাংলায়, ভাঙছে। সে জন্য নজরুলের পক্ষে হিন্দু পুরাণজ্ঞা সম্ভব, স্বরীভাবগত পক্ষে তা সম্ভব নয়। ভারতের সামান্য কবীর মত নাসিক ভৈরবের আবির্ভাব হয়েছিল। কিন্তু দেখা গেছে তা বাস্তবসম্মত মেনে নিতে পারেনি উভয় সম্প্রদায়। আইডিয়াল বাস্তবকল্প সম্বন্ধে। শম্ভুকুল এইভাবে তিচ্ছ করেছ। তার দুটি উদাস, হারানো, ভাবঘরা। সে কেবল ভারতীয় সামান্য স্বকীতা বেছেছে, সমাধানের শব্দ বলে দিতে পারেনি। হযত সমাধান তার হিন্দুতে নেই। 'অভিযোনি' উপন্যাসে শামিম সাদিক স্যারের কাছে এসে ডিভাইড ইন্ডিয়া তাগশর কুইট ইন্ডিয়া। হিন্দু-মুসলমানের একা সম্ভব নয়। সাদিক স্যার জিয়ার দলে। এমনই করেই শম্ভুকুলও দেখে ভারতীয় সামান্য ব্যবচ্ছেদ। শম্ভুকুলের মনোভাবগত তত্তে আলাদা লাগে। সে হয়ে যায় একা। যৌরকিশোর একের পর এক ঘটনার সংযোগে শম্ভুকুলের নিঃসঙ্গ চেতনার বিপর্যয়ের চিত্রগুলি শনাক্ত করতে থাকে। কৃষক প্রজাপাটিক চেয়ে মিনি নাজিমউদ্দিন, সাহেবরাণি। অর্থ আধার জানি (আদ্যাদেশ রায়ের লেখা থেকে) নাজিমউদ্দিন বাংলাই জানেননা।

স্বরীভাবগতও এই সম্ভবতঃ মুখোমুখি হতে হয়েছিল অন্য প্রসঙ্গে। গোয়ার মতো তেজস্বী শম্ভুকুল নয়, ভাঙেদামপুরের মতো কাহিনী যৌরকিশোর তৈরি করতে পারেনি। গোয়ার মতো ফৌজী, একদলীয়া চরিত্রের অবতারণা যৌরকিশোরের আয়ত্তে নেই। মনো শম্ভুকুলের একাকীতার অর্জনে উপন্যাসে পরিণত হচ্ছে। তার মা'র চান্দবিবির প্রহরকে সে আঁকড়ে ধরেছে চায়, কিন্তু সে বোঝে তার মা 'ভায়া ভানানী আঁকু'। ঘটিকের মন পানিত হয়।

চান্দবিবির কাহিনীটা এই উপন্যাসে সে জন্য জরুরি হয়ে পড়ে। দারিদ্র চান্দবিবির আত্মজ্ঞানকে শিষ্ট করে। যান ভানানী চান্দবিবির আনন্দ সম্পূর্ণ ক্ষুদ্রবিধা। সেও শেষ পর্যন্ত বোঝে 'ছাওয়ালা মণিক আমার কত দুঃস্থ হলে গেছে'। চান্দবিবির মন হল সে নিজেই সন্তানকে চেয়ে না, চান্দবিবির 'আজুজি বিকুসি মনে', 'ডেকে ডেকে তার হারানো ছেলেকে খুঁজতে লাগল। ফটিকা ফটিকা'। এই আরও দখনি প্রচারের পাট, ধান, মানুষ পরিকল্পনা ছাপিয়ে ভেঙ্গে উঠতে উঠতে উপন্যাসে। ইতিহাস এগিয়ে যায়, কিন্তু বর্তমান ভবিষ্যৎকে আলাদা করে স্মৃতিত আলাদাশে মুটে-ওঠা নজরকে মানুষ ব্যাপ্ত করে নেবে অস্পষ্টায়, আশায়, প্রত্যাশায়।

এই যন্ত্রণার মধ্যে শম্ভুকুল মিলি পালিতের টেলিগ্রাম পায়, সে

নীচের আদালতে হারা মামলায় উচ্চ আদালতের ক্ষেত্রের খবর আসে। উকিলদের কাছে শম্ভুকুল 'শাচা শামুক' কিন্তু এ টেলিগ্রাম শম্ভুকুলের আত্মজ্ঞানকে ফিরিয়ে দেবে, 'ভার' (শম্ভুকুলের) আত্মজ্ঞান তার অধিকারবোধ এবং তার জীবনী। এছাড়া রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এক হয়ে গিয়ে তার মনের মধ্যে তোলপাড় করে দিচ্ছে। এই মুহূর্তে সে ঘরিকে চাইছে, চাইছে মিলি পালিতকে। ছবি তাকে বুঝবে। আর লতিকো? লতিকো অন্য প্রহর মানুষ। ছবি? ছবি তার আটপৌরে অস্তিত্বের ভিত্তি। ছবি তার বিবি। ছবি তার যখন। লতিকো বেবেগেতে হুঁহী। হুঁহী। বাংলা উপন্যাসে শম্ভুকুলের এই ভাবনা নতুন কিন্তু নয়। অর্থমজুরের যৌরকিশোরের কথা মনে পড়বে, মনে পড়বে তারাপাছরের নিতাই কবিরাজের কথা। কিন্তু শম্ভুকুলের পারিপার্শ্বিক, নিজের সমাজ, বিশেষতঃ কর্মজীবনের নীতি উকিলদের তার প্রতি ধ্বং এবং হিন্দু-মুসলমান উকিলদের জাতিভেদ মনোভাব যৌরকিশোর এমনভাবে সাজিয়ে দিয়েছেন যে পাঠক হিন্দু-মুসলমান বিভাজন-সেবার বিখ্যা এবং কটিকের সম্বন্ধ বুঝে নিতে পারবে। শম্ভুকুলের মামলার জয় প্রতীকী। সত্যের উদঘাটন। শম্ভুকুল আবার উঠে দাঁড়ায়। অবশেষেই মানুস্ব্যকে টান ঘেরে তুলে আসেন যৌরকিশোর ভক্তিমার আর স্বাধীনতার বিরুদ্ধে। টানটান করে দাঁড় করিয়ে মনে সাম্প্রদায়িকতার হারানার কাঠগড়ায়।

৩

যৌরকিশোর তৃতীয় পর্বের নাম দিয়েছেন 'নিরাপত্তে কালেশোখী'। প্রথম দুই পর্বে শম্ভুকুল হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে। এই হয়ে ওঠা আয়তপ্রসারিত। তৃতীয় পর্বে শম্ভুকুল দূরেই থাকছে। একটা অকলমে উভায় উত্তেজনা থেকে কটিকটা সিরিয়ে নিয়ে শম্ভুকুল নিরাপত্তাভাষণে বিচার করছে। দারিদ্র, পারিপার্শ্বিক সম্পর্ক, কৃষকপ্রজা, মুসলিম লিগ, কংগ্রেসের রাজনীতি সবই সে লক্ষ করেছে। হত্যাণা ভাঙে গয়া করছে। এবারে মনে কালেশোখী ঝপিয়ে পড়ল শম্ভুকুলের উপর।

দুই শিবিরে বিভক্ত হিন্দু-মুসলমানের লড়াইয়ে সে তৃতীয় শিবিরের গুপ্তার অস্থির। এসব মানুষ তো একা হয়ে যাচ্ছে। নিবিলেশ 'চিদ্র' বাছের' এক হয়ে যায়। এমনকী গোয়ার লড়াইও (তা একটা লড়াই। তবে নিবিলেশ আর শম্ভুকুলের সাদৃশ্য বেশিরূপে টানা সম্বন্ধ হতে না। নিবিলেশ মাঝে মাঝে হতসাহ হকি' ডেডে পড়ে না। কল্যাণ আরাধিতের সে যিঁহু। সে পর্যন্ত সে দান্দার মধ্যে ঝপিয়ে পড়ে। শম্ভুকুল বিপর্যস্ত। আর ছবি সরে যেতে থাকে তার কাছ থেকে। শম্ভুকুল শূন্যে তার মা 'কোয়ার ছেলে'র ফটিক, অথবা 'কেনেও মায়াবায় আমার শিকার জায়েলা না কেন?' ছিলায় চাবীর ছেলে। লেখাপড়া শিখলাম। আর অমনি বিজ্ঞায় হয়ে পড়লাম পরিবারের থেকে। দাম্পত্যজীবন তার কাছে এখন অভিন্ন। সে একাধারে দর্শক এবং অভিনেতা-ই-ই।

দাম্পত্যের বিধানায় দেহের দমন থাকে না, চুকে পড়ে দেশকাল। শম্ভুকুলের মনে পড়ে জেগেদার কথা, 'প্রচেষ্টা অত্যাধি মানুষ অমানুষ হয়ে ওঠে। প্রেমই মানুষকে কাছ টানে। প্রেমই জাতিপাত এই সবার থেকে চিহ্ন ভঙিয়ে দেয়'। ঘটিক বিচার করে 'আমি কতটুকু ভালোবাসি! আমার মায়া আমার মা আমার বিবি শুরুর শাশুড়ী, আমার ইশকুল, কল্লেরের বন্ধু কাক?' এই বিরাট শূন্যতায় শম্ভুকুল ভগিয়ে যেতে থাকে। যে উত্তাল ঘূর্ণি আকাশ জুড়ে বায়ু হস্তিনে সেখানে শম্ভুকুলের ভূমিকা নথ্য। কিন্তু এই ঘূর্ণি দান্দী শম্ভুকুলের চিত্রায় ধরা পড়তে থাকে। শম্ভুকুল মনে নিজেও আবিষ্কার হতে থাকে। তাকে এই ঘূর্ণি ভাড়া করতে পারে। হিন্দু জমিদার আর মুসলমান জমিদারের মধ্যে সে পার্থক্য কেহোতে যায় না। শোষণের এয়া সমগোত্রীয়। কিন্তু সন্দেহ এই হিন্দু মহাজন বেশি। প্রজাপাটিক, রাজনীতির কুটনীতিতেও দক্ষ। যখন ফজল হকের কথা বলছে, জমিদার-মহাজনের উচ্ছেদ চাইছে, তখন শম্ভুকুল দেখতে পায় মুসলিম লিগ প্রাণী যোদ্ধাকারের সাগরের ছবির আত্মীয় এবং সেইসমূহের প্রেমপ্রাণী দাঁড় উঠে এসেছে এই বাহুরচনায়। যৌরকিশোর কি এখানে দুটি প্রসঙ্গকে জড়িয়ে দেবার জন্য নতুন কিছু উদ্ভাবন করলেন? শম্ভুকুলের সূক্ষ্ম চিত্তার জালের সঙ্গে দাঁড়ের মোটা কাহিনীটাকে একত্রেও বাঁধতে চাইলেন সম্ভবতঃ লেখক। রাজনীতির সঙ্গে শম্ভুকুলের প্রেম ভাবব্যাপ্ত মিলাতেই যেতে থাকে। কৃষক প্রজাপাটিক প্রাণী (মৌলবি) বাহুরে কখনও মনে হয়েছে শম্ভুকুলের তিনি 'যেমন বড়দের কাছে লজ্জানু ভিত্তিক করে বোঝাচ্ছে'। কখনও কখনও মনে হয়েছে মৌলবি সাহেব সাহেবের রি-মাস্টার-দর্শকদের কায়দা কৌশল দেখাচ্ছে। দর্শক কখনও কৌতুকী, কখনও উদাসীন। শম্ভুকুলের মনে ছা প্রজাপাটিক নিষ্ঠা প্রহর। তুলনায় মুসলিম লিগ প্রাণী যোদ্ধাকার ফজলুর রহমান অনেক বেশি শক্তিশালী। তার বক্তৃতায় মুসলিম জাহাজের যন্ত্র।

আগলে শম্ভুকুল প্রথম প্রজন্মের মুসলিম মধ্যবিত্ত। তার টানেগড়েনে জীর্ণশাকানো। বাহুরাই সূতো হিঁড়ে যায়। আশ্রয় যাবার পরেই যে সেখানেই গুটি ভেঙে বেরিয়ে আসতে চায় তখনই মনে হয় সে তুল করছে। ছবির প্রতি বাহুরাই যে নিজেই নিজেই অপর্যাপ্ত মনে করত। ছবির প্রতি ভালবাসা শম্ভুকুলের জীবনে অভিন্ন প্রথম।

দুর্গা জিহ্বায় যখন শম্ভুকুলকে জানালেন ছবির সত্তারের মতুকে রোধ করা যাবে না। মা-কে বাঁচাতে গেলে সত্তারের মতুকে মেনে নিতে হবে তখন শম্ভুকুল মনে নিরাকর্ষ নির্বিশ্বাস। তার কথা বলছে দুর্গা জিহ্বায়? এমন নৈর্ব্যক্তিকভাবে আশা হচ্ছে

কেমন করে? মুক্তি নিয়ে দেখলে এই মুহূর্তে শম্ভুকুলের এই নৈর্ব্যক্তিকতাকে সমর্থন করা যায় হযত। কিন্তু ছবি মনে দূরে, বহু দূরে।

হাসপাতালে এসে সে সবিধ ফিরে পায়। হাসতে থাকে ছবি। ছবি বেঁচে উঠুক। শম্ভুকুল সন্তাননু হয়। অগ্রসরী দুনিয়ায় মানুষ সবিধ ফিরে পাক। দীর্ঘ প্রত্যাশায় সে নবজাগরণে আহ্বান জানাবেন, ছবি আদেশে ভরপুর হয়ে উঠবে শম্ভুকুলের এই প্রার্থনা এখন। পরাজয় সে মেনে নেবে না।

ইতিমধ্যে নিরাচলনের সংবাদ আসে। মুসলিম লিগ জমী। ফজল হক লিগের সঙ্গে কোয়ালিশনে যাচ্ছে। শম্ভুকুল আবারও একা হয়ে যায়। শম্ভুকুলের সামনে দুটো ইকোয়েশন মিলে যায়। দটে যায় 'কংগ্রেস-প্রজা কোয়ালিশন মারা গিয়েছে। ডুমিঠ হতে পারেনি। কিন্তু কার জন্যে কাকে দোষী করব আমি? হক সাহেবকে? কংগ্রেসকে? কাককে?' ছবিও সন্তান জন্ম দিতে পারেনি, কষ্ট, আর কষ্ট। ফাঁটরেরও কষ্ট। সন্তান না পাওয়ার যন্ত্রাঙ্গাষ্ট শম্ভুকুল হারানোর বেদনায় সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। দুঃস্থ ছবিরপাটী তাকে শঙ্কটুর মতো তড়াহু করে দিয়েছে। ছবির মৃত সন্তান এই উপন্যাসে প্রতীকী রূপে বিন্যস্ত হয়েছে। শম্ভুকুলের ভালবাসার পাত্রকে বৃষ্ণ করে দিয়েছে। একা হতে হতে ছবিকে সে বাহুরে মনে আসে। 'কোথায় আমার ঠাই ছবি? এ যে আমার কী কষ্ট টুটে তা বুঝবে না। কেউ কী বুঝবে?' সমুদ্রের জেই আছড়ে পড়তে থাকে বাতির তীরে।

'প্রেম নৈহ' উপন্যাসে শম্ভুকুলের জীবনব্যবহারে উভাচক খোয়ার মালায় যৌরকিশোর মুসলিম মধ্যবিত্তের জারায় এবং কৃষক প্রজা মধ্যবিত্ত কাহিনী তুলে ধরছেন। রাজনীতির ভক্তিমি, নীচতা, কুংসিধে বিকটিকেও যৌরকিশোরের দূশের পর দূশো তুলে এনেছেন। এই ত্রুটি উপন্যাসে পরিচালনার সময় যৌরকিশোর একটা উপনিবেশের লোকখা আমাদেবে শোনাবেন এই আকালঙ্কা করেছিলেন। উপনিবেশের উগান, বিচার এবং তার শক্তনের বীকপটিক উত্থি লক্ষ করেছেন। দীর্ঘ চট্টোয়ায় এই ইতিহাস বর্ণনা করেছেন বিস্তারিতভাবে। তার দুই শিল সমাজতাত্ত্বিকের, জনাতিক অমলেশ ত্রিগাণী কংগ্রেসের ইতিবৃত্ত রচনায় স্বাধীনতা, জাতিয়তাবোধ এবং বাহুরির ট্রিটবিবরণী সজ্ঞাতের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। আবহাওয়া রমূল কৃষক সংগঠনের ইতিবৃত্ত রচনায় বিভিন্ন সময়ে কৃষকসত্তার, কৃষক অসংগঠন এবং কৃষক সংগঠনের কথা বলেছেন। যৌরকিশোর এসব প্রব্ধ মনোভাব দিয়ে পড়েছেন নিচুই। তার অভিজ্ঞতা অথবা হিন্দু-মুসলমানের তিক্ত-মধুর সম্পর্কটিকে বিভিন্ন চরিত্রের মধ্য দিয়ে দেখানো।

বেশকণ্ড ভিতরজন দাশের প্রতি যৌরকিশোরের প্রভা বাহুরে বারে উজ্জারিত হয়েছে প্রথম ও তৃতীয় উপন্যাসে। এম.এম.রায় চুকে পড়েছেন তৃতীয় উপন্যাসে 'প্রতিবেশী'তে। এম.এম.রায়ের

শিখাভাষা বিখ্যুতভাবে ছড়িয়ে আছে। এবং এই তথ্যটিই যেন শেষ দুটি উপন্যাসে স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে দলীয় রাজনীতি অপসার। বিবেক, সংস্কৃতি, সত্যতা, মানবিকতাই মানুষকে মুক্তি দিতে পারে। সে জন্যই কি শফিকুল, তয়েবকাকা, হরিবরকাকা, শামিম, অমিতা পাটিল কাজে সক্রিয়ভাবে যোগ দিতে পারেনি? এরা সকলেই দেশকালের মধ্যে থেকে চিন্তাগ্রস্তনে পদচারণা করেছেন, করেছেন। সে জন্য দুই ঘটনাপ্রসঙ্গে এইসব চরিত্র কীভাবে পড়েছিল। তৎকালীন রাজনীতির বিশ্লেষণ এবং অসারতা এদের দূরে ঠেলে দিয়েছে। এরা বুঝতে পারল না 'একলা চুলা বে' মন্ত্র নিয়ে স্যান্সারী হওয়া যায়। 'শেখ' সমাজপরিবর্তন দলীয় কার্যে যা না থাকলেই উদ্যোগ অচাঞ্চল্য না থাকলে তাদের আদর্শ কখনও-ই বাস্তবে রূপায়িত হবে না। পাটিল ব্যবস্থার বিকল্প হিসাবেও এই উদ্যোগকে ভাবা যায় না। এদের রাজনীতি-অলোচনা অনেকটা ভূমিকম্পের মধ্যে সীমাবদ্ধ। শফিকুল-শামিম ('প্রতিবেদী') বাঙালিও অলোচনেনে বিশ্লেষণে অধির হয়েছেন সত্য কথা, অমিতা-ছবিও তাই কিন্তু তারা সমষ্টির সঙ্গে একাত্ম হতে পারেনি। স্বপ্নময় লড়াইয়ে (রাজনৈতিক উপন্যাসের গোড়ার কথা) এরা নিঃস্বস্ত।

শেখ দুটি উপন্যাসেই চরিত্রগুলির দুটি নামের উল্লেখ পাই। কিছু উদাহরণ দিই : শফিকুল-ফটিক, বিলকিস-ছবি, অমিতা-

মুক্তিক। একটা পেশাকি আর একটা আটপৌরে। কিন্তু তলিয়ে দেখলে মনুষ্যের মধ্যে লেখক যেন দুই সত্তার অস্তিত্ব শীকার করেছেন। অথবা এরা দুই ফোটিতে অবতরন করছে। একটি ফোটিতে আছে উনিশ শতাব্দীর বহুদোষ, দ্বিতীয় ফোটিতে আছে মধ্যযুগের আশা আকাঙ্ক্ষা, যার ধ্বংস বারো বারো উচ্চারিত হয়েছে। রোপে (কাশান) অমিতা ভায়েরিত্ত থেকে 'কোনও ভালুপ নেই। আদর্শের কোনও ভিত্তিবিহীন নেই, নিস ইজ ওফেনট ল্যান্ড।' যে মুক্ত মন নিয়ে অমিতা তার প্রেমকে উজাড় করে দিয়েছিল তার বর্ণনা পাই 'প্রতিবেদী' উপন্যাসে: 'ফুলকি এক টানে বুকের ওপর থেকে কাপড়টা সরিয়ে নিল। ব্লাউজের যেতামফুলি পট শিট করে বুড়তে লাগল। ব্লাউজ খুলে ফেলল ফুলকি। অমিতা দেখেছে। কাপড়টাকে খুলে ফেলল ফুলকি। অমিতা দেখেছে। ফুলকি দেখে এখন শূন্য ঘায়া। আর কিছুই নেই। ফুলকি বিছানায় শূন্য পড়ল। নগ্ন হতনে হাত রেখে ফুলকি অশ্রুটি আঁত হুরে থেকে উঠল শামিম। সেই অন্ধকারে অমিতা দেখল শামিমের ছায়া এসে ফুলকিকে একেবারে ঢেকে নিল।' অমিতা ফুলকিকে দেখেছে। কী দেখেছে? ছায়া। অসুরান যৌবনের এই ট্রাজেডি এই গ্রীষ্ম উপন্যাসে। সমরেশ কসুও তাঁর 'মুগ্ধ মুখা জীয়ে' উপন্যাসে ওই রকমই নগ্ন বিশৃঙ্খলিতের ছবি একিচ্ছিন্নে শিল্পী ন্যায়ককে দিয়ে। কিন্তু সে উপন্যাস ভিন্ন গোত্রের।

প্রবন্ধ

বাংলা উপন্যাসে স্বল্পালোকিত অন্য এক সমাজ

বন্দনা রায়

গত কয়েক বছর ধরে কয়েকটি সাময়িকপত্র, শাব্দীয় সংখ্যা এবং প্রকাশের মুসলিম সমাজজীবন সম্বন্ধে কিছু লেখা প্রকাশিত হচ্ছে। অবশ্য, এ বিষয়ে ইতিপূর্বে কোনও লেখালেখি হয়নি, এমনও না। যৌরকিনার যোমের লেখা 'প্রেম নেই' আমাদের খুঁটির নিকট পরিধির মধ্যেই বিবাজ করে এবং সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ পাঠকের অতি পরিচিত লেখক। নাম 'খুঁটি' একেবারেই 'অগোছালো' ভাবে উল্লেখ করা হল। তবে, এ প্রসঙ্গে কিছু বহু সহজে অনেকের নাম মনে আসে না। অথচ প্রতিভার অকণ্ঠ বর্ষণে এ বছর কথাসাহিত্য অত্যন্ত সম্পদশালী।

সাহিত্যিকদের এই একচর্যার কারণ কী, সে কি এই বিষয়ের প্রতি লেখকদের ভঙ্গীমানতা, না কি সচেতন পরিহাস? না মুসলিম সমাজের রীতি-নীতি, আচার-আচরণ সম্বন্ধে অপ্রসন্ন জ্ঞান? এ বিষয়ে শরহুদও তাঁর এক মূল্যমান বন্ধুর মধ্যে সংলাপের কথা মনে পড়ে। বহুদূটি শরহুদকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন— 'আশানার আমাদের কাছে টেনে নিন। প্রেহের সঙ্গে, সহন্যত্বের সঙ্গে আমাদের কথা বলুন। নিছক হিন্দুর জ্ঞানেই হিন্দু সাহিত্য রচনা করেন না। মুসলমান পাঠকের কথাও একটুখানি মনে রাখবেন। দেখবেন, বাইরের বিশ্লেষণ যত বড়ই দেখাক, তবু একই আশঙ্কা, একই বেন্দনা উভয়ের শিরার রক্তেই যায়।' উভয়ের তিনি এক আদর্শক কথা জানিয়েছিলেন। বলোহিনেন, 'ভালো কথা'র সঙ্গে মশ কথায় যে গল্প সাহিত্যের অপরিসীম অঙ্গ। কিন্তু এ ত তোমরা না করবে বিচার, না করবে ক্ষমা। হতে এমন দণ্ডের ব্যবস্থা করবে, যা ভালোও শরীর শিউরে ওঠে। তার চেয়ে, যা আছে, সেই ত নিরাস।'।

অশরের ধর্মীয় সিদ্ধান্তের নিজেদের সীমিত জ্ঞান সহ্য করে প্রকাশ করবার সজ্ঞাত বোধেই সাহিত্যিকদের এ বিষয়ে নিঃস্বার্থী করে তুলেছেন। যৌরকিনারের মতো 'ক'জন' আর কোরান-হাদিসের কথা অত সঠিকভাবে জানেন? যাদের ঐতিহাসিক দৃষ্টি আছে, যারা উপলব্ধি করেছেন দেশবিভাগের পেশেখা রাজনৈতিক

চক্রান্ত আছে, কিংবা দেশ ছেড়ে এসে ফেলে আশা দিনগুলির শ্রুতিচারণ বীরা করতে চেয়েছেন, তাঁদের উপন্যাসের ফাঁকে ফাঁকে হতে মুসলিম সমাজ ও চরিত্র উঁকি দিয়ে গিয়েছে। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ লেখা সংখ্যায় অতি নগণ্য।

পঞ্জিক্কিনেন ঐতিহাসিক চরিত্র বা নিম্নপ্রণীয়া মানুষ নিয়ে মূল্যমানমন্ডল নামান ভাবে নানান সময়ে আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু সাধারণত প্রেম-বিয়-মিলন নিয়ে, সংঘাত-সমস্যা নিয়ে শহরের মধ্যবর্তি মানুষ, সব উপন্যাসে যে জায়গা পেয়ে থাকেন, প্রায় কোনও লেখকই তন্ত্র ও শিকিত মূল্যমানদের জীবন নিয়ে লেখেন না।

মুসলিম লেখকদের মধ্যে কারও অতিথ্যেও আছে যে, 'হিন্দু সম্পাদকেরা নাকি মুসলমান নাম শুনলে একটা মেমেন দীতলতা অবস্থান করেন, ছাপেন না।...সম্পাদকেরা নাকি—ভাবেন মুসলমান ছেলের মস্তিষ্কের ডেলিকট লেন্দগুলি ভয়ানক দুর্বল। মস্তিষ্কের "থার্ড অববীট"র বিশপ্জনক ভাবে মধ্যদূরীয়। প্রিমিটিভ।'।

এ প্রসঙ্গে একটা কথা থাকে। বাংলাসাহিত্য, সৃষ্টিসম্পদে এমনই পরিশীর্ণ যে, জায়গা করে নেওয়া সেখানে বরাবরই কঠিন। আভ্যেকের অনেক প্রথিতযশা লেখকই 'সম্পাদকেরা কঠিন প্রসিদ্ধবর্ধের পর লেখা ছাপার অন্ধর দেখতে পেয়েছেন।

কখনও কখনও লেখকের পারিপার্শ্বিক সমাজ হতে তাঁর ধর্মীয় পরিচয় ভুলতে দেখে না। তাঁর বোধ দৃষ্টিকে প্রসারিত হতে বাধ্য দেখে। তাঁকে বরাবর মনে করিয়ে দেয়—'আপনি মুসলমান। যাই শিশুন, যত কিছুই শিশুন, যত বড়ই হোন, মুসলমান আপনি। এ কথা ভুলবেন না। ভুললে চলবে না।' এভাবে শাসনবধ যেমন চিনি থাকতে পারেন না, কেমনই তিনি 'স্বপ্নিম'ও না, 'ওয়াশিম'ও না। 'সাহিত্যিক'ই তাঁর একমাত্র পরিচয়। এ কথা একজন মুসলমান লেখকই আমাদের জানিয়েছেন। ঐতিহাসিক নানা কারণ প্রাক স্বাধীনতা যুগেও দুটিময় লেখকই মুসলিম

সমাজ নিয়ে কিছু সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। তবে শহুরে শিকিত মুসলমানদের কথা তখন গল্প-উপন্যাসে আর বর্ণনায় উপস্থিত হলেও, স্বাধীনোত্তরে পূর্বে সে সমাজ নিখালি প্রায়।

একই ভাষা-সংস্কৃতিতে বর্ষিত বাঙালির সাহিত্য জিজ্ঞাসায় এ বিষয়টি এক অনিবার্য প্রশ্ন হিসাবেই এসে পড়ে। তথা অনুসন্ধান সাহিত্যভিত্তিক প্রক্রিয়াক্রমে করে আসাটাই সনাতন সৃষ্টি এবং বর্ধিতমাত্র এই বৌদ্ধ কৃষক বর্ণের প্রথম নাম।

১২।২।

মুসলিমসমাজকে বর্ণিত্বের পরিচয় ছিল 'মোগল বিশ্বধর্মী' হিসাবে এবং তাঁর লেখার প্রত্যন্তরে বিপরীত চিত্র অঁকতে গিয়ে মুসলমান লেখকদের মৌলিক সৃজনশীলতা ব্যাহত হয়েছে। ১৯৮০ সালে বাংলাদেশের নাবি লেখিকা রিহানা রহমান তাঁর 'অনিশিত উপন্যাসে' ১৮৬১ সালে সুন্দরবন অঞ্চলে রহিমউল্লাহ ও তাঁর পরিবারের অন্যান্য ও নিহৃত হত্যাকাণ্ডের তদন্তে 'ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট' হিসাবে বর্ণিতমাত্র সেই ইয়েজৎ আমলে সে নীতিকারের পরিচয় দিয়েছিলেন তার প্রকৃত প্রণয়া করেছেন। অশ্রুত, সেই সঙ্গে এই অভিযোগও করেছেন যে 'বিক্রোধান্দ্রা' মানুষ বর্ধিতমাত্র, বীর কবন 'ধারাল তবাবির মতো', সেই 'সাহিত্যিক বর্ধিতমাত্র' শোভাবোধক উপন্যাসের মাধ্যমে এর প্রতিবাদ করতে পারতেন। কিন্তু 'ডেপুটি বর্ধিতমাত্র' সে কিক থেকে 'মুখ নিরীহরিয়েছেন'।

বর্ধিত মেনে মুসলিমসমাজ নিয়ে উপন্যাস লেখেননি, তবোই লেখেননি বর্ণনাত্মক ও উপন্যাস নয়, কেবলমাত্র মুসলিম সমাজ নিয়ে শব্দভাণ্ডার করে 'মহেদা'। 'হিউরি গায়ে' কবসাককরী মনুদের যক্ষ্মা ও তদনিহিত সমাজের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তার প্রতিবাদ সামগ্রিকভাবে স্পষ্ট, পীড়িত, অসহ্যের দুশ্চার শব্দভাণ্ডার লেখেননিও বরং। কিন্তু 'মানুদে' মনুদে বর্ণনাত্মক এই যে মানুদের হাতে গড়া গতি। এ কথাটা ওগোনের নিয়ম নয়—'বীর লেখনি এই প্রসঙ্গ-নির্ভর, তিনিও কিছু 'কোনও উপন্যাস মুসলমানদের জীবন নিয়ে লিখেন না। শ্রীকান্তের 'ধর্মী চরিত্র বা 'শরীফসমাজ' এবং অন্য কোনও উপন্যাসে হাত এ আলোচনা একই আদর্শ এখানে। এর কারণ বুঝতে গিয়ে তাঁর সত্যাত্মক কল্পনিকের প্রতিভাধর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। সেখানে তিনি ফেলেকবোর এক শিক্ষকের কথা মনে করেছিলেন, যিনি লেখকদের 'আমার আদেশ রইল, যা সত্যিই জানো না, তা কখনো লিখো না। যাকে উপলব্ধি করনি, সত্যানুভূতিতে যাকে আনন্দ করে পাননি তাতে ঘটা করে, আত্মহরণ থেকে, পাঠক ঠিকিয়ে বড় হতে ও না।'

এই উক্তির শোনাশ্রয় কথা শ্রবণ করেই হাত তিনে এ প্রসঙ্গ উপন্যাসে আনতে চাননি। অতঃপর তাঁর সমসাময়িক লেখক কয়েকজন সাহিত্যিকের কল্পিত মুসলিম সমাজ ও মুসলমান চরিত্র নিয়ে একাধিক

উপন্যাস ও ছোটগল্প লিখেছেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন জলধর সেন, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, চাকচক্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলবালা ঘোষাচার্য প্রমুখ। মুসলমান অসুখিত বর্ণনায়ের ভাগ্যলগ্ন অঞ্চলের বাসিন্দা ছিলেন তাঁরা।

জলধর সেন তাঁর 'করিম সের' উপন্যাসে কৃষক পরিবারের সুখ দুঃখের কথা লিখতে গিয়ে জানিয়েছেন 'ধর্মী করিম সের'র মতো শোকেবা তাঁর আলাদা পরিচয়। তাঁই তখনও কথা সেজে লিখে গিয়েছেন। 'শরাদমাত্র ও অন্যান্য কথা এই কৃষকজীবনের নৈশনিশ দটনার কথা। তাদের সামাজিক নানান সমস্যা নিয়ে লেখা।

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অভিজ্ঞান' তৎকালীন মুসলিম সমাজে উক্ত প্রশস্তি দেয়াছিল। চাকচক্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মা', 'চুড়িওয়ালা' প্রভৃতি গল্পও বাৎসল্যরস যে সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ ভাবে সব মানুষের মধ্যেই নিহিত, সেই পুরনো কথা সংকলনে বলায় জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। কিন্তু এ বিষয়ে বীর নাম বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য, তিনি হলেন শৈলবালা ঘোষাচার্য।

১৯১৭ সালে (১৩৪৮) অর্থাৎ অষ্টম থেকে দশম শ্রেণি বরষ আগে একজন বিধবা মহিলা এই শৈলবালা কিক করে 'সেখ আমুর' মতো উপন্যাস লিখতে পেরেছিলেন, তাবলে অবশ্য হতে হয়। দুটি তরুণী—একজন অবিবাহিতা অপরজন বিবাহিত—এই 'আমুর'কে ক্রয়দান করেছিল, যে ছিল তাদের 'মোটর ড্রাইভার'। এই প্রেমকাহিনী কোনও পরিচিত পথে প্রাজ্ঞিক করেই যেতে পারেনি। কিন্তু প্রেমের ক্ষেত্রে যে উরু-মিষ্টি, জড়িত-ধর্মের মতো বিভেদ নেই—কথাটি প্রকাশ করে শৈলবালা যে যুগে যে সাহস দেখিয়েছিলেন, সেজন্য তাঁর নাম অশ্রুতই স্মরণীয়। পাঠ্যটি উপন্যাস ও অনেকগুলি ছোটগল্প নিয়ে মুসলিম সমাজকে লিখেছিলেন। তার মধ্যে 'আবাক' উপন্যাসটি উল্লেখ করতে হয় এই কারণে যে মুসলিমসমাজে স্ত্রীশিক্ষা ও তাদের স্বাধীনতা উন্নয়নের কথা তিনি তেবেছিলেন সেই ১৯২২ সালে। 'অভিপ্রপ্ত সাধনা'তেও এই নারী-স্বাধীনতার কথা জোর দিয়ে বলেছিলেন। বর্ণিত্বের শিকিত ও কালজি শোষণ নিবৃত্ত এক মুসলমান বৃদ্ধকের শব্দভাণ্ডার ও তার বাস্তবীর ভাষায়া সম্পর্ক নিয়ে 'মিষ্টি মনসহ' উপন্যাসটি লেখা। হাত শৈলবালায় বাস্তববিবাহ হওয়ার ফলে দার্পত্যজীবনের মধুর স্মৃতির স্রাটটি এই লেখার মধ্যে দিয়ে অনুভব করতে চেয়েছিলেন। 'ইমানদার' উপন্যাসটি অবশ্য প্রাচীন মুসলিম জীবনের বিশদ পরিচয় জানায়।

এই যে একই সময়ে একাধিক সাহিত্যিক মুসলিম সমাজ নিয়ে লিখলেন: তার কারণও ছিল। সমাজে বহুতল বহুতল। রবীন্দ্রনাথের সেই বড় চর্চিত মন্তব্য 'অসংখ্যযোগ'।

'লর্ড ক্যানিং বর্ষাব্যবস্থায় বাণ্যাপার দুঃসময় হলেন। এই উপলক্ষে রাষ্ট্রসংস্কার প্রথম হিন্দু-মুসলমান বিচ্ছেদের রতন

রেখাপাত হল। এই বিচ্ছেদ ক্রমশঃ আমাদের ভাষা-সাহিত্যে, আমাদের সংস্কৃতিতে বর্ধিত করলে, সমস্ত বাঙালী জাতকে কৃশ করে দেবে। এই আশঙ্কা দেশকে প্রবল উদ্বেগে আলোড়িত করে নিল।'

১২।৩।

বাঙালি মুসলমানদের প্রথম বাণীকার হিসাবে বিশেষভাবে শ্রদ্ধাযোগ্য মীর মশাররফ হোসেনের নাম। ১৮৯০ সালে লেখা 'উদগনি পৃথিকের মনের কথা' আত্মজীবনীমূলক রচনা হওয়ায় মুসলিম সমাজ ও সেই সময়ে হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে অনেক কথা জানা যায়। 'বিদ্যাসিন্ধু' প্রায় ওই সময়েই লিখিত হলেও সুদূর অতীতের কারাবালা প্রান্তরের করুণ কাহিনী ধর্মগ্রন্থে জায়গাটি অধিকার করে। উপন্যাসের আসনে বসে না। বিশ শতকের গোড়ার দিকে নাকিব রহমতের 'আনান্যারা', কবী ইমদাদুল হকের 'আনুদম্বল', আবুল ফজলের 'চৌধুরী', বেগম রোকেয়ার 'পদ্মদার' এবং আরও কয়েকটি উপন্যাসে শহরবাসী মুসলিম মধ্যবিত্তদের বিশাল স্পষ্টভাঙেই দৃশ্যমান। বিভাগের পরেও বেশিরভাগই ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত। বৈদেশি শোণ ও চাকরিতে নিযুক্ত থাকলেও বেশি সংখ্যক ছিলেন আইনজীবী। সমাজের পর্ণপত্র, আশাশু-আওরায় ভেদোভে, স্ত্রীশিক্ষার অভাব ইত্যাদি বিষয়ে উপন্যাসিকদের কণ্ঠের জোহালা হয়ে ওঠে।

কবী নজরুল ইসলামের 'বাঁধনাবাণী', 'মৃত্যুভাষা' ও 'হৃৎকলিত' উপন্যাসে স্বাধীনতা আন্দোলনকারীদের তরুণ বিপ্লবীদের মনের অস্থিরতার কথা, শহরের নীচতলার মানুষের দারিদ্র ও শিকিতা নারীর অন্তর্ভালার কথা ছিল। তবে স্বাধীনতা ও কালের মতো 'উপন্যাস' নাকালের প্রতিভার কণা ছিল না।

এর পরে শহরের মধ্যবিত্ত মুসলিম সমাজের কথায় আসতে হলে, একটি ক্রম সম্যক পেরিয়ে গোলাম কুদ্দুসের 'বাঁদী' উপন্যাসের কথা বলতে হয়। তাঁর উপন্যাসের নাক কলকাতার শিয়ালদহে রিকশা চেষ্টা আসে উচ্চশিক্ষা ও চাকরির অন্বেষণে। ধনী জমিদার একটি মুসলিম পরিবারকে সামনে রেখে লেখক সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি সব দিকের অসাম্যের বিরুদ্ধে তর্কনী তুলেছেন। বইটি শেষ করেছেন একটি সংক্ষিপ্ত বাক্যে 'সামনে দল'। মুসলিমসমাজ প্রসঙ্গে শহরজীবন এভাবে উপন্যাসে বড় একটা আসেনি। এখনও বর্ণনাত্মক।

একই সময়ে লেখা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের 'সালসা' উপন্যাসে শিল্প প্রকল্পের দিক থেকে অত্যন্ত আধুনিক চিত্রায়িত হলেও কাহিনীর প্রয়োজনেই প্রাকৃতিক্রিত। সৈয়দ মৃত্যুর আলী বাঙালি পাঠকের মন হরণ করেছিলেন আড্ডার ভঙ্গিতে লেখা রমারচনায়, 'দেশে বিদেশে' ভ্রমণের বর্ণনায় বর্ণনায়। 'ভাগীর

চরিয়ান' তিনি যেনেই নিয়েছেন যে 'মুসলমান ছয়ও মুসলমানদের নিয়ে গর-উপন্যাস লেখেন না।' যখন সেই অভিযোগ স্বপ্ন করে 'শরনাম' বা 'শর ইয়ার' লেখেন, তখন তাঁর উপন্যাসের অনিষ্টে অনবরত আসাওয়াগে দেশের রমীশ-কবিতা। কেননা, তাঁর 'কলিজাটা' 'রকিবুল্লের কিসা' মেনে সেখানে তুলে-পেঁচা হয়ে গিয়েছে। শহর ইয়েজৎ কলকাতার বাসান্দিনি মুসলমান পরিবারের চালচলন, জীবনযাপনের বর্ণনা থাকলেও অতিরিক্ত সোমোশিকতার বর্ণিত্যটায় এ লেখা তাঁর নিতৃত্ত রূপের একাধর সংগীত হয়ে উঠেছে।

পঞ্চাশের দশকের থেকেই প্রায় বাংলা উপন্যাসকে একটিভ বলা যেতে পারে। অর্থাৎ সবই শহর থেকে ধরে, বিশেষ করে কলকাতা থেকে।

আবদুল কব্বারের 'বাংলার চালচলি' বাটের মতোই জনপ্রিয় হয়েছিল। বলায় অঞ্চলের এই মানুষটি তাঁর নিজের কথা ও চারপাশের সোনা-কানা লোকদেহ নিয়ে এই চালচলি লিখেছেন। লিখেছেন 'ইলিশমারির জল' উপন্যাসও।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ তাঁর সোমোশিক বিষয়ে জানাতে গিয়ে বলেছিলেন—'ধর্ম' নিয়ে মাথা ঘামাননি। লেখক হিসেবে আমি চরিত্র বেছে নিই দরকার অনুযায়ী। হিন্দু মানুষ, মুসলমান মানুষ কিছু বুঝি না। মানুষ বুদ্ধি। এই দেশের মানুষ।'

মুসলিমদের রায় অঞ্চলে বর্ধিত সিরাজ। সোমনাকার হারকা নদী, ছিলকান, ক্যা হুতাবের অধিকারী কিছু মানুষ—এই সব নিয়ে তাঁর 'তৃপ্তহুনি', 'ছিলকান'। তার মাঝে মুসলিম চরিত্র ও সমাজ এসে থাকতে পারে। কিন্তু সে কাহিনীর প্রয়োজনে, তার অতিরিক্ত ভাবে নয়। আসলে, জীবনের শিক্ষার পাঠ তিনি নিয়েছেন প্রকৃতির কাছে। মেনে 'মিউজিকান', 'আনুদল' আর চৌধুরীসহ 'উপন্যাসের জলদে' গিয়ে 'মোহর'কে হিন্দুকেন 'অবীক মানুষ' উপন্যাসে। বইটি এক মুসলিম শীল পরিবারকে হতে করে একেবারে অমর রীতিতে লেখা। এতে মুসলিম সমাজের নানান জীতি-নীতি, আচার, ধর্মবোধ, লৌকিক ও অলৌকিক বিশ্বাস ইত্যাদি আছে। সে কথা আবার এসেছে বাঙালির ইতিহাসের নানান ঘটনাবলীর পাশাপাশি এবং বর্ধিত হয়েছে তিন প্রকৃত ধর্ম। 'দেখা-না দেখা' মেনা' এক কলকে, এক মায়ারি পুরুষ সৃষ্টি করে উপন্যাসের শিল্পীরাই যত্ন সহিত ঠিক ঠিকভাবে তিনি গুটিতে। প্রায় তাঁর শেখার প্রতিভা; কেননা তার 'বিত্তি ভাগ্যপাণ্ডা ও রূপান্তরের তিনি সাক্ষী' এবং মন তাঁর নারি নিমুখ। লেখা বিষয়ে তিনি লেখকের অভিজ্ঞতার ওপরই বিশেষ জোর দেন।

এই 'অভিজ্ঞতার' মাটিতে ভর করেই উঠে এসেছে গৌরকিশোর গায়ের 'প্রেম নৈক' নামক শরীফ উপন্যাসটি। তাঁর অত্যন্ত সোজা মুসলিম সমাজ তার গোটা পল্লবিত্য নিয়ে হাফির

হয়েছে বইটিতে। এর জন্য আরও সমূল ছিল তাঁর কোরান-হাদিস বিষয়ে পণ্ডিত জ্ঞান, শাসহায়ে জেলার ভাষার সহযোগ। তা ছাড়া কাহিনী-বিন্যাসের নিপুণতা—যা যে কোনও ধর্মের শঠককে আকর্ষিত করে তোলে। স্বাধীনতা পূর্ব একটি সময়কালের পটভূমিকায় যৌথচিত্রের অন্তর্য্য বাহু উপন্যাসটি রচনা করেছিলেন।

এই রকম ভাবের আরও একজন লেখক দেশবিভাগকে, বাঙালির বিচ্ছিন্নতাবৃত্তকে মেনে নিতে পারেননি। স্বাধীনতা সঙ্গ্রামে একসঙ্গে কানারাবাদের পর যখন কোনও বাড়িতে মুক্ত হিয়ে কাঠের স্তম্ভে তার হয়েছিল—‘একটি ভবল্লাহ ও একটি মুসলমান এতদেই’—তখন সেই মুসলমানের অপমান যার গায়ে সমনভবে আঘাত দিয়েছে, তিনি অধ্যাপক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। তার বড় বোনায় তিনি বলে চেয়েছেন তাকেও ‘মুসলমান’ শুন্য নয়, ‘বাঙালী’ও হতে পারে। উর্দু ভুলে গাইতে হবে ‘নতুন গান’। যে ঘটনা ঘটেছিল পরবর্তীকালে বলাদেখেন। বরিশদের লালমটি, আড়িয়ালায় বা, তৈরবের উত্তাল তরঙ্গ আর মুসলমানদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয়ের ফলেই এ ভাবে তাঁর অনুভূতি প্রকাশ করতে পেরেছিলেন।

ইতিহাসের আলোচনা প্রসঙ্গে একই ভাবে নিজেদের সম্প্রদায় সম্বন্ধে উল্লিখ করেছেন বিশিষ্ট সমালোচক রশীদ আল ফারকী—‘সেদিন শিকিত মুসলমান সমাজ নিজেদের বাঙালি বলে স্বীকার করেননি বৈকি! কিন্তু মুজিবীদিগের চোখে তাঁরা হয়ে পড়লেন মুসলমান। বাঙালি তো নয়ই। এমনকি ভুল্লোকেও নন। আমরা কি অস্বীকার করতে পারব সেদিনের অশিক্ত মুসলমানদের আর যাই বলা যায় তবলেও বলা যায় না। তবু আমাদের বাঙালি না বলে মুসলমান যখন বলে তখন আমরা ধুক্ক ই কেম?’ এভাবেই আত্মসমালোচনা করেছেন উভয় সম্প্রদায়েরই শ্রেষ্ঠকৃষ্ণসম্মান মানুষ। তবু শিকিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে দূরত্ব থেকেই গেছে। মুক্তবো আত্মী তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সরল চিন্তিতে এই বারবাসীর বেশখা কাগরটি বলতে চেয়েছেন এইভাবে—

‘আমি যে মুসলমান সে বিষয়ে আমি সচেতন এবং তাই নিয়ে আমার গর্ব বোধ আছে। এতকি হিন্দুনি নিজেদের মুসলমানদের চাইতে শ্রেষ্ঠত্ব মনে করেন। সেটা নিতান্তই যাবজ্জীবন। প্রত্যেক জাতিই ‘একস্ট্রিম অবদারবল কন্সিডার’ না হলে নিজেদের অন্য জাতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করবে। অবশ্য, এসব বাবেই সম্পূর্ণ উদ্দেশী মহাজনও কিছু কিছু সব সময়েই পাওয়া যায়।’

118 II

স্বাধীনতার বাহ্যিক বছর কেটে গেলেও এই দূরত্ব সাহিত্যিক-জনতে সোপেনি। মুসলিম জীবন নিয়ে লেখালেখির যেমন চিন্তা হয়নি। শৈশবেই ‘মুজিবজয়দক’ ওপর বাল্যের ছবি পাওয়া গিয়েছিল অতীত স্বদেশপাশাঘ্যের ‘নীলকণ্ঠ পবিত্র বৈকি’, প্রচুর

রায়ের ‘কোমপাতার নৌকা’য়। তারপর থেকেও প্রায়ের মনোভাব-জন্মই সাহিত্যের শাখায় উর্কিতকি মেন লেখকদের চমৎকণথ হিসাবে। আবদুল আজীজ আল আমানের গল্পগ্রন্থে যেমন যেখানে এসে থাকেই অনেক আন্দ-বোদ্ধাবির অতল প্রবেশ ঘটেই সেই শব্দতলিলি মাঠ-ঘাট, মূল্যমালী মাথা মাংসের সূখ দুঃখের গায় একেবারে প্রকৃতির শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ নিয়ে ছাটের হয়েছিল। কেননা তখন হাতে-হাত রেখেই বড় হয়ে উঠেছেন তিনি। কিার রায়ের চোনা জাযগা কসকাতার উপলক্ষেই বাঙালীরা-ব্রহ্মপুত্র। এখানকার নিম্নবিত্ত মুসলমানদের জীবনের খণ্ডাংশকে তুলে ধরেছেন ‘সংখ্যালব্ধ’, ‘অন্ধকারের ছবি’—এভাবে উপন্যাসে। এই সমাজের নানান পরব, বিয়ে-শাদি উপলক্ষে কিছু নিয়েদের বুটীদাটা হাত উৎসুক গাঠককে কৌতুহলের সিনে মেটায়। কিছু এখাবৎ কাল যা ঘটেছে, সেই সমাজের নিচুতলার সরিয় মুসলমানের ছবিটি গাঠককে বড়ো ছাটের হয়। তাদের অশিকা, নিচ্ছিয়াতবোয়ের হতশাধার ছবি যোগ করে।

আবুল বাহারের উপন্যাস কিছু একেবারে গার নির্ভর নয়। শিকিত, শহুরে মানুষদের নিয়েই তার লেখালেখি। ‘সুন্দরী’, ‘ধর্মের গ্রন্থ’, ‘সুরের সাম্পান’—উপন্যাসগুলিতে ধর্ম নিয়ে, সমাজের কিছু সমস্যা নিয়ে গভীরভাবে ভাবতে চেয়েছেন তিনি। তালক, বহুবিবাহ ধর্মীয় অনুশাসনের গোড়ানি তাকে বিশেষ করে ভাষায়।

উপন্যাসে এখন নানান কথার ফাঁকে মূল ভাবনাকে চারিত্র্যে দিতে হয়। যেমন নাকি অমিয়তম মজুমদার করছিলেন ‘মহিমকুতার উপকথা’। জমির মালিক জারজরুর চার বিবি এবং তার চাকর আশাক হতে একান্তই সন্তোষের জল্লাভের গোপন বার্তা কিছু আসল কথা নয়। শহরের রাসায় যে কাল উপলব্ধক পায়েই রাতে রাতে, নিজেরা কেবলই ভোগ সুখে থাকে এবং বনা মহিষের মতো তাদের চিংড়ার কবর উঠতে বসে না—এই সব কথা কিছু সোজাসৃষ্টি স্পষ্ট ভাষায় বলেন না। অবশ্য, এ উপন্যাসের কাহিনীও শহরের মুসলিম সমাজের কথা বলে না।

আফগার আহমদ জল্লিদের মধ্যে সাহিত্যে জাযগা করে নিজেছেন। মুসলিমসমাজ নিয়ে অনেক গুণ ও কিছু উপন্যাস লিখেছেন। তার মধ্যে তালক বহুবিবাহ ইয়াত্রি প্রশঙ্গও এসেছে। কিন্তু আলাদা ভাবে নয়। যেমন ধরা যাক ‘খিয়ার বিবি আসার প্রথম দিল’ যে বুব স্বল্প নয়, সে কথা চট করে বলে ফেলতে পেরেছেন তিনি। কিসমতকে শোভন বুই ভালবাসে। সন্তান দিতে না পারায় তার অনুরোধেই শোভনের ‘খিয়ার বিবি’কে ধরে আনতে যাওয়া। কিন্তু তার পরে সে বিরাট ধর্মের মধ্যে পড়ে যায়। এই যে তিনটি শ্রাবী, এরা সকলেই তো আলাদা মানুষ। সকলেরই তো মন আছে। মনের এই শৃঙ্খল জটিল নিয়ে খেলা করতেই ভালবাসেন আফগার আহমদ। তালক দিয়ে সেই বিবিকে ফিরে

পেতে গেলে অন্য এক পুরুষের সঙ্গে কিছুদিন তার স্বহাস্যের যে প্রচলিত নিয়ম, তার সমালোচনা করতে যখননি তিনি, প্রতিবাদে না। শুব্ব বলছেন—‘কাল হোসেন আর গুলবন্দার জীবনে এই তালক’ নিয়ে ‘প্রবেশ-অপ্রবেশ’ ভূবে থাকার কথা।

‘অন্তঃপুর’ উপন্যাসে তিনি মুসলিমসমাজের এক আলাদা জগতের সন্ধান নেন। এ জগৎ মৈনিক কলকাতায় রাজস্বিত্রি কার্য করতে আসা পুরুষের যত্নভরণের জন্য। এখানে ‘দেয়োমানুসের জিন্দেগিরি দাম নেই। সে যা পায়, সেটাকেই শোকার করতে হয়।’ এই যে, প্রাচীন অতত্ত্ব নিম্নবিত্তের মহিলামানুষের ছবি উপন্যাসের পাতায় উঠে এল, এইভাবেই শহরের শিকিত মধ্যবিত্ত মুসলিম সমাজের কথা কেন আমাদের গোচরে আসে না? অবশ্য এ জন্য উপন্যাস সাহিত্যের বিরাট কোনও ক্ষতি হয়ে ছাড়ে এমন নয়, তবে সুললীলতার বাসায় যত দিক থেকে আসে, সাহিত্যের বিকাশের পক্ষে ততই মঙ্গল।

II II

ইতিহাসে নিবেশিত তথ্যসূত্রে আমরা বাঙালি মধ্যবিত্ত মুসলমান শ্রেণীর বিকাশের বিলুপ্তের কথা জেনেছি। ইংরেজি ভাষায় শিক্ষায় অনগ্রহণ ও বাহাদুর শিকিত হওয়া বিষয়ে প্রচুর একসময় সমকালীন স্রোতের গুণ থেকে তাঁদের বিবিত্তিগে প্রভাব করেছিল। ইংরেজ আমলে সরকারি উদায় শিকিত ব্যক্তিই কর্মসংস্থানের সুবিধা পেয়েছিলেন। এই ভাষা অন্যায় থাকায় চাকরিকল্পে এবং বিভিন্ন ঘরানি পেশায় প্রতিষ্ঠা লাভে ক্ষেত্রে অধিকাংশ মুসলমানই শিথিলে পড়েন। তবে ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৪৬ পর্যন্ত সরকারি চাকরি, বিভিন্ন পেশা বিশেষ করে ওকালতিতে এবং বাবসা-বাণিজ্যেও মুসলিম সমাজে উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যে প্রসারণ ঘটে বিভিন্ন উপন্যাসের মাধ্যমে তার পরিচা পাওয়া গিয়েছে। এর পরে দেশ বিভাগের ফলে অধিকাংশ সম্পন্ন, শিকিত মুসলমান ওপর বাংলায় চলে গিয়েছেন। বংশ পরম্পরায় বিভিন্ন বৃত্তিতে নিযুক্ত কিছু পরিবার এদেশ থেকে পড়েছে। সাহিত্যরচনার ক্ষেত্রে এই কারণে চীঘদিন উট্টা গিয়েছে। কিন্তু স্বাধীনতার পরে যারা এদেশে জন্মে বড় হয়েছেন,

তাঁদের মধ্যে অনেকেই শিকিত হয়েছেন। শহুরে বেশি সংখ্যক মুসলমান বাস না করলেও হাওড়া, বর্ধমান, দুর্গালি, যীতরুদ্র প্রভৃতি অঞ্চলে এমন অনেকে ছিলেন যারা এদেশে জন্ম গ্রহণ করেননি। ২৪ পরগণারই অনেক গ্রাম থেকে নিত্যযাত্রী হিসাবে অনেক কলকাতায় এসে পড়াশোনাও করেছেন। সরকারি চাকরি ও শিক্ষকতার ক্ষেত্রে তারা যারা আছে তাঁরা তো মধ্যবিত্তই। ক্রমশ মধ্যবিত্ত বিকাশ ঘটেছে বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত মানুষদের মধ্যেও। কিন্তু উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী আশাতোড়ায় রয়ে গিয়েছে। এ নিয়ে চিন্তাবাদনা কবরার কথা তাঁদেরই। যে কোনও দেশেই সংখ্যালঘুদের মনে হীনদুঃখতার ভাব থাকে। হলেবার সুরও মনের মধ্যে থাকে। আজালের কারণ উত্তরপক্ষেই থাকে, এতিহাসিকের কাজ সে সবুকে আলোচনা করা। কিন্তু যারা মনে করেন তাঁরা উপশিকিত, নানান সূকট ও সমস্যায় ভায়াক্রান্ত, লোককে জানানোর দায়টি তাঁদের উপরেই এসে পড়ে। সাহিত্যেই সেই মাধ্যম। ধর্ম-কর্ম ছাড়াও ব্যক্তিগত পারস্পরিক সমস্যা, সংকট, রোমাঞ্চ ইত্যাদিও তো উপন্যাসে ঘটে উঠে। বাঙালিই অথচ একটি অনারকমের সমাজ কাঠামোর প্রেক্ষিতে বলা কাহিনী সাহিত্যিক মুশিয়ানায় পরিবেশিত হলে উপন্যাসে ঐচ্ছিকের আদ্যম এনে সেবে বলই মনে করি।

তথ্যসূত্র:

- ১। শাহ জামালী: জলপতাবালিকা সংকলন ৩য় খণ্ড পৃ: ৪১৮।
- ২। তৃতীয়মুখ: আবুল বাহার: বায়ানাম: শালিকী ৮৬।
- ৩। জল্লাভমুখ: অখিয়ারমুখম মেনেগুণ।
- ৪। মুক্তবো আলি প্রবন্ধী: পবন: পৃ: ১১২ ও শহাবুদ্দীন: পৃ: ১০০, ১১০।
- ৫। শে সাহিত্য সংখ্যা: ১০৮০।
- ৬। গনিম আলফারকী: মুসলিম মানস: সংখ্যা ২ ও প্রতিজ্ঞা
- ৭। গণীভাল্লাহকালী: চারখানায়: গণিতিকি: ‘আহাদ’।
- ৮। বাঙালী মুজিবীদি ও গিজিরতাবাদ: অফেন্স প্লে
- ৯। স্বাধীনতা উত্তর পর্ব শিশ্ব বাংলা মুসলমান: আবদুল জল্লি।

গল্প

মানুষের কী রইল বিজনকুমার ঘোষ

মা সে তিন বার সুনীলবাবুকে শোকে অফিসে যেতে হয়। সে তিন বার সুনীলবাবুকে শোকে অফিসে যেতে হয়। অফিস খোল দশটায়। তিনি সাড়ে নটার একটু আগে গিয়ে লাইনে বসেন। হুজুরের বেকার ভিড়। ঘাঁড়ের পেশনান দিয়ে, রিটার্নস করে কিছু পেয়েছেন, তাঁরা ডাকঘরের মাসিক আয় প্রকল্প জমা রাখেন। তাঁদের সংসার চল স্বেদর টাকায়। সুনীলবাবুও একজন সুদরকার।

অন্তত একটা ঘন্টা লাগে টাকটা পেতে। ততক্ষণ বুড়াদের অসম্ভব বকবকানি শুনতে হয়। বুড়ারাও যে চারের নোকানের হোকবাদের মতো এগুর গুল মারেন তা লাইনে দু'মিনিট বঁড়াপেই বোঝা যায়। চেহারায়া ছাশোয়া হল কী হবে, এরা নাকি বোঝেন দুর্লভ সব চারুর করছেন। কারও কোমরে সব সময় রিডলবার গোঁজা থাকত। কেউ অফিসে প্রতি দিন অন্তত শ'দশনেক সাপট পেতেন। রিটার্ন দিতে দিতে হাত ব্যথা। হা কপাল, হঠাৎ অবসার এসে মুড়ি মিষ্টি এক দর করে দিয়েছে। কে চেনে, কে-ই বা ব্যতির কই।

পেছনে দাঁড়িয়ে সুনীলবাবু দুপুরের কথা শোনেন। একটু হেসেও হেসেন মুচ্চিক।

কেউ বলেন, মশাই, মুশকিলের কথা কী বলব, আমি এখানে থেকে ওখানে গেলে দু'পাশে দু'জন আমর গার্ড থাকত। বাথরুমে গেলে সোপারেনে—

সুনীলবাবু আড় চোখে তাকাল। দু'দিন আগে এই বুড়াকেই কলর লতি নিয়ে দালারি করতে দেখেছেন।

আজ আশ দশটার টাকা পেয়ে গেলেন সুনীলবাবু। ছোট লাইন। তবু এর মধ্যেই একজন অভ্যেস বংশ গুল দিয়ে ফেললেন। বিশদ দৃষ্টিতে কারও সামনে বোধ করেন সেজেটোরির সঙ্গে লেগে গেল বিরোধ। তিনি তো ইহুদা দেবেনই। বাজারের এক গোঁ। শেষে মস্তুরি কথায় নিরস্ত হলেন। সুনীলবাবুর সঙ্গে একটা খলিও

থাকে। টাকা গুনতে গুনতে ভুল্ললেকের দিকে আড় চোখে তাকিয়ে রেল স্টেশনের গায়ে বাজারের দিকে এগিয়ে যেলেন।

বেলা সাড়ে দশটা। পরিবারটি অফিস-বাড়ির বুড়ার পর পর ট্রেন লসে বেছে শিয়ালবা। আর ছুটি পাওয়া বুড়ারা সবার আনাশ খুঁজতে খুঁজতে এইকু বাজারে অন্তত মাইল তিনেক ছুটোছুটি করেন।

বাজারের প্রায় মাঝখানে বড় পুরনো একটা কদমগাছ আছে। আলিশুর আবহাওয়া অফিসের সঙ্গে বার নিরুর বিরোধ। বর্ষা আসে কখনও আগে কখনও পরে। গাছটা কিন্তু এ সনের পরেয়া করে না। ছি বছর একই সময় ফুল যেতে। সুনীলবাবু পাতার আড়ালে প্রথম ঘোটা ফুলটি দেখে তবেই বাজারে ঢোকে। কিসের এসে নোট বুকে লিখে রাখেন সে কথা। ফুলের কথা যেমন লেখা হয় তেমনই গুলের কথাও। অবশ্যই সানামটো যা। একটা সানামনি গুল। ফুটনোটও থাকে। কোমরে রিডলবার গোঁজা বুড়া বোমহয় গুলিগে চাকরি করতেন। সেই রকমই মেজাজ। ব্যাটা, বেশি দর চাইছিল, বলই এক হোকরা ডেডশওয়ালার গালে চড়া। ছিঃ ছিঃ! এই লোকটার পেছনেই আজ আমি গুলিয়েছিলাম। চড় মারার জন্য অনেক ঘোরাগোরা করল। বুড়া কিন্তু মচায় না, বল, মশাই, আনাশের পরেই চড় দেয়ারি। বল কিনা না মশাই বুড়া কেকি। মগের মুকুকা যান, এবার থেকে ছুড়ি পরে বাজারে আসবেন।

তারি ছিঃ দিয়ে পরের লাইন। প্রথম কদম ফুল দেখলাম। একটাই ফুটে আছে। অন্যরা মুটি ফুটি। যদিও বাঙ্গল দিনের দেখা নেই। আকাশ পরিষ্কার। পলাতক মেঘ। রোদে চাঁবি যেতে যা। পরে লোডশেডিং।

বাজারের বানিকীরা হুকে সুনীলবাবু যার দিকে প্রথমেই তাকাবেন সেটি এই কদম গাছ। আজ চমকে উঠলেন। বছর বাছের একটা বলিগে ছেলেবে কদম গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছিল। শিরুমাড়া করে। রং কাগো, ললগুটি মুখের ওপর ঢালার

মতো, গায়ে জামা নেই, ফুল প্যাণ্ট ছেঁড়া। সারা শরীরে রক্ত মুকিয়ে রয়েছে। তার ওপর দিয়ে নদীর মতো ঘাম নামছে। মাঝে মাঝে ডুপরে কেঁপে উঠছে জোয়ানছেলেটি।

সুনীলবাবু অবাক হলেন ওকে দেখে নয়, কারও কোনও জরফত নেই দেখে। কলকাতায় নাকি ক্যান্সাররা বাজলেও পাঁচশো লোক জ্বম যায় পাঁচ মিনিটে। মানুষের কৌতূহল কি ফুরিয়ে গেছে?

বেলা এগারোটার বাজার যে রক্তম হওয়া উচিত সেই রকম। এক দিকে সারি সারি টালির ছাউনির তলায় চালের নোকান। ওদিকে ছাল ছাড়ানো পাঁটা। পাশেই খাঁচা ভর্তি মুরগি। কদম গাছ থেকে শুক সবজির সারি। সামনেই চরনকারের বকমুল সাজিয়ে বসে আছে বুড়া। সুনীলবাবুকে দেখেই বলল, নিবেন নাকি, ডালি মিয়া বাইবো?

আজকাল ভাল ফাশানের বহুলত চার দিকে। তারই কোনও খোপের বকমকে তরলকে দেখে বুড়া ডাঝা একটা পাশটায়, নিবেন নাকি, ডিৎসল মিয়া বাইবো?

জলকায় একটা ডাঝা ছেলেকে পেটানো হয়েছে, এখন কি ফলতু কথার টাইম? সুনীলবাবু ওই বুড়াকেই বেছে নিলেন, আই কী হয়েছে, ছেলেটাকে বেঁধে রেখেছে কেন? ব্যাপারটা কী?

—জানেন কেডা?

—সকাল থেকে বক ফুল বেচেছেন বসে বসে, এখন জানেন কেডা!

—খুব শিটাইছে আরে। এক নব্বুরের কবমাই। ব্যাভতে ভিজা বিজাল!

যোঝা গেল এখান থেকে বেশি কিছু উদ্ধার হবে না।

সুনীলবাবু অজিতের মামকাবারি শুধরে। লোক দিয়ে চালের কল বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। দাম পরে দিলেও চলে। অতএব এগিয়ে গেলেন।

—হ্যাঁগো অজিত, লোকটার কারা বেঁধে রেখেছে? চোর টোর নাকি?

—কিনা জানি না মেসোমশাই। আমি একটু আগে লম্বীকান্তপুর থেকে এসেছি। ভাই বাড়ি ছলে গেল। আর ওপর পুনে দরকার কী। কলকাতায় আকহার হচ্ছে। নিশ্চয়ই কিছু একটা করেছে, না হলে এমনি এমনি—

রহস্য রয়েই গেল। অজিত ছেলেটা ভাল। জানলে নিশ্চয়ই বলত। তবু একবার জুঁ শোলার চোঁটা করলেন, একটা ছেলেকে বেঁধে মামরার করল, কারন নিশ্চয়ই আছে, তা জানার চোঁটা করবে না?

—শুনুন মেসোমশাই, অজিত বোঝাতে বসে, সাড়ে বারোটার নোকান বন্ধ করে রান্না চড়ান। খেয়ে খেয়ে উঠতে না উঠতেই

লম্বীকান্তপুর লোকাল। বারো বজা আর আই এইট পাঠাবে ভাই। লোক জোগাড় করে চালের বক্স নোকানে তুলতে ভাই। তা বুঝে নেবুন মেসোমশাই, আমার সময় কোথায়? আবার বিকেল হতে না হতেই ঝাঁপ খালে—

—তোমার নোকানের সামনে—সুনীলবাবু আর মরিয়া : রক্ত মাঝা শরীরা দেখে—

—কী করব মেসোমশাই, আমি তো মারিনি। তাই বেশে বুজ থাকি। দেখি না।—অজিত আলতো করে তাড়া দেয়, বাড়ি যান মেসোমশাই, বেলা হল, মাসিমা বসে আসছেন—

দুপুরে খবরের কাগজ নাড়াচাড়া করতে গিয়ে চোখের পাতায় দুমের অল্প সর পড়ে। আশ কটর জন্য। তারপর বাথরুমে গিয়ে চোখে মুখে জল নেয়। সোতলবার বাশায়া ইন্ডিচোয়ের বসে হালের কোনও গাছের বই পড়েন। সুনীলবাবুর এটাই বারো মাসের দুপুর বেলার ক্যানি।

আজ রুটিনখানা হাওয়ায় উড়ে গেল। চোখের পাতায় সর জময় না। চোখে মুখে বল বোঝার ওপর দরকার হল না। গত কাল পড়তে বইটা বেশ পড়ছিলেন, বাকিটা শেষ করতে গিয়ে মনে হল লেখা আর টানছে না। অতএব ডায়েরি লিখতে বসলেন। লেখার কাজটা রাত নটার পর সারেন। কিন্তু আজ এলোমেলো যিন।

মিনিট এলোমেলো করে দিল বাঁধ বছরের দৃবকী। প্রচণ্ড মার খেয়েছে। কদম গাছের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা। গত কেউ বলতে পারছে না কী ব্যাপার? কারন জামারও কোনও ইচ্ছে নেই কারও। ছেলেটি মাঝে মাঝে ডুপরে উঠছে। বেঁধে রাখার একটাই অর্থ, একটু দম দিয়ে আবার পেটোবে। মোমের জিওল বাঁধা তৈয়ারি রাখে। পাণ্ডায়া আমি বুঝটিকেই জিল্লানা করে লোমো, কোমর কী হয়েছে ব্যা? সঙ্গে সঙ্গে চার পাঁচটা লোক, যাদের বাজারে আমি কোনও দিন দেখিনি, চোয়ড়ে চেহারা, তেড়ে এল, আশনার কী দরকার? বাজার হয়ে গেলে বাড়ি চলে যায়।

আমার দীর্ঘ দিনের চালওয়াল। অজিতও একই পরামর্শ দিয়েছিল, শিগগির বাড়ি যান, মাসিমা বসে আসছেন।

সবাই আমাকে বাড়ি পাঠাতে যায়। বাড়ি এসে কবটা কী! চান করে ভাত খাও আর বই পড়। ওই চোয়ড়ে চেহারা লোকগুলি কারা? কোথা থেকে এল? এরাই কালশ্রিট। মারধর করে দিবি চা আছে আর নিজেদের মধ্যে দাঁত বার করে হাসছে। এদের বিবেক বলে কিছু নেই।

আমি সন্তোষে দু'দিন বাজারে যাই। দরকার হল তিন দিন যাব। চার দিন যাব। রহস্য বুঁধে বার করবই।

এক কাশ চা খেয়ে সুনীলবাবু রান্নায় বিকেল দেখতে বার হন। হুটপাত খবে বেশ কয়েক মাইল কাগোফো করেন। হাতে থাকে

লাঠি কুকুরের ডায়। হেলেনবেলার একবার কামড়ছিল। ক্রান্ত হলে কোথাও যেন পড়ল। আজকাল নানান খুশোয়াসী সংস্থা হাজার হাজার সিগারেট বেঞ্চ বানিয়ে রাখে খুশোয়ার কথা ভেবে।

আমি কি বুড়া হয়ে গেছি? হঠাৎ বন্ধ করে সুনীলবাবু ভাবতে বসেন। খুশোয়াসীর কপাল অবহেলা লেখা থাকে। সবাই আমাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিতে বাধ্য। অথচ আমি যা জানতে চাই সেটিকে কারও গ্রাহ্য নেই। যেন ওসব না জানলেও দিন চলে যাবে।

আজ বাপু দিন কারও জন্যে বসে থাকে? কিন্তু এত বড় একটা অমায়ার চোখের সামনে ঘটিলেও কারও হেলদোল থাকবে না?

টুপ করে একটা শব্দ হয়। মাথার ওপর নরকখচিত ছাতিমাখা। বোধহয় কামড়কা হলে। চুনকাম করার ধাক্কা। সেরে বসতে গিয়ে সুনীলবাবু দেখলেন বেঞ্চে আরও একজন বসে। পরিচয় নেই, তবে বিলকম চেনেন। ডাকঘরের লাইনের লোক। তবে গুলুটল দিয়েছেন। বসে বসে পড়েন না। সুনীলবাবু ঘনিষ্ঠ হয়ে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি আজ বাজারে গিয়েছিলেন?

—রোজই তো বাই। কেন বলুন তো?

—কিছু দেখেননি?

—কই, না হ্যাঁ?

সুনীলবাবু ভেবে নিলেন আর এগোন ঠিক হবে কি না। হযত সজ্জ ছাড়াই বাড়ি পাঠিয়ে দেন। তবু বললেন, কদমগাছের সন্ধে একজনকে—

—হ্যাঁ—হ্যাঁ—ডব্বালোকের এবার গোটা ব্যাপারটা মনে পড়ে: খুব শিগগিরই। আমি অবশ্য পের্টাপিটি দেখিনি।

—কেন মারল হেলোটাকে?

—নিজস্ব কোনও অস্বার্থ—

—কী অস্বার্থ? আমার প্রশ্ন তো সেটাই।

—জানি না, তবে বলে দিতে পারি। হয় শাকা চোর, না হয় চুরি করতে গিরে ধরা পড়েছে। কিংবা টাকা নিয়ে ঘোরাগিলে, আজ বাগে শেষেছে। বা সমাজ বিরোধী। বিপুল পাটি বদলা নিল। অথবা বেশ কয়েক।

—সুনীলবাবু গুম হয়ে বসেই হলেন।

—কী মশাই, ঠিক উত্তর পেয়ে গেলেন তো?

সুনীলবাবু একটু কড়া হলেন, হ্যাঁ, খুলের হেলের উত্তর পেলাম। পাঁচের মধ্যে একটা তো লেগে যাবেই।

—আদমার প্রশ্ন তো শিশুসুভা। যদি এটা কী আর ওটা কী। অথবা গোলাম।

—যোগাস মনে করলেনই যোগাস।

—ঠিক তাই। কলকাতার এক কোটি লোকের মধ্যে চৌকটুকি

লেগেই আছে। তাই বলে বাজা হেলের মতো প্রশ্ন কুরব?

—আমাকে মাফ করুন, আমার অনায়া হয়েছ।

সুনীলবাবু ক্রান্ত উঠে পড়লেন।

কিছুক্ষণ হাঁটার পর খোল করতালের মূখ্য আগাছা ভেসে এল। কী মনে হওয়ার ও দিকটাই পা চালালেন। খোলা চাটাল। আলোময়। জন্য তিরিশ পুরুষ মহিলা। নিজেদের মধ্যে চাপা গলায় কথাবার্তা চালাচ্ছে। আর এক ব্যক্তি মহিলা সামনে বই রেখে সুকোলা গলায় গুঁচ তত্ত্ব বাখানায় বসে। তিনি খামলেই খোল করতালের মূখ্য রোল ওঠে। শোয়েটিক রিফ্রিম। পাশে নানান সাইজের হুটোর ভাঁই। এখানেই সুনীলবাবুর নতুন একজোড়া পাশ্পা শূ হাওয়া। সেও প্রায় বছরকান হয়ে গেল। ডাক ঘরে লাইনে দাঁড়ানো এক বৃদ্ধ দশ টাকা চানার বিনিময়ে লোড দেখান, চলে আসুন আজ থিকলে। আহা, তাঁর কী মহিমা, কী তাঁর ব্যাখ্যা, খুলেলে জোব দিয়ে জল পড়ে।

জল অবশ্য পড়েছিল নতুন জুতোজোড়াটি হারিয়ে। ব্যাখ্যা মনে হল কেউ শুনছে না। কারও দরকার মেয়ের সম্বন্ধ। কারও ওঁচামড়ে ভাড়াটে উচ্ছেদ। সন্তান্য বিকিরের টচার চাই কারও। সুনীলবাবু এক নিমিঃ এসেছিলেন।

প্রথম রাতে ছটফট করতে থাকার দুখ এল না। শেষ রাতে এল। মাঝামুখ্যীন স্বপ্নও দেখে ফেললেন। একটা কদমগাছ। টেনিস বলের মতো গোলা গোলা যুগ। নীচে মুকুট মায়ায় নীল রঙের কুম্ভ। হাতে বাঁশ। গর খুবু খুশা ছিঁড়ে।

প্রবল পেছোলের চাপে স্বপ্ন এবং দুখ দুই-ই ভেঙে গেল। আকাশে আবহাওয়া। সকাল এক রকম হয়েই গেছে। আর দুয়ে থাকা যায় না। পুরো এক গোলস জল খেয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে বসে ভাবতে লাগলেন কেন স্বপ্ন দেখলেন? কী এর মানে? হঠাৎ দেওয়ালে চোব গেল। প্রবীর জুলোয়ারি ওয়ার্স। ওখানেই কদম তলায় শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু ক্যালেন্ডারখানা ডিন বছরের পুরনো। আশ্চর্য, বাড়িতে কারও ফেলে দেওয়ার কথা মনে হানি?

বেলা দশটায় সুনীলবাবু নীচে এসে ট্রেনের ডালা বুললেন। এক দিলেই তরকারির পরিচায়ক এসেছে। সুতরাং বাজারে যাওয়া যেতেই পারে। অনেক সময় একই বেলার দিকে সপ্তা হয়।

কদমগাছের দিকে চোখটা ক্রান্ত চলে গেল। সুনগান। বাজার বাজারের মধ্যে। কোথানে যতটুকু দরকারি হওয়ার কথা হচ্ছে। সুনীলবাবু এক ব্যক্তি কিংবা মহিলায় দিকে এগিয়ে গেলেন। দু'জনের মধ্যে হেলো—মাসি সপর্দ।

—মাসি ভিন্ন নাও।

বুঁশি হয়ে মাসি ডিমটাকে কায়দা করে চোখের সামনে ধরে কালা পল্ট খোঁজে।

—এক জজন বিই ছেলে? অনেক দিন পরে এলে।

—তা নাও।—সুনীলবাবু হঠাৎ অন্তরঙ্গ হয়ে বসে পড়েন :

মসি, কাল ওই কদম গাছের সঙ্গে—

—হ্যাঁ, সেখিতি বাবা।

—কেন হেলোটাকে মারল জানেন মাসি?

—না ছেলে। দরাম দরাম আওয়াজ হতছিল। অনেক মানসি ছুটে গেল দেখতি। এক বাবু পয়সা না দে চারটে ডিম মনে ছুটে গেল ওই দিক। আমার মারার বাড়ি দেখে ছেলে। বলি আমার পয়সা দেখি তই বড়নোক হবি?

সুনীলবাবু বুঝে গেলেন এখানে কিছু অশা করা কথা। এগিয়ে গেলেন মুদি-দোকানে। বাসা দ্বিদি ইংরেজি নিমিঃ করা হল গণেশ সাই। ওর থেকেই মশলাপাতি কিনে থাকেন। সোজা সুজি জিজ্ঞাসা করলেন, কাল লোকটাকে অত মারল কেনেরে গণেশ?

—কোয়া মালুম বাবুজি। হেভি চিন্তাচিন্তি হল। জোর ফাটল। আমারও মতবল ছিল একটু হাতেরে সুখ ভি করে লি। সাত বাত—

—বাবরে, তার আগে জানবো না চোর না ডাকাত?

—একটা কুছু তো হয়েই। মার্কিটেম কিন্তনা পালকি, তো বেছে লিয়ে একজনকে কেন শিটায়ে, আপনি বিচার করুন স্যার? অকটা মুক্তি।

সাতই এগারোটা। বর্ষাকালেও আকাশ এত পরিষ্কার ভাবা যায় না। গনগনে বাবা। বাড়ির পথে সুনীলবাবু। থলোটা হালকাই রয়ে গেছে। আসলে কেনাকটোর দিকে তো মনে ছিল না।

দুপুর কীভাবে কাটাবেন বুঝে উঠতে পারলেন না। বই পড়ার আর মনে নেই। বছরের কাগজের হেভি পড়লেই চলে। ভিতরে কিছু নেই। বোডোশক্তি নেই যখন, তখন দু'চোখের চোঁকা করা যাক। কাল রাতে দুখ হয়নি ভাল। সে চোঁকা করতে গিয়ে বুঝলেন সন্তান্য। অতএব বাকি রইল ডায়েরি লেখা।

এক আশ্চর্য জগতে আমরা বাস করি। এত বড় একটা ঘটনা ঘটল, চোখের সামনে দেখল পর্যন্ত, কিন্তু কেউ কারখ জানতে চায় না। মনে হয় মানুষ তার স্বভাব পালটে ফেলেছে। বিশ্ব। এ বেন গরুর বাট থেকে দুখ চোয়াবে না। গোথায়ো বিশ্বহত হারিয়ে ফেলবে। আসলে ঘোর বিশ্ব। আমি এর শেষ দেখে ছাড়ব। ওই চোয়াড়ে লোকগুলিকে ছেড়ে দেওয়া ভুল হয়েছ। যদিও আমি গোয়েন্দা নই, পুলিশ নই। আমার গায়ে শক্তিও নেই। কিন্তু কাল যদি একটা লোকের গালে তেনে চড় করিয়ে দিতাম—

এ পর্যন্ত লিখে সুনীলবাবু একটু চিন্তা করলেন। গালে হঠাৎ চড় কানোয় কথা মনে এল কেন? ওরা কি তা হলে ছেড়ে দিত? নিশ্চয়ই একটা বিতিকিছিরি কাণ্ড ঘটে যেনে। আমাকে মার বেতে দেখে পরিত্র কয়েক জন এসে কারখ জিজ্ঞাসা করত।

আবার বিশ্বায় পড়ে যান সুনীলবাবু। কেন কারখ জিজ্ঞাসা করবে? তা হলে কদমগাছের হেলোটার বেলায় এও নিশ্চয় কেন?

কেউ কিছুই করত না। বরং চমকুলজ্ঞার বাড়িরে অজিত কিংবা গণেশ ছুটে এসে বিকশা চাপিয়ে দিত। অজিত বলত, এর মধ্যে কোনে কেন? বাড়ি নাম—

চড় মারার কথাটা কেন মনে এল? সুনীলবাবুর ভিতরটা ঘুরপাক যায়। আমি আর কদম গাছের হেলোটাই এক নয়। বাজারে আমার যথেষ্ট পরিচিতি আছে। দশ বছর ভাড়াটে ছিলাম পড়ায়। বাড়ি করেছি তাও প্রায় তেরো বছর। সুতরাং তেঁইশ বছর এক নাগাড়ে বাজার করছি। টাকা কম পড়লে অনেক দোকানদারই আমাকে বাকিতে দিতে চায়। আমি ধার বাকি পছন্দ করি না। কিন্তু কদম গাছের হেলোটাই নতুন। কেউ আগে বাজারে কখনও দেখেনি। তাই কেউ এগিয়ে আসেনি। কিন্তু আমার বেলায় অন্য রকম পরিস্থিতি হতে বাধ্য। সবাই ছুটে আসবে, শালা, এখানে মনো হচ্ছে? জানিস, কার গায়ে হাত তুলেছিল? তখন চারে পড়ে ওরা মনের সুখে পেটোনের কাপল বলতে বাধ্য হবে। হাত মনের মধ্যে এরকম একটা আইডিয়া ছিল বশেই চড় মারার কথাটা কিংবা।

ঠিক হল না। আশিচিহ্ন কাউকে মারতে দেখলে কেউ এগিয়ে আসবে না তাও কি কখনও হয়? রায়ায় একটা কুকুরকে লাটিপটা করতে দেখলেও তো লোকে বলে, মারছেন কেন মশাই?

দারুণ দৃষ্টিপাথ্য নোটাই ফেলে পাচারি করতে লাগলেন সুনীলবাবু। গা দিয়ে ঘাম ঝরছে। কদমগাছের হেলোটার মতো। হঠাৎ সোজাশক্তি। মরে যেতে ইচ্ছে হল। মাঝামুখু ডায়েরি লেখার বেলাও অর্থ হয়? হেলোটায় লেখক একজনকে বলই ছাড়া এই দুর্শা। তবে এটাও ঠিক, আমি এর শেষ দেখে ছাড়ব।

সকালবেলায় সদানন্দ এক প্লেট নোনতা সুজি ও চা নিয়ে এল। বেশি কথা কলা সদানন্দের অভ্যাস। বলল, মা বাজারে যেতে মনো করল বাবু, সব আছে।

—এটা মার কথা না তোর কথা?

সদানন্দ হাসে, আমাদের দু'জনের কথা।

—বড়টা যা ছাড়াটা নিয়ে আয়।

ভাল কথা মনে করিয়ে দিয়েছে। বাজার করার হ্যাশা না থাকলে নিজস্ব কাছটা ভালভাবে করা যায়। ছাড়া মাথায় সুনীলবাবু ঘেরেছেন। বাজারে তো মানুষ বেড়াতেও যায়। আজ বাজারটা যেন জমজমাট। হযত মাসের প্রথম। রিটার্নস করার পর রাতের দিক থাকে না। মাসের প্রথম না শেষ। একটু হিসাব করে বলতে হয়।

বাজারের মুখে সাজানোগোছানো স্টেশনারি দোকান। দোকানের দালিক মসীরের বিয়ের নেমকথা পণ্ডিত ঘেঁষেছেন ওর এক কাঁকা সুনীলবাবুর অফিস কাছ করতেন।

—তারপর সমীকরণ, কী খবর?—সুনীলবাবু টলটা টেনে নিয়ে বসলেন।

—এই যে জ্যোতিষাই, চা বলি?

—না, থাক। আলম বাহার করতে নয়। এমনি বেড়াতে এসেছি।

—ভাল।

সমীর ছেলেরা খুব হাসিখুশি। সুনীলবানু স্বপ্নের কাগজ দিয়ে শুল্ক করছেন, থাক, কার্টানের মুদ্রাটা খেমে গেছে। ছবিতে দেবলাল শাক সোনারা মটার, বাইকেল নিয়ে শিখু হঠকে।

—বুঝ ভাল হল জ্যোতিষাই। মুদ্রাটা আরও কিছুদিন চললে দেখতেন জিনিষের দাম কোথায় গিয়ে পৌঁছত।

—গারিবদুর্গা মরত। আর কী হত?

—যা বলেছেন।

—শোন সমীর—মরার কথায় প্রসঙ্গটা চট করে এসে গেল : কদিন আগে কখন গাছে একটা ছেলেকে বেঁধে কারা পেটাল?

ইতিমধ্যে সোকারে একটা উঠতি মেয়ে ঢেকে। নানা রঙের লিপসিক্ত নাচাড়াড়া করে একটা পথের করে। ঘুরুরা ফেরত দিয়ে সমীর বলল, ঠ্যা, একটা গণ্ডোগাল মুনেহিলাম হেট। কিন্তু সোকার ছেলে তো যেতে পারি না। গত বুধবার কী হল জানেন না? একটা লোক এসে একশো ডিম চাইল। একুনি নিতে হবে। আশানকে বলে রানি জ্যোতিষাই, সোকারে এখন ডিমও থাকে। তো পেছনের দিকে গেছি ডিম আনতে, বড় জোড় দু' মিনিট, এসে দেখি লোকটা নেই। আমার সাইকেলও নেই। ছুটে বেরিয়ে গেছি। কোথায় কে? প্যার প্যার। আমার বড় শালা প্রেজেন্ট করেছিল। দারুণ দেখতে সাইকেলটা—

দুঃখ দুঃখ দুঃখ করে সুনীলবানু উঠে দাঁড়ালেন। এখন কেবল সাইকেলের দিকে চলে। একটা এগোতেই দেখে হয়ে গেল ফরেন সার্কিটের ভল্লোকেবল সঙ্গে। প্রথমে একটা বাধার আলোটা জুড়ে দেন, পোস্ট অফিস থেকে একলেন বুঝি?

—না। আমি তো সত্যেরা তারিখে যাই। আশানকে কোথায় দেখেছি বস্তু নয় তো?

—পোস্ট অফিসেই দেখেছেন। আশনি তো ফরেন সার্কিটে ভল্লোকেবল এক গাল হেসে দিলেন, এই কখনগাছের ছায়ায় আনুন। বছর তিনেক দেশে, ট্রেনিং শিরিড মলতে পারেন, তারপর তো বিশেষই কেটে গেল চাকরীজীবন—

—হিসে হয়। আশনার কত অভিজ্ঞতা।—সুনীলবানু চোখ বড় করলেন।

—তা বুঝ—ভল্লোকেবল মুখে খুশি আর ধরে না—নায়েদুর ফলস দেখেছি, প্যারিসে দুভার মিউজিয়াম, ইজিপ্টের শিরামিড, বলশই থিয়েটার—

সুনীলবানু ভাতাভাতি বলে উঠলেন, আজ্ঞা, সেদিন এই গাছের সঙ্গে একটা ছেলেকে বেঁধে—

ভল্লোকেবল দুটা চোখই ছোট আর কুতকুতে হয়ে গেল, আশনি মশাই বেরসিক। আরও কত কী বলার ছিল। ঠ্যা, আমিও দেখেছি। তাত্ত কী হয়ছে? আমার মাথা তো খারাপ হয়নি। গিল—

সুনীলবানু ক্রুত গমনভঙ্গি দেখতে পেলেন।

রাতে যথারীতি অনিদ্রা। কেবলই মনে হতে লাগল আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। উনি সে রকমই ইচ্ছিত বলেন। ছেলেটাই আমার মাথা খারাপ করে দিয়েছে। এখানেই কেন মরতে এল হতভাগ্য? আরও তো অনেক বাধার ছিল। টেবিল ল্যাম্পের আলিয়ে গড়ির দিকে তাকালেন। তিনটে বেজে দশ। মেঝেতে উকুড় হয়ে ডায়েরিখানা পড়ে আছে। সুনীলবানু ভেবেছিলেন আর লিখবেন না। কিন্তু চরিশ বছরের অভ্যাস ছাড়া জেতই সহজ? ফেল বুড়িয়ে নিলেন। রাত তিনটে আগেরা মিনিটে ভিতর থেকে একটা লাইন বেরিয়ে এল, মানুষের কী রইল?

গল্প

কীর্তিমুখ শীঘ্র ভট্টাচার্য

বিষ্টি নামার পূর্বমুহূর্তের চাপা স্নিকাতায় টাইটুর চতুর্ভিক। মেথলা আকাশ জল-জলভর্তি চৌবাচ্চায় একপ্রশ্ন জন্মীয় বাতাসে ঢেউ বেলবার প্রয়াসের ভিতর মাছুগুলি বুঝে নিতে চাইছে জমাট মেঘের অকস্মিক কতদূর? কিন্তু এতসব কিছুই তো জন্মিয়ে বৃষ্টি শুরুর ধারা ইচ্ছিত। বৃষ্টি পড়তে শুরু করলে অনেক কাজ শান্তনুর—চৌবাচ্চায় নেট বিছানো, চৌবাচ্চার নীচের কল খুলে কিছু জল বের করে দেওয়া যাতে বৃষ্টির জল ধরে রাখা যায় চৌবাচ্চায়। এ সব ভাবতে ভাবতে রহস্যদান পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে সে আবার বিমম হয়ে যায়।

গীতিকে ওরাই পাঠিয়েছিল না নিজেকে এসেছে? গীতির অবশ্য এতকখন বাস ঠুঁপে শৌছে যাবার কথা টানা দু'মাইল হাঁটার পর। গীতি কি বাড়ি শৌছে টাটি খুলে কেনে নৈবে বাতাসে কত শাহাশ্য আতড়া আজকে? বৃষ্টির গদগদা কতদূর পল্লভ ব্যাপ্ত হবে? গীতি কিন্তু এমনভাবে এসেছিল যে কোনও প্রসঙ্গের মীমাংসার তাড়না ছিল। প্রায় আট ন'বছর ধরে তৈরি হওয়া শ্রুত যে কীভাবে উপস্থান্য করছে হয় তার রীতিনীতি না জানার জন্যই যেন করা হল। প্রায় শান্তনু নামের এক-মুহূর্তে হুত উঠতে পারছে না মানুষের প্রত্যাবর্তনের কোনও কি নির্দিষ্ট বিশা আছে? কিন্তু যে বাকি উঠানের সূর্যের নীচে ধাঁড়িয়ে তাকে ধরে চুকতে বলাগা পারহুয় হারিয়ে গীতি এতাইই নিশ্চল ছিল যে শান্তনুকে বলতেই হল—'ছাড়া পেয়ে চলে আমরা'।

মায়ের অভায়ে মুল্লনও এসে ধাঁড়িয়েছিল বারাদার প্রিলের ওপারে। বোঝা যাচ্ছে—ভল্লোকেবল মুখে মুখে কি শান্তনুর প্রত্যাবর্তনের নির্দিষ্ট বিশা হারিয়ে সম্পূর্ণ দিশাহারা অবস্থার আশঙ্কায় তৈরি হচ্ছে—'এ কেনম ফিরে আসা?' কোনও মিছিল নেই, উৎসব নেই, জাফানি নেই, নিঃসঙ্গ একাকী ফিরে আসা মেয়েটা ভিহির শিটে ধাঁড়িয়ে মাছ ধরবার ভঙ্গিমায় দেখছে। তবে কি মায়ের শ্রুতির ধারাবিবরণীতে তৈরি হওয়া শান্তনুর অব্যাব না অনেকটা পুরনো মটোপ্রাক্ষির কাগাম থেকে তৈরি হওয়া

একটা মূর্তির অংশট ভাব—ভাতছে আবার এক বৃত্তও তৈরি হচ্ছে মেয়েটার মনের মধ্যে। ভাতা গড়ার মধ্যে কোনও এক বৃত্তের ভিতর ধাঁড়িয়ে তির তির করে কেনে উঠে দুই উল্লম্ব মালা দিয়ে রক্তপুষ্পের প্রিলের পাভা অবধি নেমে আসতেই 'মা' বলে অর্জানদ কল ওঠে।

প্রিলের ভালো মুল্লনার জন্য চাবি হাতে গীতি দৌড়ে এসে ধাঁড়িয়ে ভাবছে এই কি তার আর এক সৃষ্টি? যার মুখে এ মুহূর্তে কোনও কথা নেই কেবল তার দিকে তাকিয়ে? হয়ত এই মেয়ে তাদের মৃত্যুর পর তাদের স্মৃতি হয়ে থাকবে। 'শ্রুত' ধাঁড়িয়ে ধাঁড়িয়ে আমায়েব শিশু নারী হয়ে যাচ্ছে।' গীতির মুখে অপ্রত্যাতে হাশ প্রিলের ছায়াব নকশার জালে আঁকিয়ে গেলে নীল নিজজ চোখে শান্তনুকে আরও একবার দেখে নিয়ে মুল্লনকে জড়িয়ে ধরে ধারের ভিতর চলে গেল।

শান্তনু আবার প্রিলের এপারে একা। এতদিন কয়েদখানার গরাদে জ্বা ধরা লোহার গন্ধের ভিতর যেমন সে একা ছিল তেমনই একা প্রিলের জামিতিক নকশার এপারে।

গীতি এবং মুল্লনের নীরবতা তীব্র অসহন্য এই মুহূর্তে বা, বেশ কিছুকাল পর গীতির চাপা গলা শোনা গেল—'ইনি হচ্ছেন তোমার বাবা। তুমি একদম যাবোবো না সব মেয়েদের এরকম হয়'।

জননী ও কন্যার নিরপরাধ পৃথিবীতে এভাবেই কি ফিরে আসা হবে? বাড়িতে আসবার সময় সে রীষের হুড় তুলে পর্না নামিয়ে নিতে বলেছিল। এখন তো রীষের প্রচণ্ডতা বা বৃষ্টি নৈই তবে কেন হুড় তুলে পর্না ফেলতে হবে? রীষাওয়ালাব প্রতিবাদের প্রত্যুত্তরে বলেছিল বৃষ্টি, নামতে কতখন?

উঁচু এন এইছে বাতাস আটকে যাবার ফলে কিছুটা লাকিয়ে উঠে কাড় শুর হয়ে গেলে সে দেখে এখন আর সে রকম বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। গীতি যেভাবে এসেছিল সেভাবেই ফিরে গেছে।

বাড়ির সমস্ত দরজা জানলা খোলা এখনও, তখনও ছিল—সামান্যকণ এভাবেই থাকে। যেটা সফর গীতি তার নাগালের মধ্যে ঘুরে ঘিরে হ'সাত ঘণ্টা কাটিয়ে ঘিরে গেছে। ভুলে একবারও ফুলের প্রসঙ্গ তোলেনি। ফুল কি সেদিন নিরন্তর অসম্পন্নভার মধ্যে কোনও পুন্নির পীড়নের রক্ত থেকে লবণাক্ত গ্রান নোয়ার গোপন প্রয়াসে নিমগ্ন ছিল?

গোপন প্রয়াস কেন? ফুলন জানতে চাইতেই পারে তার বাবা বুনি কি না! দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে আইন বাহী বিনিময়ী সাধুক ব্যারতে বীমবার জন্য হন্যে হয়ে শেষ পর্যন্ত প্রমাণিত হয় দলবলভাবে হাসলা চালিয়ে গার মেথকে খুন করা হয়েছে। যদি দলবল লড়াই থেকে আর শ্রেণী সত্যায়ন থেকে অস্ত্র তোমার হাতে থাকলে তোমার রেহাই নেই—তুমি বুনি। শাদনুর দলবলর প্রশম করারও হয়ে যায়। এই একটি ঘটনাই তাকে অন্তরকর রেখে পুন্নির করে তুলেছিল এক সময়। সে যেন দল অন্ধকার মনে অণুদল ক্ষেপে শাদনুর তক্ষাত রাষ্ট্রতে প্রেরণিত অনেক অনেক দিন। অন্ধকারের তাকসে ফেলা যেতে আয়ুনের ওপাশের কাঁ পাওয়ারে জোড়া জোড়া চোখ বদলন করছে। কিছু তারো কি? তারা তো আয়ুনের সীমানার বাইরে। কখন যে সেই গল্পের পাখির মতন সোঁটে করে অণুদল অমায় শৌঁছে নোয়ার জন্য উড়তে উড়তে গিয়ে অণুদল ধরে যায় বৃথাকে যেতে। তখনও শাদনুর 'এটা কি কেবল ব্যতিক্রম?' প্রশ্নের উত্তরে নকুলদার উত্তর ছিল। এক সময় এই প্রশ্নের উত্তর নকুলদা না দিয়ে এমন এক জায়গায় দৃষ্টি স্থপিত করত সেখানে পুন্নি অতীত।

পাটি অকিসে টেলিফোন করে এলে গীতি অস্বা ভাবের ভাগেই জেনে যেত শাদনুর আসবার কথা। কিন্তু মেয়াদ শেষ হবার ভাগেই পাবার কথা ঘরের ওটাই বিদুল ছিল যে কোনও খবর বোঝার কথাই মনে হয়নি শাদনুর। দিন ব্যাপনের প্রলিভিত প্রতিদিন অণুদল ধরে যেতে বেশভূষা পাওয়া যেনে ফুলনের কলিত্ত মনোবল বা তাকে মাহুলের মতন থাকতে ধরবার লোভ তখনও—বলশেষে তীরে শৌঁছে দেখে সে একা। বঙ্গ প্রিলের ভিত্তি ফুলন খুঁজ মলিয়ার রূপান্তরিত হয়ে চলেছে—প্রিলের বাইরে বাড়ির উল্টোনে রঙিনয়ে প। মাহার উপর বহুভূমির মতন বিশাল আকাশের নীচে সে কি একটা? এককোরে একা—!

রূপকথার গল্পে যখন দুমতে চলে যায় অসম্পন্নভাবে রাক্ষসনা—ফুলন কি মেমেন্ডার চলে গেল? বাইরে যে তার বাবা দাঁড়িয়ে। মেসের নাম ধরেই কি ডাক দেবে শেখ পল্লভ? গীতিই বা কোনম তাকে এভাবে বীভ করিয়ে রেখে গরোয় গীতি কি করছে? ততক্ষণে প্রিলের নগরায় শৌঁচিয়ে ওঠা লগেনার ভাঙার ফুলের দিকে রক্তর গোপে সে মন কববার চেষ্টা করে, গাছটির কি নাম? এক সময় এর বোটাঁনি নামটুকুও জানত—এ গাছের ফুল চিরকালই

পদ্ম গীতির। কিছু নামলে প্রিলের ওশাটাই ধরের আদল শেষে ডুবি রু হয়ে যায় প্রয়াসজনে। এ রকমই বাসনা। শাদনুর সপ্তম করে আনা কোনও এক প্রাচীন পাথরের মূর্তির ওপরে কীর্ত্তম্ব অংশটি এখনও রাখা। আগে অবহেলায় মাটিতে গড়াত এখন সেলক তৈরি করে এমনভাবে স্থাপিত যে সহজেই স্তমির সহজগাঠ হয়ে যায়। গীতি কি জানে কীর্ত্তম্ব কি? এ তো জীবনের জীবন সহ্যের করে বেঁচে থাকতেই রূপক। নিজেই শা থেকে যেতে যেতে ওপরের দিকে উঠতে উঠতে মূখ হাড়া কিছুই মনেই নেই। জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে এর চেয়ে বড় নিদর্শন বুনি আর কিছুতেই নেই—এ রকম ভাবনার মধ্যে গীতি প্রিলের তাল্পা ফুলে নির্বিকার শাদনুর দাঁড়িয়ে থাকা দেখতেই থাকে। বাইরের চারপাশ কাঠোঁর গাছটিতে বসা কাক ডেকে না উঠলে গীতি বা শাদনুর সবিত ঘিরে আসতে গেরি হত। কেননা তারা দু'জনেই নিজের চারিদিকে ত্রম লাগিয়ে ছল যাইছিল অশান্ত্রাবী এক স্থিরচিত্ত।

শাদনু ধরে কিছু কিছুকণ কববার পর মনে লস স্বপ্ন আর গীতি মনে না, অস্বা পিছুটানে যেন একই জায়গায় থাক যেতে দুগুণে। অস্বেকাল পর গীতির নীচের অংশটি ভাঙাটা ছিলে হলো দীর্ঘনিদ্রাসের মতন বলে ওঠে, 'আজই স্বপ্নম তো একদম নাওরত হয়ে গেছে'। ডুমার ফুলে টাকা হাতে নিয়ে মোড়ের নগরকে বোঝান থেকে এক প্যাকেট স্যানিটারি ন্যাপকিন কিনে আনতে বলে শাদনুকে।

যে রাষ্ট্র দিয়ে কিছুকণ আগে সে এসেছে সে রাষ্ট্র এখন ভীষণ অশান্ত্রিত। পরিবর্তনের ছাপে উড়ারি চিহ্ন স্পষ্ট। দিনান লাইটের বিজ্ঞান রাস্তে বিজ্ঞপিত হবার অপেক্ষায়। মানুষের প্রয়াসকো রাষ্ট্র শন্য হতে হতে পুন্নির দরজা অগ্নি শৌঁছে গেছে। মোজার টিগাটোর মেলিফোন সেটোরের মাথায় ছোট করে 'নিউ' লেখা। গীতির সাথে বিয়ের পর এই জীবনদার, মোজারের কাউন্টারের সামনে একদিন চারবার এসেছিল, চারবারই মাথাধারার টেবলট কিসেছে, পাঁচবারই মাথা টিপেচেনা সবার সামনেই ধমকে উঠেছিল—'মাথা ধরার টেবলট হয় না, মাথা ধরা হাজারবার টেবলট পাওয়া যায়। আর কখনো মাথা ধরার টেবলট রাইডেই বসা কেটেই মেলেন। বিয়ে করলেই যখন কি চাইছিল বুনি' বলে হাত চেষ্টে ধরে আবার বলেছিল—'এত সজ্ঞা শেলে স্তমির করণি কি করে?'

জীবনদার তার থেকে বড় জোরা সাত আট বছরের বড়। তার ছবি চম্প দিয়ে মাঝ আঁকবার প্রয়াস নিয়ে টাচানো। এর কাছে মতবার গীতির ছোটোখাটো মেয়লি প্রয়াসকো এসেছে সামনে পরামর্শ দিয়েছেন। ফুলনের সময় বলেছেন, 'ভাঙারের কাছে যাবি'। ম্যাসেল ফাইল ডেকে দিতেন—'এটা ষড়মাকে টিক মডন বাওয়াবি'। শরীরের বোঁজ বর দিতেন। শেখ কি কথা হয়েছিল মনে কববার চেষ্টা করে শাদনু। কেটেটের রায়ে পর ভাঙে তুলবার

সময় মানুষটাকে শূন্য হাত নাড়তে দেখেছিল। সব কথা বোঝবার জন্য ভাবার প্রয়াসজনে না। চোখের ভায়াই বোঝে। তার সহকর্মীদের খেণ্ডী সামান্যমাণ না থাকার ছেড়েও কেকুর খালাস হয়ে যাবার উত্তেজনার মধ্যে মুহুর্তের জন্য অসহায় ভাবে সে জীবনদারকে দেখেছিল—জীবনদার চোখ বিলিক দিয়ে উঠেছিল—'সব ঠিক হয়ে যাবে'।

শাদনুকে এ ভাবে কাউন্টারে দাঁড়িয়ে থাকতে তখন সপ্রতিভ একটি মেয়ে এগিয়ে এসে জীবনদারের ছবি থেকে চোখ না সরতে স্যানিটারি ন্যাপকিন দিতে হল। যে বস্তুটি এতক্ষণ কাঁচের পো কেসের ডেডের সর্বসমক্ষে বন্দুকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ছিল মুহুর্তের মধ্যে গোপনীয়তার প্রয়াসকো হয়ে পড়ে কারও প্রয়াসকো আসবার জন্য। সেটিকে বাসি মৈনিকের মোড়ক বেঁধে কাচের পরিবনি ব্যাগে ঢুকিয়ে গম্বীর মুখে মূলা হুয়ে নেয় ছেলেটা। শাদনু জীবনের সম্পর্কে একটি কথাও জিজ্ঞেস না করে চলেটা। মাথো ব্যক্তি ততক্ষণে গীতি শাদনুর পুরনো জামা কাপড় আলমারি থেকে বের করবার মনে ভুলিয়ে ত্রি ন্যাপকিনের গন্ধ—শাদনু ধরে চুকই চের গায়ে।

গীতি যখন এ ব্যক্তিতে চুকছিল তখন দেখে সমস্ত দরজাই হাট করে মনে ধরা এবং এতটাই গুরুত্ব না অপ্রাকৃতিক মনে হয়। শাদনু তখন মাছেরনে মোরা ভাগ করতে এতই ব্যাপ্ত ছিল যে গীতির গমন নিঃশ্বাস যাড়ের উপর আছড়ে পড়তেই সে মাছটির নাককোর রিক চীচের অশ্রুতে ওশেটা দিলে হাত চালিয়ে খাঁপের মনগণ্য বুকে দিতে চাইছিল নিয়ে মানুষের জায়েত কিনা, কিন্তু কখন যে মাছটি তার মনগণ্য নিয়ে হাতের তাল্পি না স্পষ্ট হয়ে যায় সে বুঝতে পারত না। 'বাবা কতকণ দাঁড়িয়ে আছি টেঁকে পাছ না'—গীতির কথাতে সংকতি ফিরে মাছটিকে জলের ভিতর ছেড়ে দেয়—জীবনের কোনও লক্ষণ নেই শূন্য চৌচাওয়ার পরিমার্জ জলের ভিতর মাছটির শরীত তলিয়ে যাবার পথ প্রাকৃতিক নিয়মেই তৈরি হয়ে গেল। গীতির পীড়নের দামের ভিতর মুঠি কেনা পারমিউনের যে গাফটা কিছু মেরে থাকত সব সময় হাত তা এখনও আছে তা কি সে বুঝতে পারত না। তবে কি আট ন'বছর অনেক কিছুই সিদ্ধান্ত থাকে না। সে বুঝি ফিরে ভাবে মাছটির দিকে লক্ষ করে দেখল এখানেও কোনও জীবনের স্পন্দন তৈরি হচ্ছে না অথচ অন্যথা মাছেরা নির্বিকারে জলের মধ্যে মতন বস্তু পথ অবলীম্বায় তৈরি করে যাচ্ছে। সে শূন্য মাছেরদে ফিরের প্রত্যেক অনুম্বাণী পৃথকীকরণ করছিল। এক জায়গায় একই ভাবে থাকলে সহস্রদে মতবার স্পন্দন স্পষ্ট তৈরি হয়ে বৌনতা করে নিয়ে উৎসাহন মতন হতে পারত। এ সব ভাবনার মধ্যে গীতির দিকে তাকিয়ে সাবান হয়ে গেল—কেননা সে বুঝতে পারছে না গীতি নিজে এসেছে তা কেউ পারিয়েছে।

বহুদম্পুর জেলে বদলি হবার পর গীতি একবার দেখা করতে এসেছিল অস্বা গীতি চাকরি পেয়ে গেছে ততদিনে। নকুলদা বোঝার গীতির সঙ্গে ছিল। শাদনুর সেই একই প্রশ্ন ব্যক্তিভাতা না শ্রেণীসমগ্রায় না করায় নকুলদা বলেই ফেলে কোন, ফুল জিজ্ঞেস করলি না?

—ফুল মাই হোক সিংসাবন তো একই।
এ কথা উত্তরে নকুলদা কি ফুল কে জানে—কিন্তু তাদের দু'জনের একা থাকবে যিয়ে বাইরে ছল যায়। তখনই গীতিক বিদ্যায় অরণ্যের বৃক্ষ বলে মনে হয়। কেউ ফেলা বৃক্ষগুড়ি থেকে আবার ক্রা নিয়ে সেই বৃক্ষ বা উদ্ভূহ নিয়ে দাঁড়িয়ে। গীতিই একসময় বলে ওঠে—বুনি কুশি তো?

শাদনু জানে এ ক্ষেত্রে কোনও বিনিময়ের প্রশ্ন ওঠেনি। যোগ্যতা ছিল, ফুল কমিটিকে নিয়ে নকুলদার কাজটি করিয়েছে। গীতি আছ তার হাঁহ মনে হয় এ ক্ষেত্রেও বিনিময় পাটোছে নকুলদার কেননা শাদনু ফিরে আসবার কিছুকণ পরই নকুলদা চলে এসেছিল বাড়িতে। কোনও রকম ভাড়াটা না করেই সরাসরি জিজ্ঞেস করে—'তুই কি এখন থাকবে?'।

শাদনু ভাবতে শুরু করেছিল নিজেই প্রশ্ন তুলে, কেন? মনে সে এখানে থাকবে না? বারবার তার মুখটা বিকৃত হতে হতে মনে হল সে ভয়ঙ্কর কিছু চিরুচ্ছে।

—'তুই হুত জানি না হার মোয়ের ছেলে সত্য এককল নির্লব্দ সন্ধ্যা জেনা পরিঘে। পরিঘে আমরা চার চাশ—ওর ভোটোই পাওয়ারে'।

নকুলদার কথা শেষ হতে শাদনু নিঃশব্দে হাসল। তার হাসিটা কিরণের মতন তার চোখের দু'গ্রাস জুড়ে ছিল হয়ে কিছুটা সময়েই গার থেকে আবার বাতালিক। এখন আর নকুলদা শাদনুর দিকে তাকিয়ে কান করে না। গীতিটাই বন্ধছে—'এখানে থাকলে পুরনো মনুজ্ঞান আসবেই—তখন নানান প্রশ্ন—'

যে কথাটা নকুলদা না বলে ছল সেলেন সেই না বলা কথা—'সত্য যোহ না শাদনু এখানে থাকুক' ধরের রাষ্ট্রভাঙার ওগার গভীরতায় শৌঁছে দিয়েছে। শাদনু মেয়াদ যাবার পর এ ধরার পাশে আরও একটি ঘর হয়েছে। যেন ঘরের মধ্যে ঘর আবার অন্যতর জীবন বা চাঁদর মতন প্রতিমায় মেরে যায় আবার বেঁচেও ওঠে। মাত্র কয়েকদিনের মৃত্যুতে কিছু কি হেরেফের হয় চিরমের? এ তো স্ববিশ্বাস ফিরে আসতে পারে আবার। গীতি কিছু কববার আগে সে বলে ওঠে—প্রাসের ব্যক্তিভাতা হয়ে যায়। 'বাবা মায়া যাবার পর তো তালা বন্ধ' গীতির উদগীন কথার উত্তরে শাদনু শূন্য বসন্তে মেরেছিল—'দেখল তো হানি'।

অনেক সময় মেরেচা ভীষণ সংক্রামক হয়ে এবং তা আশ্রিয়ে পড়ে আক্রান্ত করেছিল আবার। তারপর থেকে শাদনু এখানে—

সজনীকান্তের রবীন্দ্রচর্চা

সর্বানন্দ চৌধুরী

আমার মনেশচন্দ্র সেন তাঁর জীবনব্যাপী সারস্বত সাধনাকে ধরেছিলেন—সাহিত্যের মজুরি। কথ্যটা সজনীকান্ত দাসও তাঁর নিজের সারস্বত সাধনা সম্পর্কে বলতে পারতেন। সাহিত্যের অঙ্গনে সাহিত্যের মজুরি বিশেষ মর্যাদা পায় না। তা সত্ত্বেও, সজনীকান্তের জন্মশতবর্ষ স্মরণে তাঁর সম্পর্কে আলোচনা শুরুর হয়ে।

সজনীকান্তের সাহিত্যপ্রতিভার নিদর্শন—তাঁর উপন্যাস, কবিতা, গান বহু দিন ধরে সিনেমাহলে সমার পেয়েছে। কিন্তু এর বাইরে তাঁর কাজের যে বিরাট ক্ষেত্র—পত্রিকা সম্পাদনা, গ্রন্থ সম্পাদনা, মুদ্রাস্থাপন প্রভৃতির পুনরুদ্ধার, জীবনী সংগ্রহ, নবীন লেখকদের প্রতিষ্ঠা করা, সারস্বতপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা—এক কথায় এই সবকিছুই সাহিত্যের মজুরি। আর এই সন্দেশই চর্চা করেছেন বিনোদগোষ, মদুমন্দ, বহিষ্কৃত ও রবীন্দ্রনাথের মতো যুগধ্বজ সাহিত্যিকদের নিয়ে। তবে, এর মধ্যেও তাঁর রবীন্দ্রচর্চা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ, সেখানে প্রহরজ্ঞ জ্ঞানের সঙ্গে মিশেছে ব্যক্তিগত সাহিত্যের উল্লেখ।

এক শতকেরও বেশি সময় ধরে রবীন্দ্রচর্চার যে ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে, সজনীকান্তের সেখানে বিশেষ ভূমিকা আছে। তিরিশ-চল্লিশের দশকে প্রশান্তকান্ত মহলানবীশ, পুজিবিস্তারী সেন, প্রবোধচন্দ্র সেনের মতো আরও যাদের হাতে রবীন্দ্রচর্চা একটা শৃঙ্খলা পেতে শুরু করে, সজনীকান্ত তাঁদের অন্যতম। পরিচিত খুব বিস্তৃত তা হলেও তাঁর রবীন্দ্রচর্চার বৈচিত্র্য ও গুরুত্ব খুব বেশি। তিনি একই সঙ্গে রবীন্দ্রশিল্পা করেছেন, রবীন্দ্রকৃতি করেছেন, রবীন্দ্রনাথের নিয়ে একাধিক কবিতা লিখেছেন, রবীন্দ্রবিষয়ক রচনা সংকলন ও সম্পাদনা করেছেন, রবীন্দ্ররচনার চিত্রনাট্য লিখেছেন এবং রবীন্দ্রজীবনীর উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। রবীন্দ্রচর্চার ক্ষেত্রে সজনীকান্তের পূর্বের বা পরের, আর কেউ সম্ভবত এইরকম বৈচিত্র্য নিয়ে আবির্ভূত নন। তাঁর এই বিচিত্র রবীন্দ্র-অধ্যয়ন স্পষ্টতই কেবলটা ধারায় বিন্যস্ত। যেমন এক : রবীন্দ্র সাহিত্যজ্ঞানোদয়, দুই : রবীন্দ্রবিষয়ক রচনা সংকলন ও সম্পাদনা, তিন : রবীন্দ্ররচনার চিত্রনাট্য নির্মাণ এবং চার : সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়—রবীন্দ্রজীবনীর উপকরণ সংগ্রহ।

যে কোনও লেখককেই বিরোধীমুখে দাঁড় করিয়ে তাঁর লেখা সমালোচনা করা, বরং বলা ভাল আক্রমণ করা—সজনীকান্তের সাহিত্যসমালোচনার সাধারণ বৈশিষ্ট্য। এই পাশাপাশি ওই লেখকদের প্রতি ব্যক্তিগত প্রজ্ঞা ও অনুরাগ প্রকাশেও তিনি অকুণ্ঠিত। সমকালীন কোনও লেখক এমনকী রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এর থেকে রেহাই পাননি। সজনীকান্তের প্রথম জীবনের রবীন্দ্রসাহিত্যসমালোচনার কেন্দ্র রবীন্দ্রনাথের রচনা ও গান। প্রায় সবটাই রবীন্দ্র-বিষয়ক। রবীন্দ্রনাথের 'আমি তিনি গো তিনি তোমারে', 'ওরে নবীন ওরে আমার কাঁধ', 'পথের বাঁদন' 'উর্ধ্বাধী' 'বর্ষাধন', 'সামান্য কতি', 'তোমার ও আমরা', 'মরণ মিলন', 'চঞ্চল' প্রভৃতি রচনার সজনীকান্ত পার্যন্ত অথবা সজনীকান্তেরই লেখা 'চিশাট', 'হোয়ালি', 'জ্ঞানি', 'সমুদ্র', 'রবীন্দ্রনাথের চিত্রসংকলন বা ছবিটা', 'বড়ো গুরুর বন্দনা', 'নৃত্যময়ী' প্রভৃতি রচন্যগুলির কথা এই প্রসঙ্গে মনে করতে পারি। রচন্যগুলি ১৩৩৪ থেকে ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের মধ্যবর্তী বিভিন্ন সময়ে 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত হয়। 'আরাধ্যক' পত্রিকায় প্রকাশিত 'নীরাজ' এই ধরনের আরও একটা রচনা। রচন্যগুলি রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য নিয়ে হলেও, সাহিত্যসমালোচনা এগুলির উদ্দেশ্য ছিল না। রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ এবং তার মধ্য দিয়ে 'শনিবারের চিঠি'র কাজটা বাড়াচ্ছে এই প্রধান উদ্দেশ্য। সুতরাং এসব রচনায় মুদ্রির কলিমা থাকলেও, চিত্রার দীপ্তি প্রকাশ পায়নি। তবে, এই ধরনের রচন্যগুলি সে যুগে সাধারণের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের চিত্রার যে বাড়িয়েছিল—এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। সজনীকান্তের হাতে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য নিয়ে মনেজ্ঞ আলোচনা পাই এর অনেক পরে—১৩৬৭ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য' গ্রন্থে। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সম্পর্কে সজনীকান্তের বিভিন্ন সময়ের ভাষণ এই গ্রন্থে সংকলিত। আলোচনার মধ্যে কবিতা, নাটক, গল্প, উপন্যাস নানা দিক থেকেই রবীন্দ্রসাহিত্যের বিচার-বিশ্লেষণ আছে। সেই সঙ্গে আছে রবীন্দ্রসাহিত্যের ভাষা ও ছন্দের প্রসঙ্গ। এমনকী রবীন্দ্রসাহিত্য নিয়ে পরবর্তী গবেষণা সম্পর্কেও সজনীকান্ত এই আলোচনায় দিকনির্দেশন করে গেছেন। রবীন্দ্রসাহিত্যে শব্দব্যবহার আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন :

"দুঃখের বিষয়, শৈল্পীপীর ও ট্রান্সনিং-এর মত রবীন্দ্র-অভিধান এখন পর্যন্ত কেউ প্রস্তুত করেননি, করলে দেখা যেত আমাদের মতোভাষা তাঁর দ্বারা বিচিত্র শব্দগৌরব লাভ করেছে।"

'রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য', ১৯৬১

সুনাম দত্তের 'রবীন্দ্র কাব্যভাষা' বিরোজনাত্মক বিশ্বাসের 'রবীন্দ্র শব্দকাণ্ড', ভক্তিব্রতদাস মল্লিকের 'গীতাঞ্জলি : ভাষাতাত্ত্বিক সংঘাতাত্মক বিশ্লেষণ', বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবন থেকে প্রকাশিত 'ট্রেগোর কনকর্ড'—এ সবই বলা যেতে পারে, সজনীকান্তের ওই চিন্তার ক্রমপরিণতি।

রবীন্দ্রবিষয়ক রচনা সংকলন ও সম্পাদনার ক্ষেত্রে তাঁর দুটি কাণ্ড—'পশ্চিম বৈশাখ' এবং 'শনিবারের চিঠি'র 'রবীন্দ্র'। ১৩৪৯ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'পশ্চিম বৈশাখ'—রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে তাঁর লেখা তেরোটি কবিতার সংকলন। ছাত্র রবীন্দ্রবিশ্বভারতীর অন্তরালে যে গোপান রবীন্দ্রভক্তি সজনীকান্ত আকরশর ধন করেছেন—এই বইয়ে তা গভীর উজ্জ্বল উৎসাহিত। সজনীকান্তের রবীন্দ্রচর্চা প্রথম ধরনের নিদার পথ ছেড়ে, পরবর্তীকালে কখনও কখনও স্তব্ধ এবং অতিসূত্রিত হয়েছিল। এই কবিতাগুলির মধ্যে তাঁর পরিচয় আছে। তবে এই বইটিই প্রথম রবীন্দ্রবিষয়ক কবিতার সংকলন। পনেরো বছরের মধ্যে এ বই পাঁচবার মুদ্রিত হয়। এর থেকে বইটার প্রচারের ব্যাপ্তি সহজেই অনুমেয়। আর ১৩৪৮ বঙ্গাব্দে সজনীকান্ত সম্পাদিত 'শনিবারের চিঠি'র যে 'রবীন্দ্র-সংখ্যা' প্রকাশিত হয়, 'জাতীয় উৎসবের' পর সেটা রবীন্দ্রবিষয়ক আলোচনার দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য সংকলন। এই সংকলনে রবীন্দ্রনাথের নানা দিক—সাহিত্য, ছবি, গানের কথা যেমন আছে, তেমনই আছে রবীন্দ্রজীবনের নানা পরিচয়। যেখানে সংকলিত হয়েছে অপরীন্দ্রনাথ গুরু, মেহিলাল মজুমদার, যদুনাথ সরকার, অতুলকান্ত গুপ্ত, সুদীপ্তিমার চট্টোপাধ্যায়, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, তারাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, কুমুদপ্রভা মল্লিক, বনমল প্রমুখ আরও অনেক রবীন্দ্রনাথগীতির রচনা।

সজনীকান্ত যখন যে ধরনের কাজ করেছেন, প্রায় সব ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথকে যুক্ত করে নিয়েছেন। তাই চিত্রনাট্যও বাদ পড়েনি। চিত্রনাট্য রচনা করতে গিয়ে তিনি বহিষ্কৃত, শরৎচন্দ্রের মতো কল্পিত কথাসাহিত্যিকদের রচনার পাশাপাশি বেছে নিয়েছেন রবীন্দ্রনাথেরও দুটা রচনা—একটা উপন্যাস অন্যটা গল্প। 'সাহিত্যসমাজ পরিচয়'—এ থেকে জানতে পারি :

১৯৪৭-৪৮ খ্রীষ্টাব্দে নীতীন্দ্র বসুর উদ্যোগে

সজনীকান্ত বোম্বাই গিয়া রবীন্দ্রনাথের 'নৌকাডুবি'

অবলম্বনে বহু টিকিট লিমিটেডের 'নৌকাডুবি'

নামক বাংলা চলচ্চিত্রের জন্য চিত্রনাট্য রচনা প্তরন; 'মিলন' নাম হিন্দী চলচ্চিত্রটি ইহারই হিন্দী রূপ। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় এস.বি. প্রোডাকশনের আমন্ত্রণে সজনীকান্ত রবীন্দ্রনাথের 'দুটিদান' গল্পটিকে চিত্রায়োগ্যী রূপনের জন্য নীতীন্দ্র বসুর সহায়তায় চিত্রনাট্য রচনা করেন।

সজনীকান্ত তাঁর 'আত্মপুষ্টি'তে 'নৌকাডুবি'র চিত্রনাট্য রচনার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে লেখছেন :

'বইখানি বার বার পড়িয়া ও বিশ্লেষণ করিয়া মূল চরিত্রগুলি বাছাই করিয়া লইলাম এবং উপন্যাসের দ্বারা ধরিয়া স্বতন্ত্র ভাবে প্রত্যেকটি চরিত্রের কাহিনী রচনা করিলাম।' 'স্বরণ আছে বিশ্লেষণকৃত অর্থশাস্ত্রিক অসঙ্গতি চোখে পড়িয়াছিল, রবীন্দ্রনাথ কথা দিয়া যে ছবি ফুটিয়াছেন, ছবি দিয়া সে ছবি ফুটিতে গেলেই অসঙ্গতি ধরা পড়িতো...'

'এই সংকলন সমস্যা সমাধানের নীতীন্দ্র বসু আমার একমাত্র সহায় ছিলেন। শেষ পর্যন্ত উভয়ে পরামর্শ করিয়া একটা সম্মতিপূর্ণ চিত্রনাট্য খাড়া করিলাম।'

পৃ ৪৩০

'নৌকাডুবি'তে বড় উপন্যাসকে দু'ফন্টার ছবিতে আনতে গিয়ে যেমন সমস্যায় পড়তে হয়েছিল তেমনই 'দুটিদান' ছোট গল্পকেও ছবির মাশে বড় করতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে হয়েছিল। অবশ্য শেষ পর্যন্ত সজনীকান্ত 'কয়েকটি নূতন চরিত্র ও ঘটনার অবতারণা করিয়া সে পত্রিকাও উজ্জীর্ণ' হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বাদ-বিশ্প, রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে স্তব্ধ-প্রশস্তি, রবীন্দ্ররচনার চিত্রনাট্য—এই সব কাজ সজনীকান্তের রবীন্দ্রচর্চায় বৈচিত্র্য আনলেও প্রকৃতপক্ষে যে কাজের জন্য তিনি পরবর্তী রবীন্দ্রনাথসংকলন কাজে কৃতাভ্যুতাজন তা হ'ল, রবীন্দ্রজীবনীর উপাদান সংগ্রহ—রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিককার সাহিত্যচর্চা সম্পর্কে বহু অনুঘটকিত তথ্যের আবিষ্কার।

এই কালের প্রেরণা সম্পর্কে তিনি নিজেই জানিয়েছেন :

১৯২২ সনে যখন কলিকাতা ঋণিগণ্ডা কলেজের ছাত্র ছিলাম তখন 'প্রবাসী' পত্রিকায় (মার্চ, ১৯২৮) গ্রীষ্মশান্তকান্ত মহলানবীশ লিখিত 'রবীন্দ্রপরিচয়' পড়িয়া রবীন্দ্রনাথের বাংলা ও কৈশোরের রচনা সম্পর্কে প্রথম অসহিত হই। বিশ শতাব্দীর রবীন্দ্রসাহিত্য-পাঠকদের দুটি সন্তোষজনক সর্বপ্রথম প্রশংসকই এই দিকে আকৃষ্ট করেন। আমার কৌতল তখনই

জাপ্রত হয়। অসম্পূর্ণ 'রবীন্দ্র-পরিচয়' মাত্র
কয়েকটি অনামী লেখার উল্লেখ ছিল। তবে
লেখক এই আশ্বাস দিয়েছিলেন যে তিনি
'ভারতী'তে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের অনামী
রচনামূলকিত হবে কবিত্ব দিয়া স্বাক্ষর
করাইয়া লইয়াছেন। সে-তালিকা সম্ভবতঃ
প্রশান্তকুমার আর সাধারণের গোচর আনেন নাই।
আমিও তাহা আমার দৃষ্টিপথে পড়ে নাই।
শীত মাসের বৎসর পরে ১৯৩১ সনে রবীন্দ্রনাথের
ধর্মী সাহিত্যে আশিষাত সুযোগ পাই। তাঁহার
বালা, কৈশোরের বেনামী ও অনামী রচনামূলিক
সম্পর্কে পূর্বকার কৌতুহল পুনরায় জাপ্রত হয়
এবং আমি যত্ন অনুসন্ধান ও গবেষণা
আরম্ভ করি।

'রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য'

এই অনুসন্ধানের সূত্রেই ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে সজনীকান্ত
রবীন্দ্রনাথের লেখা 'অভিলাষ' ও 'প্রকৃতির বেশ' কবিতা দুটো এবং
'সেবিত্রী না অগ্নি ভারত সায়র', 'অগ্নি বিদ্যামিনী বীণা', 'ভারত রে
তোর কলসিত পরমধারসি', 'এক সূত্রে বঁধিয়াছি সহস্রটি মন'
ইত্যাদি কবিতা ও গান আবিষ্কার করেন। সেই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের
কয়েকটি ছন্দোময় চিত্রিত করেন। এই আবিষ্কারক স্বীকৃতি
জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন :

প্রীমান সজনীকান্ত দাস আমার বাণ্য ও কৈশোরের
বেনামী রচনামূলিক আবিষ্কার করে আমাকে বিম্বিত
করেছেন। পুরাতন 'তত্ত্বোবোধিনী' পত্রিকার আমার
সর্বপ্রথম মুদ্রিত রচনা 'অভিলাষ' তাঁহার আবিষ্কার
আমিছ। ইহার অন্তর্গত সহস্রক আমার সম্পূর্ণ বিম্বিত
ঘটেছিল। জ্যোতিষদার প্রথম চারটি নাটকের গান
যে আমার রচনা তা সজনীকান্তের দ্বারা মুদ্রিত
একাদশি। বিশ্বেশ্বরের দ্বিধাবন্ধার সহস্রক আমার
পরিচয় কবিতা 'স্বপ্নাবধি'তে আত্মগোপন করেছিল,
সেটোও সজনীকান্তের হস্তিগত ধরা পড়েছে।...
আমি যে কিস্কন্দা উদ্ভাটক ও অশ্রুচক্ষুস্তম্ভ
ভাঙ্ক ইত্যাদি ছন্দোময় এককালে অনেক
লেখাই লিখেছি তা জেনেও বেশ কৌতুক
বোধ করছি।

'আয়মুখি', পৃ ৩২০

এছাড়াও তুকারামের একটা অভঙ্গের অনুবাদ, ম্যাক্সব্দের
জবিনী অধ্যায়ের অনুবাদ এবং কুমারসম্ভবের তৃতীয় সর্গের
অনুবাদ সজনীকান্তের গবেষণার ফলেই রবীন্দ্ররচনা বৃশে পরিচিত

হয়। ওই বছর অর্থাৎ ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দেই 'শনিবারের চিঠি'র
'রবীন্দ্র-রচনামূলিক'তে সজনীকান্ত এই সব নব আবিষ্কৃত তথ্য
ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করতে শুরু করেন। একই বছর
'কবিকাহিনী' সম্পর্কে জ্যোতিষদার লেখা আনান তত্ক্ষণাত্
একটা পত্র আবিষ্কার করে সজনীকান্ত রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে
পুরস্কৃত হন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে রবীন্দ্রনাথের লেখা
কয়েকটা পত্রও তিনি পরবর্তীকালে 'রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য'
গ্রন্থে প্রকাশ করেছেন। এরপর রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছাতেই সজনীকান্ত
'রবীন্দ্ররচনাবলী'র সম্পাদকমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত হন এবং এ ক্ষেত্রে,
সজনীকান্তের মতামতকে রবীন্দ্রনাথ যে কতখানি গুরুত্ব দিতেন—
তা লেখা যায় পুঁথিবিহীন সেনেক লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি
থেকে। চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন :

সজনীকান্তের সঙ্গে আলোচনা করে বিস্ময় করছি
যে রাজা ও রাণী ও বিসর্জনের পাঠ্যভট্টাবলি
দ্বিতীয় বচনই পরিশিষ্ট ভাগে প্রকাশ করা কর্তব্য
—নাইলে তার উপযোগিতা ব্যর্থ হ'ত।

'আয়মুখি', পৃ ৩২১

'রবীন্দ্ররচনাবলী'র প্রথম বচন, 'সম্ভাষণমীত্রে'র পূর্বে লেখা
রবীন্দ্রনাথের কাব্য, প্রবন্ধ, চিত্রপত্র বর্ণিত হয়েছেন।
সম্পাদকমণ্ডলীর ইচ্ছা থাকে সত্ত্বেও অপরিসীম ব্যয়সহ এই
লেখামূলিক ছাপার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহি ছিল। অতঃ পরে
কাছে এগুলি প্রকাশ করাও অত্যন্ত জরুরি। কারণ :

মন-ভিত্ত-হারি বা রাম-শ্যাম-মুদর রবি কাগজের
যাটা ও শেটস ভাইরি লইয়া তাহাদের নিতান্ত আপন্যার
জন হাজা কেনো মানুষই মাথা ঘামাইয়া না কিছু
উইট্রিয়াম শেনকীয়ার বা রবীন্দ্রনাথ মাকুরের বা
ও ভাইরির বোঁজ শুমিরি সব মানুষই করিবেন। নিছক
এইহাসিক কৌতুক মাত্র নয়। কবিত্ববোধের ধারাবাহিক
সাধনার ইতিহাস, কাব্যোপলব্ধির পরিচয় সদয়ক।

রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য

সজনীকান্তে এই দুইটির কাছে রবীন্দ্রনাথ পেশ পাঠ্য পদ্ধতি
হন এবং সজনীকান্ত ও ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায়
'অচলিত সত্য' প্রথম ও দ্বিতীয় বচন ওই সব রচনা প্রকাশিত হয়।
রবীন্দ্রনাথ যেমন নিজের রচনার ক্ষেত্রে, তেমনিই অন্যের রচনা
সংকলনের সময়েও সজনীকান্তের পরামর্শ নিয়েছেন। 'বাংলা
কাব্যপরিচয়' গ্রন্থের নতুন সংস্করণ তৈরির সময়, কবিতা নির্বাচনে
রবীন্দ্রনাথের অন্যতম সহযোগী হয়েছিলেন সজনীকান্ত।

সজনীকান্ত রবীন্দ্রনাথের শূণ্য সাহিত্যজীবন সম্পর্কেই নয় তাঁর
কর্মজীবন সম্পর্কেও নতুন সংবাদ এনেছিলেন। বিস্ময়ভীত
হৃদয়ের বড় পূর্বই যে কবিকৃষ্ণ নিজের জন্মদিয়ার অন্তর্গত

কালগ্রাম পরগণায়, অতুল সেনের সহযোগিতায় পল্লি উদ্যানে
প্রতী হয়েছিলেন এবং যুর্দেশি সমাজ গঠনে প্রযাশী হয়েছিলেন—এ
তথ্য সজনীকান্তই প্রথম যুর্দেশি সমাজের প্রকাশিত 'শনিবারের চিঠি'তে
'রবীন্দ্রজীবনের নতুন উপকরণ' শিরোনামে এই বিষয়ে তার বিস্তৃত
আলোচনা প্রকাশিত হয়। এই নিবন্ধটি ছাড়াও সজনীকান্ত
'শনিবারের চিঠি'তে তাঁর লেখা 'প্রথম আলোর চমকধ্বনি', 'রবির
পূর্ণ উষ', 'রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রিয়া প্রসঙ্গ', 'মানসীর দুইটি
কবিতা', 'স্বপ্নাবধি'র পরিচয় রবীন্দ্রনাথের লেখা ও বাস কৌতুক',
'আমার রবীন্দ্র-সত্য ইতিহাস', 'বাংলার মাটি বাংলায় জলের কবি
রবীন্দ্রনাথ' প্রভৃৎগুলির মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রজীবন ও সাহিত্যের বহু
নতুন দিকের সন্ধান দেন। নিবন্ধগুলি ১৩৪৬ থেকে ১৩৪৮
বঙ্গাব্দের মধ্যবর্তী বিভাগ সময়ে প্রকাশিত। রবীন্দ্রজীবনের দু'একটা
গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্কেও সজনীকান্ত রবীন্দ্রাবল্যবন্ধের নজরে
আনেন—তাঁর প্রবন্ধ, ভাষণ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে। যেমন কাস্তিক
১৩৩২ বঙ্গাব্দে 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত তাঁর স্বাক্ষরহীন রচনা
'রবীন্দ্রনাথ ও রম্যা রঙ্গা' অথবা রবীন্দ্রসত্যবর্ষে বন্ধীয়
সাহিত্যপরিষদের প্রদত্ত ভাষণ 'রবীন্দ্রনাথ ও বন্ধীয় সাহিত্য পরিচয়'।
প্রবাসীর ওই রচনায় সজনীকান্ত রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রঙ্গার সম্পর্ক
নির্দেশ করে লিখেছিলেন :

রবীন্দ্রনাথ যে-সকল মহাপুরুষকে আধুনিক
জগৎভ্রমণে প্রাথমিক বর্ণনা করিয়া
দ্বীপীয় মহাদেশ মোহল ও বিশ্বপ্রাণ মনসী
রঙ্গাকে দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করিয়াছেন তিনি
নিজের তাঁহাদের অন্তরম্ভ : তাঁহার বিশ্বপ্রাণতার
কথা বিকে দিকে প্রচারিত হইতেছে ও
আমাদের বেশ ও জ্ঞাতিকি বিশ্বমানবের কাছে
গৌরবাহিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিতেছে।

রঙ্গা ও রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক নিয়ে পরবর্তীকালে অকল্পিত
করেছিলেন অথবা রবীন্দ্রাবল্যবন্ধার ক্ষেত্রে—যে-সব নতুন দিকের
সন্ধান দিয়েছিলেন, সমকালীন ও পরবর্তীকালীন
রবীন্দ্রাবল্যবন্ধের গবেষণায় তা পূর্ণ স্বীকৃতি পেয়েছে। প্রত্যন্তকুমার
মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রজীবনের পরিবর্তিত সংস্কারের ভূমিকায়
রবীন্দ্রনাথের অচলিত রচনা সম্পর্কে সজনীকান্তের গবেষণাকে
স্বীকৃতি জানিয়ে মন্তব্য করেছেন:

এই বিষয়ে প্রীদুস্ত সজনীকান্ত দাস ও প্রীদুস্ত
ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বড় গবেষণা করিয়াছেন;
তাঁহাদের প্রত্নান্বিত জীবনের প্রত্যয়াককারে
প্রবর আলোকসম্পাত করিয়াছে।

তবে ওই গ্রন্থে প্রভাতকুমার 'অভিলাষ' কবিতাটির প্রসঙ্গে
'শনিবারের চিঠি'র 'রবীন্দ্র-রচনামূলিক'র উল্লেখ করলেও, এটা যে
সজনীকান্তের আবিষ্কার তা উল্লেখ করেননি। হ্যাত এইরকমই কিছু
কারণে অভিমান করে সজনীকান্ত এক সময়ে নিজের আবিষ্কার
সম্পর্কে হলেছিলেন :

এই সামান্য ঘটনাটির উল্লেখ অত্যন্ত দুঃস্বপ্নের
সহিত এই কারণে করিতে হইতেছে যে পরবর্তী
রবীন্দ্রাবল্যবন্ধেরা অবধানভ্রমণতঃ রবীন্দ্রসঙ্গার-সেতু
বন্ধনে এই অধ্যম কাঁচবিড়ারী সামান্য
সাহায্যটুকু মরণের রথচেন নাই।

রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য

অথবা, প্রশান্তকুমার পাল তাঁর 'রবীন্দ্রজীবনী'তে 'অভিলাষ'
কবিতাটির প্রসঙ্গে সজনীকান্তের আবিষ্কারের কথা পরিষ্কার ভাবে
উল্লেখ করেছেন। যাই হোক, রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবন
আলোচনায় ক্ষেত্রে রবীন্দ্রজীবনীকারেরা সকলেই সজনীকান্তের
গবেষণার ওপর নির্ভর করেছেন। তবে, রবীন্দ্রজীবনের বৃষ্টিনাট
তথ্য আবিষ্কারের মধ্যেই সজনীকান্তের রবীন্দ্রঅনুধ্যান থেকে
থাকেনি। তা আরও গভীর হয়েছ, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে একটা
সামগ্রিক ধারণা উদ্ভাবনের মধ্য দিয়ে। এই প্রসঙ্গে, সজনীকান্তের
লেখা কয়েক ছত্রের রবীন্দ্রপ্রশ্নাম পাঠ করে এই নিবন্ধ শেষ করছি:

প্রথম করি পঠিত বৈশাখ,
আমার কবি তোমার কবি সবার কবি তাঁকে
তাঁহার মাঝে মিলিয়াছিল মোদের প্রাণধারা,
একটি রবি দিনের নভে, মোরা রাতের তারা
বিশ্বপ্রাণী আলোকে ধর মুখিয়া গেছি সবে,
প্রকাশ পাই এমনি কোন রাতের উৎসবে।
যদিও জানি বহু যুগের পর
তারার মাঝে ভাসতে পারি আকাশ-পারাবার
প্রশ্নাম করি পঠিত বৈশাখে
সারা যুগের সাংক্ৰান্ত্য গিরিয়া থাক তাঁকে ॥

ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

'প্রী সজনীকান্ত দাস'

ডেমোক্রেসি ও আমরা

রেণুকা বিশ্বাস

ডেমোক্রেসি বা গণতন্ত্রের সাফল্য গাইতে গাইতে কেসুরো হয়ে যাচ্ছে আমাদের কণ্ঠস্বর। আসলকথা গণতন্ত্র কী? সাধারণত, বলা হয় গণতন্ত্র হচ্ছে একটি শাসনব্যবস্থা যাতে সমাজের বা দেশের সর্বজনকে মূল্য দেওয়া হয়, তাদের মতামতকে গ্রাহ্য করা হয় অর্থাৎ কিনা এ শাসনব্যবস্থা জনগণ দ্বারা চালিত। আমেরিকান প্রেসিডেন্ট লিঙ্কন তার বাখ্যা করেছিলেন, "A government of the people, by the people and for the people". গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা জনগণের সংগঠন, তাদের দ্বারা শাসিত-চালিত এবং তাদের জন্য এ শাসন ব্যবস্থা। তাদেরই জন্য, তাদেরই স্বার্থে। এটি তাই প্রতিনিধিমূলক এবং সংখ্যালঘুদের মতামতের উপর এর ভিত্তি।

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার উদ্ভবনা হয়েছিল আমেরিকানতে বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিনের উদ্যোগে। স্বাধীনতা ঘোষণার পর যখন আমেরিকায় কী ধরনের শাসন ব্যবস্থা হবে প্রশ্ন উঠল তখন বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন বলেছিলেন যে আমেরিকান ইন্ডিয়ান (কেড ইন্ডিয়ান)দের পথিকদ ধরনের ব্যবস্থা সংগত হবে। কারণ এতে জনগণের মতামতের মূল্য দেওয়া হবে। তিনি লোকসভাধনিক যে যখনই কোনও সন্ধি বা ব্যবস্থাপনার প্রস্তাব রাখা হত আমেরিকান ইন্ডিয়ানদের কাছে, তারা বলত, "আমাদের পথিকদ বা কাউন্সিলের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে।" তারপর পথিকদে বসে আলোচনা ও তর্ক বিতর্কের পরে তারা যে সিদ্ধান্তে এসেছে সে অনুসারে তারা কাজ করেছে, তার নচড়ত হয়নি। বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন ওদের এ আদর্শে মুগ্ধ হইছিলেন। সেজন্য এই পদ্ধতির কাজ প্রচুর করেছিলেন। স্বাধীন আমেরিকায় শাসনব্যবস্থা ফ্র্যাঙ্কলিনের প্রস্তাব অনুযায়ী চলে সাজানো হয়েছিল। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা হয় ও দেশে। দেশের সর্বাধীন পদে এই ভিত্তিতে রচিত হয়। দেশের রাষ্ট্রপ্রধান, সাংসদ, বিচারপতি সবাই নির্বাচিত সদস্য।

স্বাধীনতার ভাষ্যবাদের শাসনব্যবস্থাও গণতান্ত্রিক। নির্বাচিত সাংসদ এবং বিচারকরা দেশের আইনকানুন নির্ধারণ করে থাকেন। তাঁরাই রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করেন। আমাদের দেশে গ্রামাঞ্চলেও নির্বাচিত হন পঞ্চায়েতের এবং জিলা পরিষদের সদস্য বৃন্দ। বিভিন্ন

সংস্থা সমিতিতেও এই নির্বাচনপ্রথা চালু আছে। পৃথিবীর বহুদেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। এমনকী সামান্যী এবং ফার্সিবাণী দেশগুলিতেও গণতান্ত্রিক প্রতিনিধিমূলক শাসনব্যবস্থা গঠন করা হয় বলে প্রচলিত।

মুশকিল হচ্ছে, প্রায় সব দেশেই সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং সংখ্যালঘু দলের অস্তিত্ব বর্তমান। ধর্মের ভিত্তিতে, ভাষা ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে, সর্বেশ্বরী জাতি বা বর্ণের ভিত্তিতে এ অস্তিত্ব। যুবাবতী হয় তারা সর্বোচ্চ স্তরের মতামত সমস্ত সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে। সংখ্যালঘুদের মতামত গ্রাহ্য বিবেচনা হয় না। আমার অনেক দেশে মেয়েদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা। কিন্তু সন্তানকে হয়ে নিজেদের জাহির করতে পারে না মেয়েরা তাদের বাইরে নানা কাজ পুরুষের মতো তারা মুক্ত নয়। ফলে তাদের মতামতকে অধিপতাকরী পুরুষ সমাজ গ্রাহ্য করে না। এ ভাবে বিরাট একটা জনসংঘর্ষের প্রচণ্ড পড়ে না দেশের আইনকানুন, শাসন এবং জিলাসন্যায়বাদিত। সমাজের প্রায় সর্ব ব্যাপারে তার কার্যকর অধিকারহীন এবং অন্যের দ্বারা শাসিতভাবে। অন্যের স্বার্থে নিজের স্বার্থকে খর্ব করে চলতে হয় তাদের।

আমরাও একটা মুশকিল আছে। আর্থিক ক্ষমতা এবং সম্পদ যাদের হাতে রয়েছে তারা রাজনীতিক এবং ক্ষমতাসালী কিছু লোককে হাতে মুঠে রাখবে। অন্যভাবে সংখ্যালঘু লোকদের এবং মেয়েদের মধ্যে সম্পদশালী বা বিভাবনের সংখ্যা নান্দা। তাঁরা বড় বড় শিল্পপতি বা কর্পোরেশনের মালিক নন। কার্যত তাদের মতামতকে তাদের স্বার্থকে শৌণ করার প্রচণ্ড প্রচেষ্টা। এ সব প্রচেষ্টা জনমতের উপর সম্ভবতঃ প্রচণ্ড করে প্রভাবশালী। অতএব মুঠিমেষ সংখ্যালঘু এবং মহিলা প্রতিনিধির মতামত শাসনব্যবস্থা এবং সংগঠনে প্রাধান্য পেতে অসম্ভব।

ব্যাপারটা এমন হয় যে স্বল্পসংখ্যক বিভবন এবং তাঁদের হাতে পড়ুল রাজনীতিক এবং প্রভাবশালী লোকেরা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে অনুসরণ করে নিজেদের স্বার্থান্বেষী আইনকানুন ও প্রকৃতি পরিচালনা করে। দেখা যায় বিশ্বের প্রায় সব দেশেই গণতন্ত্রের সত্যিকারের এবং মেয়েরাই মুখ্য নয়, সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের

সাধারণ মানুষদেরও মার যায়। তাদের স্বার্থ ধুলোয় লুটায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় দেশের আমজনতার স্বার্থের ক্ষতিকারক হওয়া সত্ত্বেও অনেক সময় বিশেষি দ্বারা আবাদনি হয়, বাজার দর বেড়ে যায়, দেশে বেকারি ও ছাটাই ইত্যাদি চলে। আমাদের দেশে শিক্ষার নিম্নতর, বেকারি, শিশুশ্রম, দরিদ্র ইত্যাদি তার স্বাক্ষর। আমেরিকার কিছু অঞ্চলকে apartheid আখ্যা দেওয়া হয়েছে। সেখানে অফ্রিকান আমেরিকান, মেক্সিকান আমেরিকান, নেটিভ আমেরিকান, পোর্টোগিজ আমেরিকানদের বসতি, দারিদ্র, অস্বাস্থ্যকর বাসভূমি, বেকারি ইত্যাদি এগুলির বিশেষত্ব। আমাদের দেশেও একটা বিরাট অংশ জীবনধারণের সাধারণ সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত। গ্রামাঞ্চলে, পানীয় জলের অভাব। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার অভাব বাসস্থানে, শিক্ষার অভাব, চিকিৎসা ব্যবস্থার অভাব। অর্থোঁর্জননে সুযোগের অভাব শহুরে ও গ্রামে। অতএব এরা গণের নির্বাচনে অংশ নেয় না। তখন বলতেই হয় গণতন্ত্র কার জন্য? আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় গণতন্ত্র মুঠিমেষ বিভবন স্বার্থসংগ্রহে বঞ্চিত স্বার্থহীন শাসনব্যস্থা। তাহলে "for the people" এর জায়গায় বলা হলে "Democracy is for a small group of people", অর্থাৎ কিনা গণতন্ত্র হয় কিছু সংখ্যক লোকের স্বার্থসংগ্রহে শাসনব্যস্থা। অন্য সংখ্যক লোকের জন্যই গণতন্ত্রের কলকাতা নেড়ে।

আমরা আও দেখি যে, যে-সব দেশে গণতন্ত্র চলিত আছে সেখানেই একটার বেশি রাজনৈতিক দল শাসনক্ষমতায় আসার জন্য নির্বাচন-ছুদে অর্জনকৃত হয়। প্রধানত দু'টিদল দল থাকে। যেমন আমেরিকার ডেমোক্র্যাটিক পার্টি এবং রিপাবলিকান পার্টি, ইংল্যান্ডের কনসারভেটিভ এবং লেবার পার্টি। অন্য যেসব রাজনৈতিক দল সেখানে আছে তাদের প্রভাব অদলগতভাবে বা সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে আঁকিচ্ছে। ভারতবর্ষে একসময় সর্বভারতীয় দলের সংখ্যা ছিল তিন চারটি, কংগ্রেস, মুসলিম লিগ, হিন্দুমহাভার। কমিউনিস্ট পার্টিও হল সর্বভারতীয়। বর্তমানে গণতন্ত্রের দলের মধ্যে কংগ্রেস, কমিউনিস্ট পার্টি এবং ভারতীয় জনতা পার্টিই বিশেষভাবে চোখে পড়ে। জনতা দল ও অন্যান্য দল তাদের প্রভাব হারিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি রাষ্ট্রে আরও কিছু আঞ্চলিক দলের উদ্ভি হয়েছে। কোনওটর আশংগিত আমাদের আছে, অন্যগুলি নেতাকেন্দ্রিক আঞ্চলিক দল। আমাদের দেশের গণতন্ত্র নেজনা বহুলপক্ষ (multi-party system) সমধি। এই দলগুলির মধ্যে যে ধরনের সংঘাত সংঘর্ষ ইন্দোনেশিয়া লেগে আছে তা মুসলিমশ্র-ভারতের রাজ্যরাজ্যদের যুদ্ধানি বা চিরবিষের ভ্রাতার লড়াই (war lord) দেব সংঘাত সংঘর্ষকে মনে করিয়ে দেয়। রাজনৈতিক এই রাজনৈতিক ভাষা, আঞ্চলিক, সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য, ধর্ম এবং নেতৃত্বের ভিত্তি শুধু দেশে বিচ্ছিন্নতার সৃষ্টিই করেনি, জনসাধারণের মধ্যে বিভ্রাণ্ডি এবং বিভেদ সৃষ্টি করেছে।

আরও একটা ব্যাপার লক্ষণীয়। যারা গণতন্ত্রের ধারক-বাহক তাদের আর্থিক এবং প্রতিষ্ঠা-মতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মুঠিমেষ পরিবার থেকে। এরা বিভবন বা বিভবনপুটিলের মুঠিমেষ প্রতিনিধি। নির্বাচনকালে সাধারণত দেখি এদের একজুড়ে অধিপতা। যে সমস্ত পরিবার এতে সামিল হয়েছে সে পরিবারগুলি ধর্মোন্মত্তে উজ্জ্বল সম্ভব বলে বা বহুকাল ধরে প্রচুরের গতিতে এসে পড়েছে বলে সমাজে প্রভুত্ব করে চলছে। নিম্নবর্ণের এবং সংখ্যালঘুদের ছিটকোটা এর মধ্যে অন্য মেয়েদের গতি দু'দিন দকে। এখানে বলতে হয় Democracy of the people বা by the people কথাগুলো সঙ্গোষনীয়। বর্ণনা এবং সংগঠিত হওয়া উচিত Democracy is a system of government of a small group of people, by a small group of people and for a small group of people, অর্থাৎ গণতন্ত্রকে জনগণের সংগঠন আখ্যা না দিয়ে বলা উচিত একটি স্বল্প লোকের এবং মুঠিমেষ বাক্তি চালিত শাসনব্যস্থা মুঠিমেষ লোকের স্বার্থ সাধনে নিয়োজিত।

গণতন্ত্রের বিরোধ সমাজতান্ত্রিকেরা বলেন যে গণতন্ত্র স্বাধীনতা কখন কখনো পূর্বাবস্থা সৃষ্টি হওয়া প্রয়োজন এমন কিনা দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার বিকাশ একটা বিশেষ পর্যায়ে পৌঁছানো দরকার। তবে ভাল অর্থনৈতিক অবস্থাও যে দেশে গণতন্ত্র আনবে তার নিশ্চয়তা নেই। তেমনিই এটাও অসম্ভব কথা যা না যে গণতন্ত্র দেশে উন্নত অর্থনৈতিক অবস্থার সৃষ্টি করবে রাতারাতি। শুধু আখ্যা এই যে গণতন্ত্র হলে আর্থিক অবস্থার প্রচণ্ড প্রসার হবে বেশি পুরুষ দেওয়া সম্ভব হতে পারে। তা ছাড়া তন্ত্রিত ক্ষমতার দ্বারা ত্রেনে ধারাও কিছুটা সম্ভব। ইন্দিয়া পার্শী করণের বলেন যে ভারতবর্ষের ইন্দিয়ান গণতন্ত্রের রাষ্ট্রের পাথে ও প্রচারণ করে। তারা যখন তাঁর জগদগুরু গান্ধীজীকে গান্ধীজীবন করে নি তখন তাঁকে ক্ষমতাসূত্রে করেছেন। তিনি বলেন যে যারা তাঁর স্থানে ক্ষমতায় এসেছে সে সময়ে, কিছুদিনের মধ্যে তাদের প্রতি বক্তব্যের আখ্যা কমে যায়। জনগণ নতুন সরকারের কাজকর্মের অসুখী হয়ে আবার তাঁর কাছে নতুন করে নির্বাচন লড়বার জন্য আবেদন জানাচ্ছিল। সেটি ১৯৮১ সাল এবং ইন্দিয়া গান্ধী করণের বাইরে ছিলেন। তাঁর উক্তির সত্যতা প্রকৃষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছিল। তিনি আবার নির্বাচিত হয়ে প্রধানমন্ত্রীর পদে আসীন হন।

অনেক সমাজতান্ত্রিক মনে করেন যে জনমানুষে একাধার গ্রহিত হা থাকলে সেখানেও গণতন্ত্র সম্ভব হয়। চিত্রায়তক গ্রাহ্য করার মতো সমুদ্রশীলতা যা থাকলে গণতন্ত্রের সৃষ্টি টানমন হবে। তাঁরা আরও বলেন যে, কোনও একটা রাজনৈতিক দল যদি শাসনক্ষমতাকে নিজেদের একচেটিয়া অধিকার ভেবে বসে তা হলে দেশে অজ্ঞানব্যবস্থা সৃষ্টি হতে পারে। ততো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা অসম্ভবও হয়ে দাঁড়াবে। এটাও দেখে যে

শাসনব্যবস্থায় সন্তুষ্ক স্বরূপধারণের যদি অধিকাংশ দেশবাসীর অজ্ঞানা হয়, এবং বরাবরই পরিবর্তনে গোপন করার প্রয়াস ধরা পড়ে যায় তাহলে জনগণের বিশ্বাস হেল আসে। এ রকম অবস্থায় ক্ষমতাসীন দলের বা তাদের পরিচিতির সরকারের পক্ষে ভবিষ্যতে পুননির্বাচন হওয়া একেবারে অসম্ভব হতে পারে।

নির্বাচন করে সংসদ এবং সরকার গঠন গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য। সাম্প্রতিক নির্বাচনগুলোতে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নির্বাচন করে নানা কৌশল অবলম্বন করে থাকে। সর্বাধিক নির্বাচনব্যয়ব্যয় রেজিস্টারি ভোটাররা ভোটদান করে নিজেদের দলকে প্রতিনিধি নির্বাচন করার কথা। কিন্তু কোনও কোনও রাজনৈতিক দল নানা ধরনের সন্ত্রাস মাফক ভোটারদের মনে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে। এই আতঙ্কের ফলে কোনও কোনও অঞ্চলের বাসিন্দারা আতঙ্কবশত দলীয় সমর্থন পরিবর্তন বাধ্য হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের একটি গ্রামাঞ্চলে রক্তাঘাট কেটে ভোটারদের চলাচলের পথে বাধা সৃষ্টি করা হল। ভোটাররা যদি নির্বাচন কেন্দ্রেই পৌঁছেতো না পারল তা হলে নিজেদের প্রতিনিধিই বা নির্বাচন করে কী করে? আমেরিকায় গত নির্বাচনে শেনসিলভেনিয়ার একটি অঞ্চলে প্রতিনিধি নির্বাচিত হল কিন্তু সংখ্যক অনুপস্থিতি ভোটে (absentee vote)। হোট হোট শহরে এমন হচ্ছে যে ভোটাররা শহরে উপস্থিতি থাকা সত্ত্বেও ভোট কেন্দ্রে উপস্থিত হয়নি। তাদের কাছ থেকে absentee ballot সংগ্রহ করে নেওয়া হয়েছে। ভারতবর্ষে ভোট কেনার রীতি প্রায় একটি দ্বীকৃত পদ্ধতি হয়েছে যুধীশ্বরের প্রথম প্রথম নির্বাচনে থেকেই। অন্য দেশেও এই রীতি চললে বললে অতুচিত হবে না।

গণতন্ত্রের বিকাশও হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে। সব দেশেই পশ্চিমি ধরনের গণতন্ত্র চালু করার জন্য প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে নানা পন্থা অবলম্বন করে। খোদ রাষ্ট্রপতি থেকেও চাপ আসে। ভিন্ন ভিন্নদেশী শৈল্পিকভাবে অনেক সময় রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক বাধ্যতা বহন করে রাখা হয়। আন্তর্জাতিক বাধ্যতামূলক চাপের (sanction) চাপে পড়ে ভিন্নভিন্নদেশী দেশগুলি বাধ্য হয় নীতিপরিবর্তনে, সে সব দেশে হতে বা গণতান্ত্রিক বাধ্যতা হয় নামে যায়। প্রকৃতপক্ষে জনসাধারণকে এ বাধ্যতা কোনও ভাবে স্পর্শ করতেই পারে না অনেক সময় উপরোক্ত অবস্থা বা পরিণতি হলে ঔপনিবেশিকতার বরকশায় হচ্ছে বলেই মনে হতে পারে। যুধীরা রাষ্ট্রের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্ব এতে বাহ্যত হচ্ছে কিনা প্রচণ্ড ঝগড়া দেখা গেছে যে কোনও কোনও দেশের নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারকেও অস্বাধীন করা হয়েছে ভিত্তিহীন দেশের হস্তক্ষেপের ফলে। এই কারণে যে নির্বাচিত সরকারী দল তাদের দলকে একমতাবলম্বী না। সেই রাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী বা অনারল নানা কৌশলে নির্বাচিত সরকারকে অস্বাধীন করতে পারবে। সাধারণ মানুষের অধিকাংশের এতে

সংযোগ থাকে হয়ত নাম মাত্র। তারা অন্তর হাতের পুতুল। কখনও বা অধিকাংশ লোক নিরপেক্ষ দর্শক বা কোনও ক্ষমতাসীনের শিকার হয়।

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের জন্য কোনও ব্যক্তি বা ছোটদল গুরুত্বপূর্ণ অধিসাধি বা সাংঘর্ষ বা সরকারি কর্মচারীদের অবরোধ করে। এরা জমি (Terrorist) হল বা সুযোগঅসুযোগ। গণতান্ত্রিক সংসদকে এরা বানাল করে দেয়। এ সব ক্ষেত্রেও সাধারণ মানুষের জড়িত থাকে বৃহৎ কয়ে। সিনিয়র শীপও এ ধরনের ঘটনাই ঘটেছে। সুনির্বাচিত শাসন ক্ষমতাসীনেরা তোলা সন্ত্রাসের আতঙ্কও সৃষ্টি করেছে। এ সব নেতা বা জমিদারকে দমন করতে না পারলে গণতন্ত্র একদায়কতন্ত্র হয়ে দাঁড়াতে পারে।

গণতন্ত্রের বর্তমান রূপ দেখে মনে হয় এটা চাকচেল ব্যক্তিদের নির্বাচন হচ্ছে কী করে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার জন্য? আরও দেখা যায় নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে কম সংখ্যক লোক। অর্থাৎ নির্বাচন সংযোগগঠিতককেও হ্রাসের পক্ষা ধরা হয়েছে। ১৯৭২ সালের মার্কিন ভোটপর্বে মাত্র ৫০% এবং ১৯৬৬ সালের ভোটপর্বে মাত্র ৪৭% বিজয়ী রাষ্ট্রপতিকে ভোট দিয়েছিল যুগ্মের মনে আছে। এর অর্থ জনসাধারণের বিরোধিতা অংশ নির্বাচনে নেওয়া দেবনি অথবা বিরুদ্ধ ছিল। ভারতবর্ষে ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে জনসাধারণ প্রায় ৬০% ভাগ নিয়েছিল। এরা কারা? কাদের এরা প্রতিনিধি নির্বাচিত করছে? ভাববার সময় এসেছে।

সাধারণ সব দেশেই চিহ্নকে চোরে অপর্যাপ্ত প্রমাণিত হয়। তাদের পাণ্ডিত্যও। কিন্তু গণতন্ত্রের কর্তব্যের মাপ সীমিত পারাত। নানা অপর্যাপ্তক কাকে ধরা পড়লেও প্রমাণই তাঁরা পাঠি পান না। মুক্তি পান। শতাব্দীর 'ধাকদেল'ও তাঁরা নির্ণেয় প্রমাণিত হন। অতএব বলতে হয় বিচারব্যবস্থা বা Judicial System ও সাধারণ মানুষের মধ্যে বিচ্ছেদ বিচ্ছেদ হয় না। বিতর্কিতদের এবং প্রভাবশালী নেতৃবৃন্দের ব্যাপারে বিচারকরা উদারহস্ত, সাধারণত। অতএব দেখা যাচ্ছে গণতন্ত্রে ক্ষমতায় আসীন স্বসংখ্যক লোকের ম্যোভাওয়া। ব্যবসায়িক যাক কোয়ার্ড উন্মুক্ত খেতে যাকের ক্রিয়াকলাপের, তারা আতঙ্কিত থাকে যথায় দেয়। লক্ষ্য করার বিষয় এই যে সাম্প্রতিককালে তারাও জনসাধারণকে মারছে উৎকোচ লোভের নামাধি প্রচেষ্টা এবং অন্যায় নির্যাতন ও বৈরোচ প্রভৃতির দ্বারা তাদের শিকার হচ্ছে। যারা তা করতে পারছে না অর্থাৎ উৎকোচ নিতে বা দিতে অক্ষম, সোজা ভাষায় তারা গণতন্ত্রের শিকার হচ্ছে, মার খাচ্ছে। তাদের মতামতে বা সুবেদন্যে প্রতীতি কেঁদে নয়। নৈতিকতার মানবোৎ, বাস্তব জীবনের প্রাতিবিম্বকায় গণতন্ত্রের ভাবগুরুত্ব তাই আমাদের মুগ্ধ করতে পারছে না। অতএব বর্তমানে এই গণতন্ত্র স্বল্পকালের তুষ্টি এবং পুষ্টি করবে এবং অন্যান্যকালে স্বাধীনকায় অসমর্থ হবে ভবিষ্যৎ তাকে প্রতিনিধিত্বমূলক আখ্যা দেওয়া অনুচিত। বলা চলে গণতন্ত্র স্বল্প লোকের হৈরুস্ত।

যুগ্ম মূল্যায়ন করে গণতান্ত্রিক সংসদকে পরিবর্তিত করা

প্রয়োজন। আমেরিকায় এদিকে কিছু প্রচেষ্টা দেখা গেছে। সংখ্যা দল্য অতিক্রম আমেরিকানরা প্রতিনিধিদের প্রকৃতপক্ষে বর্ধন দিয়েছে। ভোটারদের অধিকার পেতেই বর্ধন লেগেছে। তারপর আইনের চোখে সমতা প্রেরেছে মাত্র ১৯৬৫ সালে। Civil Rights Bill পাশ হয় এ সময়েই। মেয়েরা ভোট দিবার অধিকার পেলে ১৯২০ সালে প্রায় ৭৫ বছর স্ত্রীরাই পান। সমান অধিকারের দাবিতে Equal Rights Amendment (ERA) আনতে চেয়েছিল। বছরেক স্ত্রীরাই পান পর সেনেট ও কংগ্রেস ERA পাশ করেন ১৯৭২ সালে। কিন্তু ইহু তৃতীয়াল্প সেনেটের অনুমোদন না পাওয়ার দরুন সে আ্যমেন্ডমেন্ট কার্যকরী হল না। নীতিদর্শক এ আন্দোলন ও প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল। তবে বেশ কয়েকটা স্টেটে মেয়েদের সমান অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। Civil Rights Bill-এ কিছু কিছু পরিবর্তনসাধন করে শিক্ষায়, খেলাধুলায় এবং কাজকর্মে মেয়েদের সমান অধিকার দেনে নেওয়া হয়েছে। সংখ্যালঘুদের কংগ্রেসে প্রতিনিধিত্ব দেবার জন্য দু'ভাবে চেষ্টা হয়েছে। প্রথমত বিভিন্ন রাজনৈতিক দল আমাদের দেশের মতোই কিছু সংখ্যালঘু ব্যক্তিকে নেতৃত্বের অধিকার দিয়ে নির্বাচনের মাধ্যমে সেনেটে এবং কংগ্রেসে প্রতিনিধিত্ব দিয়েছে। দ্বিতীয়ত নির্বাচন কেন্দ্রগুলি এমনভাবে বিভক্ত করা হয়েছে যাতে সংখ্যালঘু দলের গঠিতা থাকে কোনও কোনও অঞ্চলে। তবে অঞ্চলটি আমেরিকান, স্প্যানিশ আমেরিকান এবং এশিয়ান আমেরিকানরা কোনও কোনও অঞ্চলে সংখ্যায় অধিক। যুবাবতই সেখানে থেকে সংখ্যালঘু প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে থাকে। ভারতবর্ষে নির্বাচন কেন্দ্রগুলো ভাগ না করলেও কোনও কোনও অঞ্চলে সংখ্যালঘুদের সংখ্যাধিক্য আছে নানা সামাজিক কারণে। অসল প্রশ্ন সকলের প্রতিনিধিত্ব সংসদ, রাজসভা এবং বিধানসভা ইত্যাদিতে পর্যাপ্তভাবে হতে পারে কিনা। সাম্প্রতিক কালে দেশে নানা সংগঠনে নির্বাচনের চরিত্র নানাতারক্য প্রাপ্ত হয়েছে। তা হলেও সংখ্যালঘুদের এবং মেয়েদের প্রতিনিধিত্ব এখনও সময়ে সময়ে শাসনব্যবস্থায় অনুপ্রস্থ। এ দেশে প্রায় ২০০ মিলিয়ন মেয়ে। তাদের মতামত এবং স্বার্থ দেশের আইনকানুন রচনার প্রভাবিত হয় না। দেশের একটি বৃহৎ জনসংখ্যা এখনও প্রতিনিধিদের গতিয় বাইরে।

গণতন্ত্রের এবং প্রতিনিধিদের মোহাই দিয়ে কিছু অস্বাধিকার প্রকৃতি আমাদের দেশে প্রবলরূপে ধারণ করছে। প্রথমত শর্তবদ্ধিত্ব হচ্ছে প্রথম রাজনৈতিক দলগুলি। সাধারণত সাম্প্রতিকর মতামতটিই হল এগুলি বড়ই করে। এ ছাড়াও ব্যক্তির হুমতায় মতো বহু রাজনৈতিক দল বিভিন্ন রাজ্যে নির্বাচনক্ষেত্রে নামছে। প্রায় সম্যগুলিই ব্যক্তিকেন্দ্রিক দল। এই ব্যক্তিকেন্দ্রিক দলগুলির মুখ উদ্দেশ্য সাম্প্রতিক দলের সঙ্গে জোট সৃষ্টি করে

শাসনক্ষমতায় প্রবেশ করা। তার জন্য তারা সংখ্যালঘুদের উৎকোচদানে বা ক্ষমতার সোত দেখিয়ে দল টানার চেষ্টা করে। মেয়েদের সম্বন্ধে দল নেই। অতএব ক্ষমতার গতিতে তাদের ছাড়া বিশেষ পড়ে না। তারা ক্ষমতায় অসম্পূর্ণ। দ্বিতীয় প্রবণতা হলুচ্ছ। ক্ষমতায় এলে সাধারণ লোকের স্বার্থকে প্রকাশ দেবে বলে এরা প্রতিজ্ঞা দেয় ভুক্তিহীন। হোটটি বিভিন্ন রাজ্যকে নিজ দলভুক্ত করার প্রাণান্ত প্রচেষ্টা চলে। তারা জন্য প্রমেগণে সর্বত্র সাম্প্রতিকতার প্রচার, বুনবাশনি, দুষ্টরাজ্য ধর চালানো এবং বণ্ডুচ্ছ ইত্যাদি প্রায় জমি কার্যকলাপের সমগ্রক্ষেত্র এনে পড়েছে। আতঙ্কের ব্যাপার শাসনব্যবস্থা এ সব মননে অধিকৃত অনীহা স্পর্শন করে, অন্যদিকে কোনও কোনও দলের সহায়ক বলে অভিহিত হয়। আবার দেশে আইনকানুন রক্ষা হচ্ছে না বলে বারো অভিযোগ আসে তারা নিজেদেরই নানা প্রকারে আইনভুক্ত করে, বিশ্বাস্যতা ও সন্ত্রাস সৃষ্টি করে শাসনব্যবস্থার আইন শৃঙ্খলা রক্ষার অক্ষমতা প্রমাণে চেষ্টা হয়।

আর একটি প্রবণতা তোলা আদায় এবং এর জন্য সন্ত্রাস সৃষ্টি। এতে ইটালির সিনিগলি প্রদেশের কৃষ্যত মাফিয়াকে এরা হার মানায়। প্রায় সব রাজনৈতিক দলের বা দলপুষ্টি অনেক নেতা এ ব্যাপারে দেখী। কেউ বা প্রকাশ্যে কেউ বা গোপনে। আরও দেখা যাচ্ছে দাণি খুনি বা অপর্যাপ্ত নির্বাচন প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার পাচ্ছে। যেন যার যত মার্যক্ষমতা এবং অর্থক্ষমতা তারা নানা কৌশল প্রয়োগ করে শাসনব্যবস্থা কৃষ্ণকৃত করার প্রচেষ্টা লেগে গেছে। এই প্রবণতায় ভিন্ন ভিন্ন দেশের সন্ত্রাস রাজনৈতিক পরিহিতিকে বিপজ্জনক ভাবে আতঙ্কিত করেছে। দেশের বিরোধিতা অংশ যখন শিকারীনা এবং দরিদ্র ভোগেতিয় পুষ্টি কার্যকরী তারা তাদের বিপ্লবে বা প্রয়োজিত করা কিছু মাত্র অনুবিষয়জনক নয়। সেখানে রাজস্থানের শূণ্য অবস্থা, গুজরাটে বা উড়িষ্যতে সংখ্যালঘুদের অক্রমণ, পশ্চিমবঙ্গে অহরহ বধ বা প্রাক্কলন বণ্ডুচ্ছ ইত্যাদিতে কিন্তু হওয়া কিউই অস্বাভাবিক নয়। এগুলো কি গণতন্ত্রের প্রয়োজনীয় অঙ্গ বা সংঘাত?

প্রশ্ন হল, তা হলে গণতন্ত্র কি গণদ্বিত্ব হতে অক্ষম? গণতন্ত্র কি গণস্বার্থপরকায় অসমর্থ? গণতন্ত্রের জন্য কি একটা শিকা এবং মানতবোধের দ্বারা বিকল প্রয়োজন? সমস্যাসূচির সমাধান কী? সমাধানের চিন্তা তখনই হতে পারে যখন দেশের শিকার সমাজ সমস্যা সঠিক অধিহিত হয়। তারই জন্য এ আলোচনা। গণতন্ত্র মানুষের হান কোথায়? ভুক্তিকা কী? সমাজ মনুষ্যভাব্য বিকাশ করার প্রয়োজন আছে কি? আমাদের শিকার অঙ্গ কোন পথে? গণতন্ত্রের সমস্যাসূচি পার হতে হলে ভারতীয় ঐতিহ্য, গাভীবাণ বা সুইডেনের ডেমোক্রসি সোশ্যালিজমে বা 'ওয়েলফেয়ার স্টেট' কোনও জ্ঞান পাওয়া যাবে কি?

উপমহাদেশের এক গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা 'বিটা'

সূরজিৎ দাশগুপ্ত

বিগত ১০ ও ১১ জুন কলকাতার গোর্কসদর্শনে বাংলা দেশের বিটা এবং পাকিস্তানের আজোলা নামক দুটি নাট্যসংস্থা মিলিতভাবে 'দুখিনী' নামে একটি নাটক মঞ্চস্থ করে। নাম শুনলেই বোঝা যায়, এটি নারী নির্যাতন সংক্রান্ত একটি নাটক। কিন্তু দেখলে বোঝা যায় নাটকটির বিশুল বিস্তার ও দামন গভীরতা। এতে তিনটি ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে—ইংরেজি, বাংলা, উর্দু—তাই এতকাল চালা যায ত্রিভাষী নাটক। নারীদের ঘটনাবলি বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তান অর্থাৎ একটা গোটা উপমহাদেশে রাষ্ট্রসংক্রমণের এক হিসাব থেকে জানা যায় যে শুল্ক পরিচালিতই আছে প্রায় দু'শক বৎসরই নারীরা বাংলাদেশি নারী।

নারটকের প্রথম দৃশ্য দেখা যায় কয়েকটি নারীর ছায়া সার বেঁচে ছেঁড়া লতার মতো মোড়ানো মোড়ানো মঞ্চের এদিক থেকে ওঠে, আরও ওঁকি পেতে এদিক যাবে আর তাদের ডাঙিয়ে নিয়ে যাচ্ছে একটা লম্বা ওড়কা ছায়ামূর্তি বাঘের মতো পা ফেলে ফেলে। সেদৃশ্য শোনা যায় ভাটিয়াগি। গার পেরে দৃশ্য মঞ্চের এদিককে একজন বাংলাদেশি অফিসার নামদিকে পাকিস্তানি অফিসার টেলিফোনে ইংরেজিতে কথা বলছে এক মুতা বাংলাদেশি নারীর মুহুরে নিয়ে কী করা হবে। অফিসার দু'জনের মধ্যে আলোচনা বিবরণ হল ওই দু'জনের যার সে আসলে কোন দেশের মানুষ তার নিশ্চিত প্রমাণ নিয়ে। কৃত্রিয় দৃশ্য এক গোয়ারন, সেখানে বর্ষা-বনক আর এক ভাঙখার ফকির উর্গেত বলালিক দেখছে যে পাশের ওই গোরে দু'শকি কে বা কারা রোজ ফুল রেখে ধূপ ফেলে যায়!

অপ্রে অপ্রে আমরা জানতে পারি যে ওই কবর এক বাংলাদেশি নারীর, যে রাস্তার মেড়ে গায়ে আগুন ফেলে আয়ত্বতা করেছিল, যার নাম দুখিনী। নারী বাসকার পুরুষতান্ত্রিক রাসনিত্য তিরিক-এই ছিল হতভাগিনী হওয়া সত্ত্বেও তার সার্বভৌম প্রতিবাদ বা বিদ্রোহ। কখনও দাউতের সুযোগে কেনা, কখনও ফাঁকতলে চুরি করা আবার কখনও বা সুখী জীবনের শোষণের দৈনন্দিন জোড়গাধা কালিকা ও নারীদের বাংলাদেশে থেকে ভারতেরে তেঁতর দাউতে পাজার করা হয় পাকিস্তানে। এই পাচারি কারাবার তিন দেশেরই অফিসার-স্বত্তর ও মূল্য। আর কারাবারি, গুণ্ডা, অপরাধীরা তো আছেই। দুখিনীর কবর হয়ে ওঠে

করাঙ্কিত নিগূহিতা, লুপ্তিতা ও পথা-পশু-তুল্য বাংলাদেশি নারীদের শক্তি ও সপ্রাণের উৎস। হুমায় মানে পাকিস্তানি এক স্ট্রোচ রমণী হন তাদের প্রেরণা। কিন্তু সমাজবাবল্য, ধর্ম ও রাষ্ট্র এবং স্বত্বপারি পুরুষতন্ত্র আরও দানবিক শক্তির অধিকার।

মর্মগতিক কাহিনী বলেই দুখিনী দেখার অভিজ্ঞতাও দর্শকের মনে জাগায় এক জাতীয় অনায়েদের প্রতিকার সাধনের জন্য তীব্র চেতনা। নাটকটি লিখেছেন লম্বাহরের আজোলা নাট্যগোষ্ঠীর লেখক শহিদ নাসিম, পরিচালনা করেছেন ঢাকার নাগরিক নাট্যগোষ্ঠীর সারা বাকের, অভিনয় করেছেন স্ট্রোচর ভূমিকায় হুমায়নামা জোরা বেগালের বোন উজ্জ্বা হাবি, কবর থেকে জেগে-ওঠা দুখিনীর ভূমিকায় মৃণ্মিতা, অন্যান্য বাংলাদেশি নারীর ভূমিকায় রহিমা, জরুখী প্রমুখ, কবর বননকারীর ভূমিকায় সম্রাণা ভূমিকায়, এবং অন্যান্য ভূমিকায় আবাবের বেগো, টিপু সুলতান প্রকৃতি। নাটকটি রচনা ও সম্ভাষণের প্রতি পদে উপদেষ্টা ছিলেন পাকিস্তানের মলিহা সৌহের এবং বাংলাদেশের শিশির দত্ত। ওই দু'জনের মধ্যে কী ধরনের সমন্বয় ও সহযোগিতা এমন একটি চিত্রা জাগরণকারী সফল নাটক উপস্থাপন করা যায় তা কল্পনাসাধ্য। কলকাতায় এই নাটকটি নিবেদন করেছেন থিয়েটার গ্যাটারের শোনা নাট্যগোষ্ঠী। এমন একটি নাটকে যে দেশের প্রেমভরা কবির জন্য আমি নিজেদের ভাগ্যবান মনে করি। এক আশ্চর্য যোগ্যতাবোধের ফলেই আমার এই সৌভাগ্য লাভ।

গত বছর জুন মাসে যখন বার্লিনের হুম্বোল্ডট বিশ্ববিদ্যালয়ের আবহানে 'মৌলবাদ ও সহিংসতা' বিষয়ক আলোচনা-চক্র বেগা দেওয়ার জন্য বার্লিনে যাই তখন বার্লিন-বাসিনী সুসীল দাশগুপ্ত মহাশয়ের সঙ্গে পরিচয় হয়। আমার কথা ভিকিউমেটারি বিশ্বনা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রসংসদেও দেখানো হয়েছে, জাতীয় পুরস্কারও পেয়েছে। এই কথা শুনে তিনি বাংলাদেশের থিয়েটার আটপের প্রচেষ্টায় 'বিটা'-র নিবেদিত সম্ভাষণ শিশির হতের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। 'বিটা'-র আর্থিক শক্তিসামর্থ্যের প্রধান উৎস বার্লিনস্থিত হাইলিগার বোয়াল ফাউন্ডেশন। বাংলাদেশি 'বিটা' কেন্দ্র ধরনের কাজ করছে এবং সে সব কর্মসূচির প্রায়শঃ 'বিটা' কেন্দ্রের এগিয়েছে তার উপরে ভিকিউমেটারি থিয়েটার উপদেষ্টাগণ গত মার্চ মাসে আমি গিয়ে হাজির ছি। 'বিটা'-র কর্মসূচি ট্রায়েপে।

✧ 'বিটা'

'বিটা'-র কর্মসূচি হল উপমহাদেশের তৃণমূল মানুষের মধ্যে যে সব চিহ্ন বা মন সংক্রান্ত বা মানসিকস্তরের যে সব চেতনা শিফার অস্তাব আছে সে সব দূর করার জন্য নাট্যশিল্পকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা। কিন্তু যেহেতু বিটা-র কর্মক্ষমতা ও আর্থিকক্ষমতা দুটোই খুবই নগণ্য, খুবই সীমাবদ্ধ তাই সমগ্র উপমহাদেশ সত্ত্বে থাকে, সমগ্র বাংলাদেশেও তাদের কার্যক্রম প্রসারিত করা সম্ভব হয়নি, সীমিত সামর্থ্যে তারা কর্মসূচির ব্যাপারের ক্ষেত্রে চট্টগ্রাম জেলাতেই ফোকাস রেখেছেন। শিল্প, ব্যক্তিহীনতা ও জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত ছোট ছোটদের ও মেয়েদের মধ্যে চেতনা জাগানো এবং মেয়েদেরকে রাষ্ট্র ও ধর্মসূত্র কী কী অধিকার দিয়েছে তার জ্ঞান জাগানোর জন্য গ্রামে গ্রামে আইনিবৈধক করা আর নারিসমগ্র ও নারী-বন্ধনার প্রপ্নে মামলা দায়ের হলে সেই মামলার ওকালতি পরামর্শ দেওয়া বিটার সাধারণ কর্মসূচি।

কীভাবে 'বিটা' কাজ করে? বিটা-র কর্মীরা প্রতিষ্ঠিত গুলের মানুষদের মধ্যে গিয়ে খোঁজ করে কার কার মধ্যে অভিজ্ঞতার কর্মতা আছে, কার কার গানবাঝনার দিকে ঝোঁক আছে, কার কার গান লেখার বা ন্যাক লেখার শখ আছে। এই সব কর্মসামান্য হলেময়ের ও তরুণতরুণীদেরকে ভেদে নিয়ে আর সবটা-র কর্মশালায়, তারপর তাদের স্বভাবজাত প্রবণতাবলিকে প্রশিক্ষণ দেয় সাধারণের সামনে প্রকাশেরযোগ্য রূপ উপস্থাপনের জন্য। সাধারণের সামনে প্রকাশ করা মানে কিন্তু শহরের মনবিশ্ব বা উজ্জ্বিতের সামনে প্রকাশ করা নয়, তার মানে শহরের বস্তি অঞ্চলে, গ্রামের কারও বাড়িতে বা পাশের কোনও ঘাটে বিটার শিল্পীরা নারীদের বা গানবাঝনার অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। বিটার জন্য স্টেজ বাঁধা বা মঞ্চের ঘের বোঝাবার জন্য দড়ি ডাঙাবার কোনও দাব্যের নেই। কোনো আকারের নিচে একই মাত্রার উপরে কোনও বর্ণনার নেই।

কী ধরনের নাটক এঁরা করেন? দুটো-একটা নমুনা দিই। 'বায়েচাচু' হল এঁদের একটা অনুষ্ঠান হয় যার ছোট ছোট 'বায়েচাচু' শব্দের নাম দিয়া যায় নিয়ে। গ্রামের কতি মেয়ে বসে বসে এঁরা কী ধরনের অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয় তার কতকগুলি দৃষ্টান্ত। একটা অভিজ্ঞতা হচ্ছে এইরকম : এক পরিবারের পুঙ্খ বিদেশে গেছে কাছে, সেই পুঙ্খ একটা ভিটি পাটিয়েমছে ঘরের বউ ও মেয়ের কাছে, তারা লেখাশুড়া জানে না, তাই ভিটি পড়ার জন্য অন্যান্য বাড়ির মেয়ে পাশের বাড়ির ছেলেকে ভেদে এগেছে, এবারের কই ছেলোটি ভিটি পড়ে শোনাল সে তাকে উদ্ভেদে যাবী বিশেষ অসুখে পড়েছে, কী যেন পাশের বাড়ির ছেলোটিকে মানে প্রজ্ঞাপ্রকার এক হাজার টাকা দিয়া তার কাছে মানে মালদেখের কাছে পাঠায়। কী টাকা দিয়া ছেলোটিকে হাজার কাকে পাঠাবার পর স্বামী এসে হাজির হয় এবং কী ভাবে পাশের বাড়ির ছেলে তার ক্রীকে ঠিকিয়ে টাকা নিয়ে গেছে তার বৃত্তার গোনে। তখন তারা

তাদের মেয়েটিকে লেখাশুড়া শোনানো কত জরুরি তা দুখ্যকম করে। আর একটি নাটকীয় দেখানো হয় কীভাবে হিঠেরী সেজে মেয়েদের ফুলদিয়ে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দেওয়া হয় নারী-পাচারকারীদের কাছে।

নারটকের অনুষ্ঠান শেষ হওয়া মাত্র অভিনেতা-অভিনেত্রীরা দুটো এসে কাঁপিয়ে পড়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়া দর্শকদের উপরে। নাটক শেষ হলে বাড়ি চলে গেলে চলবে না। বলে যেতে হবে নাটকটি সফলক মমানত। যা দেশেরনা তা সত্যি কি না, নাটকের কেন্দ্রে ভুলকল আছে কি না, নাটকটি পুরের বার করার আগে কিছু অবলবল করা দরকার আছে কি না—এই সব প্রশ্ন নিয়ে অভিনেতা অভিনেত্রীরা নিজেদের নাটকের বারের বারো যাই করে দর্শকের চোখ ও মন দিয়ে। গ্রামাঞ্চলের জন্য রয়েছে 'সিকানা', 'ভাঙন' প্রভৃতি নাট্যকামালা। সব নাট্যকামালাই একটি-দুটি নাট্যা থাকে বিশেষভাবে নারীদের অবস্থা-সংস্কার।

বিটার প্রধান কেন্দ্রে চট্টগ্রাম শহরই, কিন্তু ধর থেকে কুর গ্রামাঞ্চলেও তার দুটি কেন্দ্র আছে। এই দুটি কেন্দ্রের মধ্যে দূরত্ব কেনে রাষ্ট্রনির্ভরত দেশপালার জন্য তরুণ দক্ষ, তরুণ বৃত্তাণ্য। কেন্দ্রের অধীনে কেলিমাতে নিজস্ব বিদ্যালয় রয়েছে। কেলিমাতে বিদ্যালয়টি এমন দুর্গম স্থানে অবস্থিত যেখানে সাইকেল রিকশ পথত যেতে পারে না কিন্তু শিক্ষাকর্মীরা অত্মনিরক ও বৈজ্ঞানিক। অক্ষরজ্ঞান দেওয়ার জন্য কটা ছোট্ট কামানো বর্ণ ব্যবহার করা হয়—এই পদ্ধতিতে অ অ আ ক বর্ণগুলি পরপর মুখের মতো না শিখিয়ে এক একটা বর্ণকে বর্ণের অনুক্রম ভেঙে দেখানো হয়, আরও গর্ব নেনা, পরে অনুক্রম জানা।

চট্টগ্রাম শহরের বস্তি অঞ্চলে একটা মূল্যের শিক্ষাপ্রকৃতিও অভিনয়। পড়ানো হয়ে বাৎসরক শুল্ক। দুখিনীর অভিনয় কেন্দ্র মৃণ্মিতা, সেই মৃণ্মিতা আর সোরাব নামে এক তরুণ এই দু'জনে দুটি আলোজ্ঞার মতো জামা পরে রাসে নাচতে নাচতে চোকে। মৃণ্মিতা ও সোরাব লগা করে পর ছুঁড়ে দেন ছাত্রছাত্রীর উপদেষ্টা, ছাত্রছাত্রীদের ইচ্ছিত ভূগিয়ে দেন কী উত্তরের কান, উৎসাহিত করেন যাতে ছাত্রছাত্রীরা ষষ্ঠগুলির বৈশিষ্ট্য নিজেদের মতো করে বলে। উত্তর পেলে সেই উত্তর নিয়ে শিক্ষিকা বা শিক্ষক নাম-গান ছুঁড়ে দেন। যেমন আর কিছুনি পরে সূর্যের তেজ আর বাক্কে, খুব তেঁটা পাঁবে, পাখা দিয়ে মানুষ বাতাস ধাবে, তখন কোন কাল হবে? উত্তর হল, গরম কান। গরম কানদের প্রথম মামা কী? কেউ উত্তর দিতে না পারলে মৃণ্মিতা মনে নেচে গান শুরু করবেন, 'এসো হে বৈশাখ, এস এস'। নাচগান সারা করে আরার প্রপ্নে, শৈশব শৈশব প্রথম দিনালিক কী বলে? এভাবেই সূর্যে উত্তর নেনা গানে দানোয় হাঙ্গিতে বালায় হয় স্বকৃত, ষষ্ঠগুলির সঙ্গে জড়িত আকাশ বাতাস, মেঘ মাটি, মূল পাখি, মানুষের ধান-কেনা ধান-কাটা ইত্যাদি সংরুদ্ধ শিক্ষা দেওয়া হয়।

যে সব ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা দেওয়া হয় তারা কিছু বিদ্যার্থী বলতে যা বোঝায় তা নয়, অধ্যয়ন তাদের তপস্যা নয়, তারা সত্যি সত্যি রোজগারের শিশু বা working children, শিশু সব থেকেই তারা রোজগার করে নিজ নিজ সংসারকে সাহায্য করে। কিন্তু অল্প অল্প তারা রোজগারের ফাঁকে দু'ঘন্টা করে লেখাপড়া শেষে বানিকটাক্ষ তা হলে তারা বড় হলে দক্ষ শ্রমিক পরিণত হতে পারবে আর তাদের ছেলেমেয়েরা বিদ্যার্থী থেকে শিক্ত সমাজভুক্ত হবে বলে আশা করা যায়।

‘বিটা’র কল্পসৃষ্টির একটা অঙ্গ হল লোকশিল্পের সংরক্ষণ এবং লোকশিল্পীদের উৎসাহদান। এ জন্য বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায় ধরে সেই সম্প্রদায়ের গায়ক ও বাদকের সমুদয় পুস্তিকা প্রকাশের পরিকল্পনা আছে। ইতিমধ্যেই ছেলে সম্প্রদায়ের পুস্তিকার নিয়ে তাঁরা পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন—সেই পুস্তিকার কাগজ ছাপা বাঁধাই সমুদয় উঁচু মানের। এই পুস্তিকার উদ্দিষ্ট ক্রেতা ছেলে সম্প্রদায় নয়, দেশবিশেষের ফোকলোর folklore বিষয়ক গবেষক ও ছাত্রছাত্রী।

আবার এই জাতীয় তৃণমূল সমাজের জন্য কাজের পাশাপাশি শিখিত সমাজের জন্যও 'বিদ্যি'-র বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান আছে। শিবকন কলকাতা থেকে বিশ্বাত্ন নাট্যবিশ্ব ও অভিনেতা কুমার রায়কে নিয়ে গিরিঘোষনে তাঁরা রবীন্দ্রনাথের নাটককর্তা ভাবনা ও গঠন স্বত্বক্ আলোচনা-চর্চের প্রধান বক্তা হন। আমরক ও আমিত ভাষণ দিতে ছাড়া জ্ঞানেন কবি গোয়টের দরবজাত নিয়ে আবার ভাষণের পরে কিছুক্ষণ ধরে চলল প্রস্রাভের পলা। সম্ভবতঃ আমরক জিয়া হায়দার বঙ্গলেন গোয়টের নাট্যপ্রতিজ্ঞা নিয়ে। এই ধরনের অনুষ্ঠান ছাড়াও 'বিদ্যি' আমরক পুর্বিধার পক্ষে

[illegible]

আবার 'মুন্সি'র সংস্কার ফিরে আসি। বাঁচনা হচ্ছে যে নীলশাওয়ার করবাবরা উৎসে প্রমত্ত বাংলাদেশ ও অখ্যাত নেপাল থেকে। কেনে এই দুই দেশ থেকে নীলী পাচার করা হয় পলিষ্টানে ও উপসাগরীয় দেশগুলির উদ্দেশ্যে? মুন্সিই দিল্লি মুহাইয়ে ও চতুর মাফিয়া নীলী মুন্সির অধীন যাপন করে। প্রত্যেক গতি পূর্ব থেকে পশ্চিম। এই কি কোনও বিদেশ সামরিকভাবে কখন আছে? এই বাস্তবতার সৃষ্টি হল কীরূপ 'মুন্সি' নাটকটি উপমহাদেশের নীল অর্থায়ন সম্পর্কিত বাস্তবতার উপলব্ধিভবন একুশির 'মোহিত'ে যাত্রা। এই নাটক অগ্রে নায়েব, কাঠকাঠ, দিল্লি, ভটগাঁও প্রভৃতি শহরে অনুষ্ঠিত হয়েছে গ্রীষ্মকাল পর্যায়সহ কলকাতা যে নাটক পূর্ব বিনোদন মন, ডা. লোকেশবাবু ও বাবু। 'নীলী' সেরিক থেকে জন্ম। এবং একই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে বিবৃত কর্মকাণ্ডের জন্য বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব থিয়েটার আর্টস টাউন 'নীলী'র সন্নিধি উপস্থিতি এই উপমহাদেশের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

প্রদ্বন্দ্বমালোচনা

রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি সত্তা

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

কবি অজীৱনী কবিতা আত্মবিকাশৰে ধাৰাভাষ্য। সেই
ভাষ্যে প্ৰাণনাশ কৰিছে হৰি কণ্ঠ পুত্ৰ হৰণ। নিমি এ
হৰণৰেই উল্লেখন কৰেত চান চিৱ সান্থৰ্ণ প্ৰমাণিত হয় এই কবিতা
তথ্যৰে উপৰ অধিকাৰে এৰা কবিতাখনে সেইখন ঘটনা-অভ্যৰ্থ
বিশিষ্ট প্ৰতিভাখনে স্বকণ্ঠ দিগ্ৰহ। এমনিহেই এৰা কবিতা
ৰবীন্দ্ৰনাথ বা গায়ত্ৰীয়ে মৰ্যদা বহুধা বিস্তৃত, গভীৰ অৰ্থ জটিল
গতিহেতুৰে ক্ষেত্ৰে এই কবিতা কৰুৱাৰে। তী কামিনী উভাচাৰ্যে
‘কবিনামনী’ ৰনামা সেই কুতূহলন্ত্ৰিতৰে যোগ্যভাৱে উদ্ভাৱন
কৰি উভাচাৰ্যেৰে এই বই আমাৰ অনেক নিমি আৰণ শড়া-
অনেকৰা। প্ৰতীৰ ৰবীন্দ্ৰজিগ্মস্ম থেকে নৰীনন্ত ৰবীন্দ্ৰবীৰ্য্য
পৰিক পৰ্ণিত সন্মুখহে এই বই স্পৰ্শ কৰেহে, দু’বাৰ কৰে
ভাৱিহেহে। আজ এই বই আমাৰ কবিতা ‘নতুন পড়া’, গুৱণনা মতন
ন-একটি বৰিহাৰে প্ৰথম প্ৰথম বইৰে পুৰ্জিহামা। প্ৰথম
আমৰ মুখ হৰাৰ বসন। সেইনি মুখ হৰাইহামা বিয়মমায়ুৰে
এখন বসন হৰাইহে। এখন আৰ মুখ হৰি ন-জেনেৰে নতুন
বৈশেষ্য মুখা মুখতন নামাৰণ। এখন বৈদ্যনি নামা প্ৰশ্ন জাৰণ।
এখন বৃষ্টি মাহেদ্বীয়া বইহেতুৰ থেকে প্ৰশ্ন জাগনিয়া বই অনেক
পুৰুষপুত্ৰ। আমাৰ পাঠেৰে সন্ত্ৰ সামগ্ৰ্যৰে এই পুৰুষপুত্ৰ
মোকাবিলা কৰেত কবিনামনীৰ পুণঃপৰ্ণন সম্মা হৰাইহে।

প্ৰথম প্ৰশ্ন ‘কবিনামনী’ কোন? কোনও প্ৰশ্নাৱকত গৌণ কৰণ
মতে যে স্পৰ্শিত অনিয়ন থাকে তা ৰখনি। কিন্তু এটা বই
আমৰে প্ৰশ্ন প্ৰয়োগজাৰণ-যে বইটা ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে কবিতা
জীৱনী নয়, দেবস্বপ্নাথ ঠাকুৰে প্ৰশ্নৰ জীৱনী ন-যে বইটি
হৰে কবিতাখনী। কবিতাখনী সন্ত্ৰৰে ৰবীন্দ্ৰনাথৰে নিৰ্বেৰে ধাৰণা
প্ৰতিভাৰে প্ৰশ্নৰে সন্ত্ৰৰেই জানা তথাপি ৰবীন্দ্ৰনাথৰে কথাগুণি
উভাচাৰ্যেৰে বইটি প্ৰশ্নৰে আকোৰন কৰাৰা কৰেত সেম নেই।

‘কবিজীবনী’ নামের পুস্তকটির শেষ অনুচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন- ‘ঢেন্নেইনগের কাব্যতা জীবনচিত্রিত একটি লেখা বাস্তব-পটের-বাস্তব জীবনের পক্ষে তাহা অসম্ভব, কিছু কবিজীবনের পক্ষে তাহা সম্ভব। কল্পনা সাহায্য করিতে তাহাকে সত্য করা যাইতে পারে না। তাহাতে লেডি শ্যাটল ও রাজা আর্থারের কাহলের সহিত ডিস্ট্রিয়ারের কাহলের অন্তর রকম নিমিত্ত থাকিবে; তাহাতে মার্লিনের জাদু এবং বিজ্ঞানের আবিষ্কার একত্র হইবে। বর্তমান যুগ বিমাতার জন্য বালকবালিকা উৎসাহকে কল্পনাগো

নিৰ্বাচিত কৰিয়া দিয়াছিল—সেবানে প্ৰাচীন কালৰ ভদ্ৰ দুৰ্গম
যাৰ একাকী বাস কৰিয়া কেমন কৰিয়া আৰম্ভনৰে শ্ৰীদীপী
পাহাৰীলৈ, কেমন কৰিয়া ৰাজ্যনাগৰ সহিত উদ্ধায় কৰিয়া
হৈল, কেমন কৰিয়া প্ৰাচীনকালৰ ধনসম্পদ বহু কৰিয়া বৰ্তমান
কালৰ বহু ৰাজ্যসেহ বাহিৰ হৈলন, সেই সুদীৰ্ঘ আত্মাৰীকা
কোষ হন নাই। গমি হৈছে তথ্য একজনৰে সতিহ আৰু একজনৰ
লোভাৰ একা থাকিত না, টেনিসনেৰে জীবন জিত কৰিয়া কাল
ও জিতা লোকেদু মনুষ্য নুভন নুভন কৰা ধাৰণ কৰিয়া। প্ৰক্ৰমে
প্ৰভাতভুৱাৰে অৰ্থ মাননীয় প্ৰশান্তভুৱাৰে স্বীক্ৰীজীৱী অন্য
সকল সৰু আয়েদে সৰু সৰু আকৃষ্ট হিচাবে ৰক্ষণী এক
বাবৰণ, কিন্তু দু মিনি প্ৰতি আৰম্ভত পৰল হৰ প্ৰকাৰ পুৰক
না। একটা প্ৰভাৱ পৰ আৰু একটা আয়েদে পৰে স্ব
অধিকতৰ আৰণ আশা। প্ৰম দুটিৰ অভিপ্ৰায়ে শাৰ্ভে হু
একটা ৰেয়েমে নহে। কিন্তু ৰীজীমাৰ্থ যখন বহন পাত্ৰে কৰা
দান্তৰে জীবন জড়িত হইয়া আছে, উভয়ক একত্ৰ পাঠ কৰিলে
জীবন ও কাৰণৰ মাধ্যম বেশি জৰুৰ দেখা নাই—তখন আনক
কৰিবিকাক অনামায়াৰ অভুৰ ৰহতে গৰি, অন্য আলোক
সেখেত না। ৰিচিৱীৰী অন্য প্ৰয়োজনী, তাৰই উভিক
কৰিবিকীৰী পৰিৱৰ্তন। ৰিচিৱীৰীৰী কী ভাৱতেন ভাৱ জীবনমৰ্থা—
জীবনমৰ্থিতেন তাৰ পৰিৱৰ্তন আছে। শেষ সন্তক কাৰণসেহ শিচি
মৰাণাৰ্থ কৰিতাত গৰিৱ ৰিৱৰ হাবিৱৰ সৰে নানা ৰীজীমাৰে
বলাণা গৰিৱ হুয়েছে, সে মালো সেবে পৰ্শৰ একমৰ্থই মালো।

‘শেষ সপ্তক’-এর তেতাঙ্গিণি-সংখ্যক কবিতাটি অমিয় চন্দ্রসীতকে লেখা চিঠি। ‘সঙ্কয়িতা’-য় এই কবিতা-পত্রটি ‘পশ্চিম বৈশাখ’ নামে স্থাপিত। কবিতাটি এখানে আমাদের আলোচ্য নয়। আলোচ্য কবির নিজের কাছে প্রতিফলিত কবিত্ববীজ। তরুণ শ্যামবর বাউল আপন একতারাতে সুর বেঁধে নিয়ে অনির্দেশ্য মেন্দনার খ্যাঙ্গা সুরে জেকে বেড়িয়েছে নিরুদ্দেশ মনের মানুষকে:

সেই খুনে কোনো-কোনোদিন বা
বৈকুণ্ঠলক্ষ্মীর আসন টলেছিল,
তিনি পাঠিয়ে দিয়েছেন
ভাঁর কোনো কোনো দৃতীকে
পলাশবনের রক্তমাতাল ছায়াপথে

কাজতোলানা সকল-বিকালে।

আমাদের কাছে 'দুই' শব্দটি গভীরার্থের অতল রহস্যকে ধারণে দেন। শব্দটির সঙ্গে আগেও আমাদের দেখা হয়েছে:

তুমি যে আশঙ্কাজ্ঞে প্রবাসী আলোক, হে কল্যাণী,
দেবতার দুই।

মর্তের গৃহের প্রান্তে বসিয়া এনেছে তব বাণী
হৃদয়ের অকৃত্রিম।

ভক্তুর মাটির তলেও গুপ্ত আছে যে অন্তবাহির
মৃত্যুর আকাশে,

দেবতার হয়ে হেথা তুমি সন্ধান তুমি নারী,
দুই বাহু বাড়েবা।

এই 'দুই' বা 'দুই'র কবিত্ববোধ ভূমিকা কী সেটাই প্রশ্ন। ইনিই কবিত্বের সন্ধানের অধিগত কল্পনাকেন্দ্র অর্থাৎ দুটিয়ে দেন। ইনি কী বিশেষ কোনও মর্মমানসী—নাম রূপে হয়ে তাঁর নানা অভিব্যক্তি? নাকি, ইনি কবির অভিজ্ঞতায় নির্মিত স্মৃতি সন্ধারবিনী—সেই স্বপ্ন মানসী? তাঁরই আত্মবোধে যার যার কবির আত্মসম্মতির জগদ্বাস ঘটছে। তিনি কবিত্ববোধে গান জগানিয়া, দুঃ জগানিয়া। 'বাগ্মনে আর স্বপ্নে বিশেষ কবিত্বমানেই এর জন্ম'। এর জন্মপ্রক্রিয়া আমাদের কাছে যত আশ্চর্যীয়, এর প্রভাব প্রতিক্রিয়া তার থেকে বেশি গণনীয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'কবিমানসী'র শব্দে কবির তার উল্লেখ করেছেন। আমাদের মনে হল 'যাত্রী' পদ্যাবলী থেকে প্রসঙ্গটি বিস্তারিত করা প্রয়োজন—'যাত্রাজিহে দায়েন্তে কল্পনাকে যেখানে তরঙ্গিত করে তুলেছে সেখানে বস্তুত একটা অসীম বিরহ। দায়েন্তে ফল আসনার পুণ্ড্রকে গ্রেহেবিল বিচ্ছেদের দূর আকাশে। চণ্ডীদাসের সঙ্গে রজনীকান্ত, রামীর হেয়তা বাইরের বিচ্ছেদ ছিল না, কিন্তু কবি যেখানে তাকে ভেঙে বলছে,

তুমি কেবলমানসী হরের রজনী
তুমি সে মননের তারা—বসন্তের সন্ধ্যা

সেখানে রজনীকান্ত রমী কোন দূর হলে গেছে তার সিকি নেই। যেকোন সে মননের তারা, তবুও যে নারী কেবলমানসী, হরের রজনী সে আছে বিরহজ্বলিত। সেখানে তার সন্ধ্যা আছে, তার ভাব আছে। নারীর প্রেমে মিলনের গান বাজে, পুরুষের প্রেমে বিচ্ছেদের বেননা। (প্রকাশনার জাহাজ ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯২৪)। এখানে ব্যাক্তিগত বা রাসী নামরূপমাত্র। আসল কথাটি কিন্তু সে-র সুবিধাতা পক্ষীয়গণ থেকে বলা যায়—'প্রেমের তৃপ্তি অর্জিত এই দুই দীপা। চির অধির উদাত এক শক্তি। যেমন জেনেছে চণ্ডীসহ এই মনো'।

আমাদের আলোচ্য প্রস্তাব ২১ পৃষ্ঠায় শ্রীচৈতন্যের বলছেন—

'যে-আমি স্থপন-মুরতি গোপনচারী

যে-আমি আমারে স্মৃতিতে কৃপাতে নারি,
আপন গানের কাছেতে আপন হারি,

সেই আমি কবি, কে পারে আমারে ধরিতে

এই 'স্থপনমুরতি গোপনচারী' শব্দকে তাঁর বাণীপ্রকাশের মধ্যে আবিষ্কার করাই কবি জীবনীকারের মুখ্যকৃতা। শ্রীচৈতন্যের ওখানেই আরও বলেছেন 'কবির যে-জীবন কাব্যকে প্রকাশ করে সেই জীবন কথাই যথার্থ কবিত্ববোধী। আর কবির কাব্য সেই কবি জীবনীকে রচনা করে চলে। সুতরাং কবির 'যে আমি স্থপন-মুরতি গোপনচারী' সেই 'আমি'কে জানতে হলে তাঁর কাব্যরচনার উৎস সন্ধান করা ছাড়া গতানুগতিক নেই। সমর্থন পেয়েছেন লেখক রবীন্দ্রনাথ থেকেই 'কবিকে উপলক্ষ করিয়া শীঘ্রাপাণি বাণী, বিশ্বকায়নের প্রকাশশক্তি, অসম্বাদ্য কোন আকারে ব্যক্ত করিয়াছেন তাহাই দেখিবার বিষয়।'

শ্রীচৈতন্যের রচিত এই কবিত্ববোধের জীবনবৃত্তান্ত থেকে বৃত্তান্তক বৃত্তান্ত গোয়ায় হলে গণনা করা হয়েছে। তার থেকে বেশি আশ্চর্য্যকর কথা এই হয়েছে অস্তিত্ববোধের বিকাশের হৃদ্যকে। বৃত্তান্ত নিয়ে 'উপন্যাস' লেখা যেতে পারে, তা কারও কারও অক্ষম হতে রমনাও হতে উঠতে পারে। কিন্তু কবিত্ববোধের কথা আলাদা। শ্রী চৈতন্যের মনে বলেন—'আমি বৎসর থেকে আমি বৎসর বৎসর অর্থাৎ জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত যে নারী রবীন্দ্রজীবনের নানা পর্বে নানা রূপে দেখা দিয়েছেন, মনে হয় কবি যেন তাঁর অজ্ঞাতসারেই বোঝাচ্ছে—প্রশস্তি রচনা করতে থিয়ে তাঁর নিজের সেই মানসস্বত্বীর্ষ প্রণতি রচনা করে রেখেছেন।' বর্তমান আলোচ্য 'নানা পর্বে নানা রূপে' এই শব্দবলীতে উপলব্ধি হতে চান। 'কবিমানসী'র কাব্যো বা গঠন বিন্যাস থেকে যেখানে যায় দীর্ঘকাল পোষিত, লাগিত এবং পরিশীলিত পরিকল্পনার ফল এই প্রথ। যোগ্যটি সুস্বীকৃত পরিচ্ছেদে—সামুদ্রিক পর্বতবন্ধন পাড়ে ভেঙা হয়েছে রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ জীবনী। 'যে আমি স্থপনমুরতি গোপনচারী' 'আবির্ভাব', 'নির্বাণসত্যাপন', 'নেপথ্য বিধান', 'বিদ্যালী পাণি', 'কচ ও দেবদাসী', 'দলন কাননে পূর্ণগঙ্গা', 'মোহন সাহেবের বাগানবাগিচা', 'অভিমানিনী' নির্ভরী', 'স্বপ্নদীপালিনী', 'আত্মবিসর্জন', 'কবির অন্তরে তুমি কবি', 'আপন মানুষের দুই', 'তব অর্থনৈতিক হেরি তব রূপ চিরন্তন', 'স্মৃতির শেষ রহস্য—ভালোবাসার অমৃত', এবং 'শেষ অভিসার'—এই যোগ্যটি অগাধ কালানুক্রমে বিন্যস্ত করে। কিন্তু একটা কথা থাকেই। স্মৃতির জগৎ বর্ণিত হয়েছে, 'স্মৃতির জগৎ বর্ণিত হতে কবিতা সম্ভব হয়েছে। সে জগৎ কালের অনন্তময় যত না প্রাধান্য পায়, নিমিত্ত তার থেকে অধিক কৃপা হতে ওঠে। একটা প্রসঙ্গ তুলে আমাদের বক্তব্যটি ব্যাখ্যার চেষ্টা করছি। 'যেমনকে কথা

রবীন্দ্রনাথ রচনা করিয়াছেন নানা পর্বে নানা রূপে

প্রকাশমানো

বলেছিলেন কবির তোমার কানে কানে' গানটি কবি-শ্রীতার মৃত্যুর পরে বৃদ্ধি বহর বাড়ে মৃত্যুবাবীকীতে লেখা বলে প্রভাতকুমার জানাচ্ছেন। কিন্তু এ তো শব্দ তথ্য। কবি যখন কবিতা বা গান লেখেন তখন ব্যক্তি 'আমি'—কে ছাড়িয়ে ওঠে অন্য এক সত্তা। সে তখন বা বহরার বহর, যা লেখবার লিখছে, যা আঁকবার তা আঁকছে। বাইরের তথ্য সেখানে মাত্র তথ্য। 'নিমন্ত্রণ' কবিতাটি থেকে বাস্তবের কোনও নারীকে বৃদ্ধ পাওয়ার চেয়ে অনেক বেশি উপভাষা হয়ে কবিত্ববোধের যুগল কবিতা বহরবহর গ্রহণ করা হয়ে। আম এবং বাগবন্তু আনয়নের ফরমাসে পরিহাস—সম্প্রসঙ্গী কোনও আত্মীয়কে পড়ে পড়বে কেন? ঘরনিজেই মনে পড়বে। 'যেতে নাই বিব' কবিতায় এই ঘরনি যে উপাধিরে বিহারের পরে বহু রসে পূর্ণ করে দিচ্ছেন, আমসত্ত্ব আমচর, মিষ্টায় ইত্যাদি সে সব উপাধার এখানে স্মরণীয়। স্মরণ করতে অনুচ্ছেদে কবি 'চিঠিপত্র' প্রথম বৃত্তের স্তম্ভে পত্রটির কথা। সেখানেও দেখা যায় কবি মৃদালিনী দ্বৈতকে আমের কথা বলেছেন। আমার বক্তব্যের সমর্থনে আরও একটি কথা বলার আছে:

এই সূত্রোক্তেও একটুকু বিধি বোটা

আমার সেওয়া সে ছোট্ট হুনির দুল,
রক্তে জ্বলানো যেন অন্তর ফোটা

কতদিন সেটা পরিতে করেছে ডুল।

এই কথা কবির কাব্য মনে যে বিষয়ে আমি দুর্নিশ্চয় নই। 'বোটা' শব্দের সাদা অর্থ প্রীতি মিশ্রিত অনুযোগ—যুগ্ম অভিযোগও যুক্তি বা। এতে স্ত্রীরই প্রাপ্য। ইনি কে সে সম্বন্ধে নিশ্চয়তা বাড়িত হয় আরও একটি কারণে। বই প্রকাশন হলে উদ্ভিত নারীর ঠিকানা সম্বন্ধে তো আশঙ্কিত থাকার কথা নয়। কিন্তু কবিতায় আছে:

যত লিখে যাই ততই ভাবনা আসে,

লেকফার পরে কার নাম দিতে হবে;

মনে মনে গভীর দীর্ঘশ্বাসে,

কেন দূর যুগে তারিখ ইহার করে।

সে কারণে আমার বিনীত অভিমত, নামরূপ নয়, একাধিক নামরূপের অন্তরাল—বর্তনী যে ভাবপ্রতিমা কবির উদ্ভিত মানসী তিনিই। আমার এই বক্তব্যে কথাগুলিকে বৃদ্ধ বেশি প্রথম দেবার দরকার আছে বলে অশ্রদ্ধা মনে করি না। শ্রীচৈতন্যের প্রত্নটি দাঁড়িয়ে আছে এবং থাকবে এক সুদূর, ইতিবৃত্ত ও ইতিহাস সমর্থিত, অবশ্যই ভিত্তির উপর। কবিত্ববোধের দুই প্রান্তে দুই নারী কীভাবে একজন কবিকে প্রতিষ্ঠিত করলেন অথবা ভূমিকা পালন করলেন কবির আত্মসম্মতির জন্মধরম করে তুলতে, আরেকজন কবিত্ববোধের ব্যক্তি গোপনিত ক্রমবর্ধমান আধুনিক দুই ব্যক্তির বৈদিক অর্থ অর্থবোধকে সম্পর্কে নতুন মাত্রা এনেছেন কীভাবে—সেটাই কবিমানসী গ্রন্থের মূলকথা। এরাই

আলম্বন বিভাব। সন্ধারি মনে মতো এসেছেন, গেছেন কেউ কেউ। কিন্তু বারের বার মূল শব্দকে থেকে উৎসারিত হয়েছে নানা মূল সূত্রটিই। আঁকা ছবিগুলির নারী মুখাবরণেও তারই অভাস রূপণও রূপণও মিলেছে। রানু প্রসঙ্গে কবিত্ববোধিত যে বইটাকরনের স্মৃতিই 'পুনঃপ্রতিমায়িত হয়েছে, শ্রীচৈতন্যের এ সিদ্ধান্তে আমার সব ব্যাখ্যারটি নতুন করে আবিষ্কার করি।

বইটাকরন এবং ওকালো—এই ভাববৃত্তের একটা সামান্য কাগজ লক্ষণীয়। দুই ভাববৃত্তেই মূল পেয়েছেন বেশি রবীন্দ্রনাথ। কারণ তিনি বেশি ভালবেসেছিলেন। বইটাকরন ভাববৃত্তের একটি প্রসঙ্গ কবিতার কথা এখানে তুলছি। শ্রীচৈতন্যের কবিতারটি নাম তাঁর গ্রন্থের বর্তমান সংস্করণে ১৮১ পৃষ্ঠায় অন্য কয়েকটি কবিতার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আমার মনে হয়েছে শ্রীচৈতন্যের বক্তব্যকে পুষ্ট করার জন্যই এই কবিতাটি আরও একটু অধিক অবধানতা দাবি করে। কবিতার নাম 'মৌন ভাষা'। এটি একটি অসামান্য গিরিক। এই মাত্র যে বক্তব্যের কথা বলেছি, সেই সংঘত পথটি, যত্না। যে বেশি ভালবাসে সে বেশি 'shalt' করে এই বৈদিক আমি শ্রেয়জি টমাস মনে থেকে। 'মৌনভাষা' কবিতারটির শেষ দুই শব্দকে উদ্ধৃত করছি। পাঠকের পুরো কবিতার সঙ্গে যখন শেষ দুই শব্দকে পড়বেন:

তোমার সাহস আছে আমার সাহস নাই
এই যে শক্তি তোলা অন্ধকারে হলে ভালো,
কে বলিতে পারে বেলো যাচা চো একি তাই।
তবে ইহা থাক দূরে কল্পনার স্বপ্নপূরে,
যার যাচা মনে লয় তাই মনে করে যাই—
এই রিঃ-আবরণ মূলে যেসে কাছ নাই।

এসে তবে বসি হেথা, বলিয়ে না কোনো কথা
নিশীথের অন্ধকারে গিয়ে বিক দুন্দুভারে,
আমাদের দুজনের জীবনের নীরবতা।
দুজনের কোনো বুকে আঁধারে বাজুক সুখে
দুজনের এক পিশু জন্মের মনোবাহা।

তবে আর কাছ নাই, বলিয়ে না কোনো কথা।

তখন সমস্ত উভাবকতাকে, 'অশান্তি যোলা'কে পূর্ণ প্রেক্ষিতে পাবেন।

পূর্বকভাবে স্মরণ করি একটি গান। ১৯২৪ এর ডিসেম্বরের রচিত এই গানটি হল 'গানের রজনাক্তরায় তুমি সঁজের কোয়া এলে'। ওকালো—বৃত্তে লিখিত এই গানের সিক্রিকিট মনে জানি না গীতিবোধের পূর্ণ বৃত্তে চলে যেওনা হয়েছে, অথবা বিহার উদ্দেশে লেখা 'সুদীল সাগরের শ্যামল কিনারে' গানটি 'প্রেম' পর্যায়েই আছে। আবার লক্ষণীয় গানের রজনাক্তরায় সিক্রিকিটে

এবং পূর্ববর্তী কলিতাতি আমরা যাকে লৌকিক অর্থে 'শ্রেম' 'শূদ্র' বলি তার কোনওটির মধ্যে পড়ে না। গানচিত্তে কবি-সমিতির সুরময় জ্ঞানার প্রকাশ রুপ। 'তুমি' সেই জ্ঞানবিশেষের বিভব। 'যে সুর চাঁপার শোলায় ভরে দেয় আশনার উজ্জ্বল করে যায় চলে যায় চৈতন্যের মধুর খেলা খেলে'—সমস্ত লিরিকটি সজ্জালালকে কৃৎসিক প্রাপ্তির বেন্দনা এবং মধুরের সহায়বন্ধনের সংবাদ দিচ্ছে। কুকের শাওর, আকুল স্রোত, কামা, চাঁপার শোলায় ইন্দ্রজেক কবিমানসির ছোঁয়া।

খুব ঠিক বলেছেন প্রীতীতাচার্য, 'স্বীকৃত্যবোধের বিরহী-চিত্তে

বাঙালির আত্মজিজ্ঞাসা

শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রা-ভাবনার সঙ্গে পরিচিত হবার একটা বিশেষ আকর্ষণ আছে। বিশেষত লেখক যদি সমালোচনা প্রবন্ধ-সম্বন্ধেই রচনাটা রচয়নশাস্ত্র ও পদার্থ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কৃতবিন্দা, দেশ-বিদেশের অভিজ্ঞতাশ্রদ্ধ হয়। পরিশিষ্ট সহ মোট ষোলটি প্রবন্ধের দশটিই হয় বিজ্ঞানের নানা বাস্তবের কোনও ও তথ্য উপস্থাপনকারী অথবা বিজ্ঞান-মানসিকতার বার্তাধার। সংক্ষেপে চিত্রিতব্য প্রকারের প্রবন্ধগুলির বিধানবলু হল—বিজ্ঞানশিক্ষা লাভ করা সত্ত্বেও মানুষের পুরাতন অতীতকৃত কুসংস্কার ও অজ্ঞানবাসন বর্জন না করতে পারার জন্য কেহো। মুক্তিলাভি লেখকের এই মনোবৈদ্যনা স্বাভাবিক। তবে ধর্ম ধরে জনশিক্ষার প্রয়াস চালিয়ে যাওয়া ছাড়া মুক্তিবিশ্বের কাছে অন্য বিকল্প নেই বলে এ প্রবন্ধের অধিকার আলোচনার প্রয়োজন বর্তমানে দেখি না। লেখক বর্তমান বাংলাদেশের সমাজ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে আলোকপাত করেছেন, সেদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করব।

লেখক প্রধানত তিনটি বিষয়ের আলোচনা করেছেন : (ক) মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতার আলোকে ধর্মভিত্তিক বিজ্ঞানতত্ত্বের শূন্যগতি প্রমাণিত করে বাংলাদেশে বাঙালি জাতীয়তাবাদের জন্ম সূচিত হবার পরও ওদেশের নারিকরিত্বের একাংশের মনে অকারণ শাক্তিক্যের প্রতি অনুগততার স্বীকৃতিদান, যার নাম তিনি দিয়েছেন 'পাকিস্টিফিকেশন'; (খ) বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রতি তাঁর বিশেষ দৃষ্টি যে বাঙালি জাতীয়তাবাদের কথা হয়েছিল, তার প্রতীতি চারণ হিসাবে পাকিস্তান গণপরিষদে অসম্মান ও নিপীড়নের প্রতি

অতীত-বর্তমানে ভাগ করা কালপরিধির গতি হয়েছে বিপুল। তাই শূন্যত্বকে লালিত এবং পরিবর্তিত কবিসংলাকে খুঁজে নিতে কবিশ্রমের হিসাবকে তত মর্যাদা দেবে, ততটাই মর্যাদা দেবে সেই সুদীর্ঘ আত্মজ্ঞান বিস্তারিত তৃপ্তিহীন শিশুমর্যতকে—উৎস এবং পরিণতি সমেত। সেটাই প্রকৃত জ্ঞানীরা ভট্টাচার্য তাঁর 'কবিমানসী' গ্রন্থে করেছেন। ভট্টাচার্যের কবিজীবনীকারের কাছে এই বই নামানিক থেকে হবে বিশার।

কবিমানসী—১১শী খণ্ডাচার্য / ভারতী, তপসকতা—৭/৮/১৯০.০০

ক্ষেপ না করেও বাংলা ভাষাকে যীকৃতি দেবার প্রথম দাবিবার ধীরেন্দ্রাভ্য দত্তের প্রতি যীকৃতি। এই বাঙালি জাতীয়তাবাদ—নিষ্ঠার জন্মি তিনি ওদেশের জাতীয় ধ্বনি 'জয় বাংলা'র কোনও রমণ পরিবর্তন করার বিরোধী এবং ধ্বনিটি যতটাই ইসলামি নয়—এক শ্রেণীর বাংলাদেশি মেতা ও গৃহীতজীবীদের এ জাতীয় কথনের তীব্র বিরোধিতা করেছেন। এবং (বাঙালিরা বাংলাদেশের প্রতি অনন্য অনুগত সত্ত্বেও পার্বত্য চট্টগ্রামের বৌদ্ধ উপজাতীয় সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে ও দেশের স্বার্থের নামে প্রায় পঁচিশ বৎসর যাবৎ জিয়ারত রহমানের উদ্যোগে যে গণসংগ্রাম ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে দমননীতি চালানো হয়েছে, তার নৈতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অস্বীকৃতিতা যোগ্য। মানবাধিকারের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত জাতীয় সংবিধানবাদের সমস্যা বিশ্বজ্ঞান এই অতীত সংবেদনশীল ক্ষেত্রে তিনি বিশ্লিপথিক মানবিকতাবাদী, যা আদর্শ আধুনিক বৈজ্ঞানিক মানসিকতার দ্যোতক।

মানসিকতাবাদের চিরকালীন প্রগতিত পৃথক যে সব সনাতন মূল্যবোধ জাতীয়তাবাদের চেয়েও অধিক মূল্যবান, তার সারা অনুপ্রণীত হওয়ার লোক এই সত্য প্রকাশ করতেও সৃষ্টিত হননি যে পার্বত্য চট্টগ্রামের সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে অভিযানে শেষ হবার পরও দেশের বাগাচারটির শান্তিপূর্ণ বৈদ্যমান করার পূর্ণ পর্যন্ত বাংলাদেশের সৈন্যবাহিনীর প্রায় ৭০০ সৈন্যহত ২০,০০০ রায়বাদের মৃত্যু ঘটেছিল এবং সরকারের সৈনিক খরচ ছিল দু'কোটি টাকা। এ ছাড়া ওই যুদ্ধকে জিইয়ে রাখার সিংহন ড্রাগ ও বেআইনি অস্ত্র ব্যবসায়ীদের (যার বড় একটি অংশ ভারতবিরোধী স্বল্পসংখ্যকীয়দের দ্বারা পুষ্ট) ভূমিকাটি তীব্র হলেছিল। সত্তা জনপ্রিয়তার প্রতি জ্ঞেপনা না করে লেখকের সত্যকথনের সংশয়হাসের পরিচয় অপর একটি সংবেদনশীল ক্ষেত্রেও

দৃষ্টিগোচর। বিষয়টি হল ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক। এ কথা সত্য যে অতীতে এ ক্ষেত্রে ভারতের ভূমিকা যে সর্বথা সমালোচনার উল্লেখ ছিল, এমন দাবি করা চলে না। কিন্তু অহেতুক ও অস্বাভাবিক ভারতবিরোধিতার একটি ধারাও যে ওদেশে আছে এবং তা উভয় দেশের কারও পক্ষে হিতকর নয়—এই সত্যও লেখক অকণ্ঠস্বরে ব্যক্ত করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে পারস্পরিক স্বার্থে 'সার্ব', 'সাম্প্রা' প্রভৃতি আঞ্চলিক সহযোগিতার সংগঠনগুলির মাধ্যমে বাক্য-বাণীনা ও শিশু-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিনিময়বির বিস্তার ধারা বাটুগুলি সার্বভৌমতা বজায় রেখেও উন্নতি করতে পারে এই মুক্তিবিন্দী ভূমিকা গ্রহণ করেছেন।

রচনাগুণিক অকণ্ঠ সাধারণ দেবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরই বক্তব্যের সমর্থনে পরাস্তের লিখিত এবং পরিণতিত সংযোজিত নবীনা

নুরুন নাহারের গল্প—গভীর অনুভূতির চিত্রমালা

মীরাতুন নাহার

যথাসময়ে অনুভূত হলে তাঁর লেখা গ্রন্থের দশকে মুসলিম মহিলা রচিত সাহিত্যধারায় একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন বলে পরিগণিত হতে পারে—আলোচ্য বইটির ভূমিকাতে লেখা এই বাস্তবটির একটি সংশোধন প্রয়োজন। কেবল 'মুসলিম মহিলা রচিত সাহিত্যধারায়' নয়, বরং বাঙালি সাহিত্য জগতে ছোটগল্পের সমালোচনা বোধিত সম্প্রদায়ের আসন লাভ করতে পারে। অতীতগির কথ্যশিল্পের এই প্রথম আত্মপ্রকাশ লেখার মারের মতোই অভিজ্ঞতা হিসেবে সংরক্ষিত' গল্পগুলি লেখকের সত্যবাদের সত্য থেকে অবশেষে প্রকাশের আলোতে উজ্জ্বলিত হয়েছে—তবে বড় অবসায়।

"নুরুন নাহারের গল্প"—বইটির সামান্যটা নাম। লেখিকা বেগম নুরুন নাহার আত্মজীবনের জন্ম হা জন্মশিগুড়ি কোমার ময়নাগুড়ি শহরে ১৯১৬ সনে। মাত্র বোম্বা হবার বয়সে তাঁর বিয়ে হয়। ১৯৩২-এ মেজাজে কলেজের এম.বি.বি.এস ডিগ্রিপ্রাপ্তি স্বামী কাজি আক্তার হোসেন গ্রাম্যজীবন বেছে নেন এবং গ্রামের মানুষদের সেবাকর্তী জীবিকা করে নেন। ফরিদপুর জেলার আড়ালগা গ্রাম। সেই সূত্রে গ্রামবাংলার মানুষের জীবনযাত্রার সঙ্গে লেখিকার নিবিড় পরিচয়। কলমে তারচরিত্র একেছেন তিনি তাদের কর্মময় বিভিন্ন জীবনের ছবি। গভীর অনুভূতির স্বত্ব দিয়ে কলমে তুলেছেন অতীত যে সব ছবি শারককে নিমগ্ন করে। তার অপর-মহলে আত্ম-জিজ্ঞাসা শূন্য হয়।

নুরুন নাহারের লেখা নয়টি গল্প নিয়ে কাহিনীর ডালি সাজিয়েছেন জীবনুর রহমান ও অনি আনোয়ার। গল্পগুলির

লেখিকা উদ্দেশ্য হাবিবা সুমির রচনাদি পড়ে ওদেশে বাংলাভাষায় লেখিকা সত্ত্বে যে আত্মবোধ হয়েছে, তার কথাও এখন উল্লেখ করতে চাই। এবারের (২০০০) ২১ শে ফেব্রুয়ারি 'প্রথম আলো' দৈনিক পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠাতে একটি বাস্তবচিত্র নজরে পড়ল যাতে বাংলাদেশি যৌবন সাহেব একুশে ফেব্রুয়ারি যে কী তা কয়েকজনকে বোঝাতে গিয়ে ঘন ঘন ইংরেজি ভাষার শরণ নিয়ে ছোট্ট ছাচ্ছেন। উদ্দেশ্য হাবিবা সুমি-র কথাও বাস্তবচিত্রের যৌবন সাহেবের গায়ের। বাঙালি বাঙালি বাঙালির ক্ষেত্রে 'মোদের গরব মোদের আশা' বাংলাদেশে এ কী সর্বনাশা বিপদপাতের আশঙ্কা!

বাঙালির ভ্রম বাঙালির বার্ষিক—ফ.ব. আল সিকি/পরমা, দানমতি, ঢাকা ১২০৪/১৯০.০০

রচনাকাল সত্য না। দুখে নিয়ে যায় গল্প পড়ে। লেখিকার কব বয়সের সূচনা হয়। তাঁর পরিণত চিত্রাত্মকতার ফলক বলেই মনে হয়। তবে সেও বেশ অনেক কাল আগেরই কথা। গল্পগুলি বাঙালি মুসলমান 'সামাজিকবাদের চিত্রমালা'। গভীর দৃষ্টিকোণ থেকে আঁকা। প্রথম গল্প—'দুর্ভিক্ষ'। লেখিকা মনীরের 'সামান্যকাল অট্টালিকার পাশে' গরিব রিকশাওয়ালা রমজানের 'কুঁড়েঘরটি' বেন সুন্দরদেহে দুই কলমের মত দৃষ্টিকর্মে ও পীড়নভরা। মনীরের আধুনিক শিক্টিয়া স্ত্রী শাহানা এই কুঁড়েঘরের লোকদের তড়িয়ে সেখানে একটা সুন্দর ফুলের বাগান করতে চায়। কিন্তু কিছুতেই সে বাড়ির মালিককে রাজি করতে পারে না। জোরজবরুদও করতে পারে না। কারণ, 'এখনকার সরকারের আদায়ের বন্ধু'। শাহানাও ফেলার ত্রুটি করে না। শেষে অক্লান্ত যত্ন সুযোগ হাতের মুঠোয় এল গোল বাগান রমজানের ছোট্ট ছোট্ট। রমজানার ঘর ছেড়ে চলে যাওয়ার দিন শাহানা গেল তাদের কুঁড়েঘরে। 'ছেড়েছলেটি টলিতে টলিতে ছুটিয়া আসিয়া শাহানার দুই ছাট গরিয়া দুখের দিকে চাহিয়া ডাকিল, বা! নিঃসন্তান শাহানার তৃষ্ণিত হৃদয়ে মেহেতুমার ক্ষুধার প্রবাহিত হল। সে শিশুটিকে কুঁড়ে ঘরে নিয়ে তাদের ঘর ছেড়ে যেতে বাধ্য হল রমজান। কাহিনী মোড়ালি ডিম পথে। মনীর ও শাহানা হল রমজানের পরিবারের অভিজাতক রক্ষাকর্তা। 'দুঃস্থ বহুসন্তানশীল একটা সমস্যা'র তারা বাঁচিয়ে তুলল। শাহানা নিজেও মাতৃকাতার পুণ্ডা বোঝ করল। তার চরিত্রের অত্যাশ্রয়ী রূপান্তরে সে নিজেই বিমিত্ত। সে তার 'জিহ্বা হিসাবসুগোলা কোড়া' নিতে বসে।

‘স্বপ্ন’ গল্পে গরিব অসমর্থবী ক্ষুধামাটীরের পরমামুখ্যরী মেয়ে ধনীকৃষ্ণ ফরিদা বলে—‘আমার অনেক টাকা, কি হলে অত টাকা নিয়ে?’ সে কথা শুনে বিশ্বাসের তার ছোটভাই তার মুখে দিকে তাকিয়ে থাকে। ‘বৈশিষ্ট্য’ টাকা যে কাহারও দুঃখের কারণ হইতে পারে তাহা বাহ্যক বোধগম্য হইল না। তবে কিশোরটি তার দিগির মনে যে দুঃখ আছে তা বুঝতে পারিল। ফরিদা মনে মনে বলে, ‘এত ঐশ্বর্য এত প্রচুরত্ব ভিতর না থেকে যদি গরিব স্বামীর কুৎসেবের থেকে সারাদিন পরে স্বামীর কষ্টজিহ্বিত আয়ে নিজ হাতে রাগা করে স্বামী সন্মোহনের স্বেতে বিভ্রান্ত তার চাইতে বেশি সুখ আর আশা কখনো কখনো না।’ সে তার ‘দুখিত কলুষিত জীবন’ আর বইতে পারছে না। স্বামী তাকে বদসময়ে উদগির জন্ম কর্মকর্তাদের খুশি করে, তাদের সঙ্গ দিতে বাধ্য করে। মিসেস হাসান, মিসেস জামিল, মিসেস বারিদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা সে ভিত্তিতে পারে না। সে প্রতিদিন স্বামীর কাছে তিরহুত হয়। তার মা-বাবা তাকে ছোটবেলা থেকে ‘পাশ-পুণ্যের পার্থক্য ও সুললিত কল্যাণ’ বুঝিয়েছেন। ‘পাশের পরিচায়ক অগ্রিমদের ডায়াবৃত্তা ও পুণ্যের সুখরাম বেহেস্তের প্রতিশ্রুতি’। সে সব কথা মনে পড়লে তার ‘মন ভয়ে কণ্ঠিত হতে থাকে’, হতাশায় ভরে ওঠে। ফরিদা তার গরিব বাবার সমসারের পরিশ্রমত্যা মায়ের সুখ অনুভব করে চোখের জল ফেলে। ‘শুশুর-শাশুড়ীর সেবা, সেও-র-নন্দনের অবসার রক্ষা, গরিব দুখীদের সাহায্য দান, আশ্রিত জনে আশান, আশা, আশা-পাশের বান্দা প্রভৃতি’ করা ফরিদা এমন একটি আদর্শ জীবনযাপনের স্বপ্ন দেখে। তার যুগ তার ভেঙে ফুরামার হয়ে যায়। তবে সে তার সমস্যা অবশ্যই মেনে না নিয়ে প্রতিদিন হইয় ওঠে। স্বামীর কাছে বারো আশ্রয়ে গিয়ে ওঠে। তার দুঃখিততার কাছে পরাজয় ঘটে অর্ধশোঁটা স্বামীর। গল্পের এই অবশ্যে বেশিকাঁটা তার অসমর্থবী স্বপ্ন হৃদয়ের প্রকাশ ঘটিয়েছেন।

মুখ্য কল্যাণ-শীল নয় না। ফরিদার স্বামী সালামকে যত যুক্তি ভাবা হয়েছিল ততখানি সে নয়। শৈশবে তার গরিব মায়ের প্রতি তার চাচিরের নিয়ম ও নিয়ন্ত্রণ অসমর্থ মেয়েদের প্রতি’ তার মনকে প্রভাবিত করে তুলেছিল। সে ‘আজকেরে খালায় অঙ্গ হইয়া মেয়েদের ভিতরে শূন্য পরদীভবনের রূপই দেখিয়েছে। তাহাদের ভিতরে সে মেয়েদ্বী কল্যাণমণ্ডলী মায়ের রূপও আছে তাহা সে দেখে নাই।’ ফরিদাকে হারিয়ে সে তার ভুল বুঝতে পারিল। সে অনুভব করল, ‘স্বপ্ন অর্থেতে পড়ে’ সে সিলেক্টে এতদিন ‘মূল্যবান জিনিসপোতা থেকে বঞ্চিত’ করলে। শূশুর-শাশুড়ীর হের-মহতা এবং প্রিয় প্রেম ও বিশ্বাস সেই মূল্যবান সম্পদ। ফরিদাও তার ‘ঈশ্বরিত সম্মানের প্রতিশ্রুতি’ সে ‘সুখের নাজনা’ পেল। কল্যাণের নিত্য অসমর্থবীর মনোভিক্ষা সৎবাণ পড়ি আমরা প্রতিদিন—

বেশিকা এক মরহাৎয়ের প্রতি আমদের দৃষ্টি বিরিয়ে নে—
অন্যায়কারী সশেষোদযোগ্যতা আমরা যেন ভুলে না যায়।

‘স্বপ্নকাণ্ড’ গল্পটিতে বেশিকা যেন তার অস্তুরের সব কথা উজাড় করে দিচ্ছেন। গ্রামের অসমর্থবী গৃহস্থ মুসলমান পরিবারের এমন অন্তরঙ্গ বিশ্বাসিত বিবরণ সত্যায়িত ছোটগল্পে মেলে না। মূলচরিত্র রাহিয়া। দাদাসদী জন্মভূমির আশ্রিতজন ও ব্রজান পরিভিত্র বৃহৎ পরিবারের অসমর্থবী পরিচালনার সব দারিত্র্য তার হৃদয়ে। সে পরিবারের একমাত্র বাক্য। তার মুখেই শোনা যাবে—‘এই আমার সংসার। এখানে সকলের দাবি সকলের মুখে উজারিত হইয়া সকল হয়। আর আমি সকলের দাবী আশ্রয়কলপে পালন করিবার আশ্রয় দিয়া সকলকে আশ্রয় করি, নিমন্ত্রণ করি।’ স্বামীকে কামলাদের ভাত দিতে হইবে। এখনই স্বামী দশুর খাইতে আসিবেন। একটুপরেই ফুল-কলস ফেরৎ মসতার মৌলিৎ নেওর নন্দরা আসিয়া পড়িবে।’ সব বাসখানার তার উপর। পরিচরিকার অভাব নেই। কিন্তু দায়তার তাই কেবল। একটু ত্রুটি হলে হোই—‘কল্যাণে গন্ধনার ফুল হজম করতে হয় প্রতিদিন।’ নিরঞ্জন আরাম আয়েস সুখ ও স্বাস্থ্যদা বিসর্জন দিয়া পরের ত্রুটি বিধানে লুপ্তকর্তা—সে এভাবেই মেনে নেয় পরিত্রিতক। তবু অস্তুরে কড় ওঠে। দাম্পত্যসম্পর্ক ফাটল ধরে। অসহায় স্বামীর মন ভালবাসাবিহীন সম্পর্ক স্থাপনে বিঘ্ন হয় পড়ে। রাতের ছবি—‘আমি শক্ত আঙঠি হইয়া চোখ বুজিয়া পড়িয়া থাকি। আমি বুঝিতেছি তাহার কি দাবী। কিন্তু যেখানে ভালবাসা ও সহনভূতি নাই, নাই আমার ইচ্ছা অনিচ্ছার মূল্য, নাই শাখীরক সুখতা ও অসুখতার যুগ্ম, সেখানে শূন্য হেজের হাফিয়া মিথিহিত আমার মন মনে গৃহস্থ কুঁড়িয়ে ওঠে।’—রাহিয়ার এই মনোভাব আরোপে ব্যক্ত হতে পারে না। কারণ, ‘তাহার ইচ্ছা বাধ্য দিতে, তাহার কাছের প্রতিভা করিবার সাহা আশ্রয় হইয়া তার এই হৃদয়ের অভাবের মূল্য তার কেবলওহীনতা নয়—তার তীব্র অসমর্থবীত্ব।’

সকলের সামনে অমান্যনিত হওয়ার আশঙ্কায় তাকে প্রতিবাহে মূসে উঠতে নিমন্ত্রণ করে। তবুও এতদিন সে হল গেল গিল্পিত। সংসার অঙ্গল হয়ে পড়ল। আরম্ভ ভাক পড়ল তার। বিস্মে এসে আবার সব স্মরণ। উদ্যম্য পরিমেষে শরীর ভেঙে পড়ল। ততদিনে তার ভূমিকার মূল্যমান কল হইয় গেছে। মেয়ে-কন্যা, শিশু কিশোর বৃদ্ধ—পরিবারের সকলে—বুঝেছে তার স্বপ্নকাণ্ড-জীবনের অসহিষ্ণুতা। সকল তার ‘আপনজন’ হয়ে পড়েছে তার ভায়াতায়। ‘আপনজানদের পেয়ে এতদিনে তার হৃদয় আমদের দর্বে আন্দোলিত হইতে শেখেছে। রোগাখায়া মূস বন্ধ জাননা খুল দিতে বলল সে ননকহ—চোখে-পায়ে, কল্লুভাড়া ‘গাছটিতে অঙ্গল খুল ফুটিয়া মনে আশ্রয় ধরাইয়া দিয়াছে। সে ভাবল—গাছটি কি ওখানেই ছিল? বিশাল সংসারের বিরাট দাম্বিত্র বহন করত করত কেনওদিকে চেয়ে দেখার সময় সে পায়নি। সে হল—‘উত্তরে হাওয়ায় অশন গাছের পাতা খরিয়া সিক্ত

হইয়া গিয়াছে, তখন সে রিক্ত নিঃশ্ব রূপ সেবিবার সময় আমার হয় নাই, আমার দরজা-সমাপনো গাছ ঘনন মূসে ফুলে ঐশ্বর্যমণী আমার উঠিয়াছে, তখন গাছের সে ঐশ্বর্যমণী প্রাচুর্যপূর্ণ রূপ সেবিবারও সময় আমার হয় নাই।’ বেশাশ জটিল আবার প্রভূতি মাসেস যে বর্ণনা আমার তার ভায়ে পাই তা যেমন কল্পনাসে ভরা তেমনই বিশ্বদয়ক। বাংলার গরে গরে মেয়েরা এমনই করে কাটিয়ে দিয়েছে তাদের জীবনের অতলা সময়—কেউ কখনও তাদের কথা ভাবেন। তারা নিজজনও থেকেছে মুক্ত, অঙ্গ, বসিত। কেবল নূরুন নাহারদের কলম সোচারে হয়েছে। তবে সে সংবাদ শৌচায়ন উঠতে পারে মনুষ্যের প্রাণে। তাদের কষ্টবহু মেহনতের বেজ্ঞ ভেঙে পড়েন। শূন্যতে পায়নি সকলে। কারণ, তাদের প্রতিবাহে শোভনতা ছিল, শালীনতা ছিল। বর্ধন মনুষ্য তার ম’ বোকেনি।

নিষ্ঠুর থেকে নিষ্ঠুরতর হইতে তারা।

‘নিমম’, ‘মিহি’, ‘কটিক’, ‘স্বপ্নকাণ্ড’ প্রভৃতি গল্পে নূরুন নাহারের কাহিনীর বিষয়বৈচিত্র্য পাঠকের আনন্দ দেয়।

এক আত্মগোপনকারীর জীবনী

মধুময় পাল

একজন আত্মগোপনকারী সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ বেশ কঠিন। কাজটি যুগ দুঃখপাশের পাঠকে শৌচয় যদি তিনি গোচী বা দলন্তক না হয়, যদি তিনি ঘনিষ্ঠদেরও নিজের কথা বলতে কুঠী বোঝ করেন এবং যদি কোনও কারণে সমকালীনরা তাঁর সম্পর্কে উদ্ভীষ্ট না থাকেন। জীবনানন্দ সেইরকম আত্মগোপনকারী। বাংলার সাদীয়া-সামরোজ প্রসিদ্ধ ও অপ্রতিত ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রোজ পূর্বের প্রখ্যাতম ব্যক্তিত্বকে ‘আত্মগোপনকারী’ মনে হয়েছে অনেকদিন। ‘মুহূ’ পত্রিকার জীবনানন্দ শ্রুতি সংখ্যা পড়েই হাত ভাবনাটা ‘ভূত’ হয়। সত্তর দশকের শেষ দিকে ‘মুহূ’-এর জীব একটি গল্প হাতে এখিছিল প্রেসিডেন্ট রেলিয়ারের এক পুরনো বই বিক্রোতার সুবাদে। আত্মকল্পনায়ের ব্যতুলতা হয়ে যাক তবে কথটা বলা সাহসে কলোনি। ভাবনাটা প্রথম পেয়ে গেল আশির মাঝামাঝি ‘প্রতিভা’ জেগে ‘জীবনানন্দ সমগ্র’ প্রকাশের উদ্দেশ্যে। সেবেশ রায় জ্যোৎস্না, ‘তার [জীবনানন্দের] অপ্রকাশিত ভাগ, আয়তন, প্রকাশিত ভাগকে তুলে করে দেখা’। জানা গেল, ক্রিষ্টান বি সিলিকি বশিরাগে পড়ে থাকতে হয়েছে জীবনানন্দের জীবনী-তথ্য জোগাড় করা। বাক্যের বাংলায় দরজার খুলতে হয়েছে তাঁকে। বিশ্বসাহিত্যের মানচিত্রে জীবনানন্দ দশ নামক ভূখণ্ড আবিষ্কার করেছেন তিনি, এ-কথা হাতে অতিশয়োক্তি নয়। ভাবনাটা প্রথম পাছিল আরও

শেষ গল্প ‘ভা’ একটি অশু-গল্প। চমকে দেওয়ার মতো। এত ছোট পরিসরে এত বেশি কথা যে বলা যায়—না পড়লে বিশ্বাস করা যায় না। মুসলমান নারীর জন্য বীর্য কুটিলপ্রাণে ম্যানে করেন তাঁদের জন্য এই গাফিতি অব্যাপাতি। আজকালের ‘নারীশাবী’দের সোচ্চার ভ্রম ও স্পর্শা ভ্রিত্বিত করে দেওয়ার মতো এক পাল্য কেবল একটি গল্প। পাঠকরা নিজে পড়বেন বলে কাহিনীটি উদ্য থাকল। পাঠকরা-প্রব্রাণে উৎকণ্ঠ হইব প্রখ্যাত দুই গোষ্ঠীভুক্ত সাদীয়া-সামরোজ প্রসিদ্ধ। প্রাচুর্যপূর্ণ রূপ সেবিবারও সময় আমার হয় নাই। বেশাশ জটিল আবার প্রভূতি মাসেস যে বর্ণনা আমার তার ভায়ে পাই তা যেমন কল্পনাসে ভরা তেমনই বিশ্বদয়ক। বাংলার গরে গরে মেয়েরা এমনই করে কাটিয়ে দিয়েছে তাদের জীবনের অতলা সময়—কেউ কখনও তাদের কথা ভাবেন। তারা নিজজনও থেকেছে মুক্ত, অঙ্গ, বসিত। কেবল নূরুন নাহারদের কলম সোচারে হয়েছে। তবে সে সংবাদ শৌচায়ন উঠতে পারে মনুষ্যের প্রাণে। তাদের কষ্টবহু মেহনতের বেজ্ঞ ভেঙে পড়েন। শূন্যতে পায়নি সকলে। কারণ, তাদের প্রতিবাহে শোভনতা ছিল, শালীনতা ছিল। বর্ধন মনুষ্য তার ম’ বোকেনি।

নূরুন নাহারের গল্প—নূরজাহান বেগম, ৯৪ দশম জাগত ১২০৮/সমাপ্তা: হিজরতুল রহমান ও আলী আলোয়ার/১০.০০

কিছু ঘটানায়। কিন্তু বলার উপজীব্যতা ও দক্ষতার অভাবে সমুচিত থেকেছিল। হলে ফেমেলেন, সহজাত দীপ্তিময় ত্রিভবে জ্যোতির্ঘ্র জন্ম জীবনানন্দদের জন্মশতবর্ষের আয়োজনে বললেন। এখানে জ্যোতির্ঘ্রকে উক্তক ভাষা ছাড়া উপায়ে নেই। ‘জন্মস জন্মেরে যেন পোষ্টেট অফ না আটাই আছ এ ইয়াম ওয়ান’—তিনি দিয়েছিলেন, বিশ শতকের শিল্পীকে অবলম্বন করতে হবে নীরবতা, চতুর্ঘ ও নির্বাসন—silence, cunning and exile। জীবনানন্দের নীরবতা তুলনায় জন্মেরকে মনে হয় কলসার। ইয়েজ লেখক জন লে-কার সেসব বাহ্যত বোকাবোকা, সামান্য ও নিম্নশ্রেণী চরিত্রদের নিয়ে আন্তর্জাতিক গুণতরুণিত ও নানকরক উপায়াস লেখেন, তেমনই তাঁর কল ও লেখাগুলো বাংলাসাহিত্যের এই সন্ত্রাসবাদী তাঁর সমসাময়িকদেরই শূন্য নয়, মৃত্যুর প্রায় অর্ধশোঁটা পরেও, আমদেরও যেকা দিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর শব্দাবলিগ বহুদে এটা স্পষ্ট যে তিনি যেটাই বোকাবোকা বাংলাসাহিত্যের এই সন্ত্রাসবাদী তাঁর সমসাময়িকদেরই শূন্য নয়, মৃত্যুর প্রায় অর্ধশোঁটা পরেও, আমদেরও যেকা দিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর শব্দাবলিগ বহুদে এটা স্পষ্ট যে তিনি যেটাই বোকাবোকা গ্রাম্য ভালমূল্য ছিলেন না। রাত জেগে জেগে খাটের তলার টাঙ্কে প্রেছিয়ে কী সময়-বোমার স্বপ্নই না তিনি লুকিয়ে রেখে গেছেন। জ্যোতির্ঘ্র-কথিত ‘সম-বোমার শূন্য’ আত্মও উন্মাদিত হয়ে চলেছে। আরও হতে থাকবে। ছাপার কোনকরম চেষ্টা না করে, কাউকে টের পেতে না দিয়ে যিনি দশটি উপন্যাস ও শতাধিক গল্প লিখে গেতে পারেন, তিনি যে সাংঘাতিক মানুষ

অর্থনীতির ভূমিকা আলোচনার অবকাশ পাননি কেননা
....“সৌধরক পরিবেশ প্রায় নিশ্চিহ্ন” (পৃ: ৩০) তিনি অবশ্য
সঠিকভাবে চিহ্নিত করেছেন যে, “সামাজিকত্বের প্রয়োগত ব্যর্থতা
তার তাত্ত্বিক দুর্লভতা প্রমাণ করে না” (পৃ : ৬২)। এই বিচারে,
জনগণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঠিক ও ইতিবাচক পরিচালনার নিয়ন্ত্রিত
বাজার অর্থনীতি তার মননীয় তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক সম্ভাবনায়
সমর্থিত উজ্জ্বল এক বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। সবশেষে বলা
যায় মৈনাক রায়ের বইটি অমর্ত্য সেনের হাত ধরে সমকালীন

অর্থনৈতিক সমস্যাপুস্তিকে—যেমন সমকটন ও দারিদ্র—নিয়োগে
গোছনো বিস্তৃতভাবে বিতর্কের প্রচুরের যেখান থেকে উঠে আসে
সামান্যমানবের মানবা অথবা ব্যর্থতা এক সম্ভাবনাময় শতাব্দী এবং
একই সঙ্গে সহস্রাব্দের ভবিষ্যৎ ইতিহাস নিয়ন্ত্রণ করবে।

অমর্ত্য সেন—অধ্যাপক তারানাথ বর/নালন্দা প্রকাশনী,
ভূমলাঙ্গ, বাঁকুড়া/২০.০০

অমর্ত্য সেন—মৈনাক রায়/ম্যাডিকাল ইন্সপেক্টর, কলকাতা-১
৩০.০০

জীবনানন্দ স্মৃতি ময়ূখ শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়

জীবনানন্দ বাঙালির জীবনে এক অনতিক্রম্য নমুনাঙ্কিয়া।
এক আত্মচর্য মন—কেনন—করা শিল্পী ডাকের মতো।

‘রি-সেক’ এর যুগে আমরা ফিরে গাইছি, ফিরে পেতে চাইছি
যে-গান একদা আমাদের মন ভুলিয়েছিল। এই সূত্রেই বোধ হয়
হাওড়া গার্লস কলেজ পত্রিকার জীবনানন্দ স্মৃতি সংখ্যা ১৯৫৫-র
উজ্জল উচ্চারণ, জীবনানন্দ স্মৃতি ময়ূখ শৌখ-জ্যোতি ১৩৬১-২
সংখ্যার পরিবর্তিত নমুনাংক।

ভূমেন্দ্র গুহ সম্পাদিত জীবনানন্দ স্মৃতি ময়ূখ সংখ্যাটির
কব্যাবলি বিশ্রিত বিশেষ মলাট-জ্ঞানপটী এইরকম :

“ময়ূখ : জীবনানন্দ স্মৃতি সংখ্যা বেরয় ১৯৫৫-য়।
জীবনানন্দ ও বাংলা কবিতার অনুবাদী করেছেন তখন
ছিলেন সেই সংখ্যার উদ্যোগী। ময়ূখ কিন্তু আলোড়ন
তুলেছিল সেই সময়েই। তখনকার তরুণের আঙ্গ সূখী।
তবুও কোথাও এই সম্মিলিত উদ্যোগের জন্য হয়ে গেছে
স্মৃতি, ব্যাঘাতের কথা। এদিকে অনেকে শিশু মনেছেন
ময়ূখ পত্রিকার সংখ্যাটির কথা—সেখানে নি।

দিনে দিনে বৃদ্ধাশ্রয় হয়ে গেছে তা। আজ জীবনানন্দ
কল্যাণবোধে বৃদ্ধ প্রকাশিত হল সংখ্যাটি.... পাকার
প্রকাশকরা তো আজ শ্রীশ্রী, তাঁদেরও জন্ম উঠেছে
অনেক কাল পুথুর পত্রিকা প্রকাশকে গিয়েই। সময়ে
তখনও এসেও সেদিনের উত্তেজনা আর উৎসাহ জ্বলেন
নিতে চাইছি আমরাও। সঙ্গে তাই জুড়ে গেল, আগে
পেরে, সেই উত্তেজনার অব্যাহান, আর বাকি সব আগের
মতো।”

কী আছে ‘ময়ূখ’ এর এই ‘রি-সেক’-সংখ্যা? ‘আগে-পরে’-
মূল মধ্যাংশ? প্রায় তেমনই ভিন্নতা পুষ্টার এই পরিবর্তিত সম্বন্ধে

‘আগে-পরে’ আছে ৬২+৬২ পৃষ্ঠার সংযোগ। ‘জীবনানন্দ
স্মৃতি ময়ূখ’ এর মূল অংশ ১৪৩ পৃষ্ঠা। বহু অংশটি হস্তাক্ষর
রকুণ্ডিল থেকে মুদ্র হয়ে মুদ্রিত মুখ নিয়ে পাকার সমাজে আবিষ্কৃত
হওয়ায় যে অনেকের চক্ষুদ্বন্দ্বিত করবেই সেই পক্ষাঙ্গ সালে—
তা অকারণ ছিল না। এতদিন পরেও তার দিকে একনজর তাকালে
টের পাওয়া যায়। ‘দূসর পাত্তিসিধি’র হালকা পরিচ্ছদ; হস্তদ্বার
উপর রয়েছে রঙে ছাপা জীবনানন্দের যুবকচিত্রিত দুটি কবিতার
প্রতিশ্রুতি, হলুদ ভারি বসন্তে কাগজে উপরি পাওয়ার মতো
জীবনানন্দকে রবীন্দ্রনাথের হাতে লেখা চিঠি, জ্ঞানদ্বিরের পুস্তক
সুবিচিত্র একটি শোভন চিত্রপ্রতিশ্রুতি—এর মধ্যে স্মৃতিসংখ্যার মূল
উসকানিদাতা ‘পূর্ণাঙ্গ’ সম্পাদক সঞ্জয় ভট্টাচার্য অহুত স্বকল্পের
গম্বীর মন্ত্রণাবলি। প্রবন্ধ অংশে সংকলিত হয়েছে স্বয়ং জীবনানন্দের
রবীন্দ্র বিমর্শন রচনা, অক্ষিপ্তমুমার সেনগুপ্তের অন্তরঙ্গ জীবনানন্দ,
জীবনানন্দ—নুজ্ঞ অশোকানন্দ ও নুজ্ঞা সূচিহিতা দ্বারের
জীবনস্মৃতি বা কাছের জীবনানন্দ, বাণী রায় ও নীহাররঞ্জন রায়ের
অনুভূতিগম্ব ও ঐতিহাসিক মূল্যায়ন; আবুল কালাম শামসুদ্দিন,
স্বৈরাকর ভট্টাচার্য ও সমর চন্দ্রবতীর একান্ত নিমন্ত্রণ বা স্বকল্পিত
জীবনানন্দচর্য। কবিতা অংশের একদিকে আছে জীবনানন্দের
দুটি অপ্রকাশিত ইংরেজি-বাংলা কবিতা ও প্রকাশিত ‘সুভেন্দ্রা’
কবিতার সঙ্গে চিন্দামন দামপুত্র কৃত চিত্তাঙ্গী ইংরেজি অনুবাদ।
চিঠির অংশে যান হয়েছে চিঠির সঙ্গে জীবনানন্দের ঐক্যজালিক
মোহে অবিষ্ট কিছু কবি বা কবিতোপ্রাণীর কবিতার নমুনাও
এখানে পাওয়া যাবে। কবি অনুজা সূচিহিতা দাম ও ভূমেন্দ্র গুহর
নেতৃত্বে বা পরিচয়ে প্রস্তুত জীবনানন্দের প্রকাশিত ও অপ্রস্তুত
রচনার একটি প্রাথমিক পণ্ডি মূল অংশটিকে সমৃদ্ধ করেছে।—এই
হচ্ছে মূল পত্রিকা অংশের পরিচয়সংক্ষেপ।

সংযোজিত পরিশিষ্ট অংশে যান পেয়েছে সমকালীন বিজ্ঞা

পত্রিকা প্রকাশিত। জীবনানন্দ, Statesman, Amrita Bazar
Patrika, ‘সম্মিলনী’ জীবনানন্দের বিভিন্ন কাব্যের আলোচনা;
আনন্দবাজার, শনিবারের চিঠি, ভারতবর্ষ, যুগান্তর, বসুমতী,
কুড়িবাগ, শতভিষা প্রভৃতি পত্রিকা দুর্দীনা ও তাঁর মৃত্যুর সংবাদ
মোড়াবে হয়েছিল; এ ছাড়া প্রত্যেক সেন নামক কলিকৈ ‘মুদ্রিতগুণ’
তরুণ কবির সঙ্গে জীবনানন্দের পত্রবিনিময়ের চাক্ষুষ প্রতিশ্রুতি
এখানে স্থান পেয়েছে। ঐতিহাসিক কৌতুক চরিত্র্য করার জন্য
জীবনানন্দ স্মৃতি ময়ূখের মূল অংশ ও পরিশিষ্ট অংশের গুরুত্ব
অপরিসীম সম্বন্ধে নেই।

কিন্তু বইটি ভূমেন্দ্র গুহ লিখিত ‘জীবনানন্দ স্মৃতি ময়ূখের গম্ব’
অভিষেক পাড়া পাকারের সূচিা অনবদ্য রচনাটির জন্য মহাব্যতীর
হয়ে উঠেছে। গোচার দিকের এই লেখাটির মধ্যে রয়েছে লিটল
ম্যাগাজিনের একটি সংখ্যার নেপথ্যে কান্না ঘাম রক্তমিশ্রিত গ্রিন
(সেলার) রুমের অঙ্গল স্মৃতি। এটি না পড়লে পাঠক অনুভব
করতে পারবেন না কী করে একটি পত্রিকা হয়ে ওঠে বা করে
তোলা যায়। কত তাগ-বিত্তিকা, বাউলুপন্যাস, সাদারয়ে
মিথ্যাবাস, নির্দুর্গ রাত্রি, আচমকা বাহুরের অধিক উপাখ্যাকতায়

থিয়েটার নিয়ে ভাবনো মেঘ মুখোপাধ্যায়

থিয়েটারকে জাতির দর্পণ বলা হয়। কোনও জাতির
ঐতিহ্যের গভীরতা, চেতনার সূক্ষ্মতা, শিক্ষার স্তর
নানা দিকে তার উৎকর্ষতা, মননশীলতা, এবং সাম্প্রতিক যুগে
সেই জাতির আশাশঙ্কামণ্ডল-প্রশংসনার অভিমুখে টের পেতে হলে
তার রম্যকণ্ডে কাছ থেকে হতেই। রম্যকণ্ডের বাইরে গড়ে ওঠে
মুখ্যত নাট্যকার-সুদীর্ঘ-সাহিত্যতাত্ত্বিকী ব্যক্তিত্বের সঙ্গে
সংযুক্ত। বিশ পঞ্চদশ বিজ্ঞান আর প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতির প্রভে-
দে প্রচুর নাট্যের পূর্ণতা উঠতে নেপথ্য কলাবিদ্যের ভূমিকাও ক্রমে
ক্রমে নাট্যের সাথে উঠতে। এরা সবলেই জনসাধারণের কাছে
থেকে বা প্রত্যুত সম্মান-সমাদর পান। কিন্তু কোনও জাতির
থিয়েটারের বিকাশ, সার্বিক সম্বলতার পিছনে আর জনসাধারণের
তার স্বল্পে এককালের ভূমিকার কথা সচরাচর আমাদের মনে
থাকে না কিন্তু মুদ্রণশক্তির আবিষ্কারের পর থেকে এবং স্বরকায়াল
আর সাময়িকপত্রের প্রচার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই মানুষটির ভূমিকা
গুরুত্বপূর্ণ এবং ব্যাপারিষ্ঠ হয়ে উঠে। ইনি হচ্ছেন নাট্যমালোচক ও
নাট্যতত্ত্ববিদ। সমৃদ্ধ ঐতিহ্যসম্পন্ন কোনও জাতির থিয়েটার-
ইতিহাস এই ব্যক্তিকেই বাক দিয়ে রচিত হতে পারে না। কখনও
রম্যকণ্ডের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে গিল্পে ব্যক্তিই এই ভূমিকা পালন

করেন যেমন ময়ূখের মতো জীবনানন্দ-সংখ্যা। কী করেন সেদিনের
অন্যনা উল্লিষ্ট হোককরা? জীবনানন্দের সম্বন্ধে একটি সংখ্যা বের
করতে তাদের কেউ পড়ার বই বিক্রি করেছে, বন্ধুর মায়ের নিউত
স্নেহকে একত্রণ্ডিত করে টাকা হাতড়েছে, অভিজ্ঞতাবাদের কাছে
মিথ্যা কামুনি ঘেয়েছে, প্রেসের নোনা সোম্ব করে শেষ পণ্ডিত ব্রাহ্ম
ব্যাক গিয়ে রক্ত দিয়েছে। কুকের রক্ত আর চোখের জল দিয়ে
বোনা ভূমেন্দ্র গুহের এই নেপথ্য কাহিনীটি আমদের লেগা পাওনা।
মুহুরের দিনে আমরা সম্পদের স্বপ্ন দেখি, প্রেসের দিনে স্মৃতিচারণ
করি মুহুরের। পরিণত সন্তানের স্বীকৃতি আর সম্মানের দিনে মা কি
ভোলে জননীস্বপ্নার কথা। বাঙালিকে সঠিকভাবে চিনতে হলে
শুধু শ্রুতি পাঠাবি, দুর্গাপূজা আর মূর্তিবল নয় বোধহয় তার লিটল
ম্যাগাজিনগুলোয় গ্রিনকমের দিকেও তাকানো দরকার। ময়ূখ
জীবনানন্দ স্মৃতি সংখ্যাটি শুধু জীবনানন্দ নয় সেবিকেও ফিরিয়ে
দিয়ে আমাদের মুখ।

জীবনানন্দ স্মৃতি ময়ূখ শৌখ-জ্যোতি ১৩৬১-২ (পরিমার্জিত
ও পরিবর্তিত সম্বন্ধে)—সম্পা : ভূমেন্দ্র গুহ / নয় উদ্যোগ,
কলকাতা-৬/৩০.০০

করেন (যেমন শিল্প মিত্রকে দেখেছি এই চতুর্দশের পুষ্টার সংখ্যার
পর সংখ্যা নাট্যচর্চা নানা দিক দিয়ে লিখে যেতে; অন্যর উৎকল
নব্ব, ভাঙ্গল সেন, কুমার রায়, বৈশাখি লক্ষপুত্র প্রভৃতির নাম
কলিতে হতে); কখনও বা তিনি প্রচেষ্টা জড়িয়ে থাকেন না,
নাট্যনির্মানে অংশ নেন না বহু নিমিত্ত নাট্যের বিচার-বিদ্রোহের,
যুক্তি-তর্ক-প্রমাণ-স্মারিত দেখানোর স্ফূর্তি লাভ করে তাঁর
কাল আর এইভাবে রম্যকণ্ডের বাইরে বৃহত্তর সমাজে থিয়েটারের
সম্বন্ধে অহাধ নির্মাণ করে চলেন তিনি—নাট্যপ্রয়োগে যুক্ত
শিল্পী কীংবা দর্শনসাধারণ, আত্মী মন থাকলে, লাভনান হতে
পারেন এর লেখা থেকে।

কিন্তু বসুর সাম্প্রতিকতম গ্রন্থ ‘থিয়েটার ভাবনা’ পড়তে গিয়ে
এক কথায়গিল মনে এল, কাল্য গুপ্ত চার দশক ধরে বাঙালির
থিয়েটারের সমালোচক ও ঐতিহাসিক রূপে তিনি যে অগ্রণী
ভূমিকা পালন করে চলেছেন এই বইটির প্রকাশে তা উজ্জ্বলতর
হল। তাঁর থিয়েটার ভাবনা’ আমাদের অনেক দিক দিয়ে ভাবতে
সক্ষম গড়ে কোনও সম্বন্ধে নেই। এ জাতির বইয়ের কোনোয় যেমন
হয়, ‘থিয়েটার ভাবনা’র নিবন্ধগুলি গুপ্ত তিন দশক ধরে লেখা
নানা সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। ছড়িয়ে থাকা লেখাগুলি

চেট্টা রয়েছে। কিন্তু নাটকের আগাগোড়া বুঝতে অসুবিধে হয় না বাস্তব হৃদয় ছিল প্রাচীন। কৃষক সমিতি নেতা রামাবল্লভ সাহা থেকে শুরুর শুরু হয় এম এল এ শীতলেন্দ্রনাথ রায়চরণ স্কলেই যেন প্রায়-নির্বাক্ষা ধাপাবাহা উঠে। কলকাতার দর্শকেরা বুঝ বুঝি যেন এসে ধীরে ধীরে ছিটকে, হেঁচকেও। মজা হল, নাগরিক পরিশীলনবাহীন এই সব বাবা-বিদ্ধ মানুষেরাই কিছু গরু হেঁচকি মেরে ধরে সেই সরকারকে ক্ষমতায় বহাল রেখেছে, যে-সরকারের প্রসাদটুকু মহানাগরিক বুদ্ধিভীষীরা কেবল 'সগার পাছাত হাথা' বুঁদে ফেলেতে অর্ডাঙ্ক।

রবীন্দ্রনাথের বাসে তিন্তাপারের বৃত্তান্ত দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিল সেই বাহাভরই এই রবীন্দ্রসম্মান থেকে উৎপন্ন দলকে তাদানা হয়েছিল সরকারি প্রচেষ্টায়। পি এল টি'র তৎকালীন নাট্যপ্রযোজনা 'টিনের তলোয়ার' এর মত-অসুস্থতি বাতিল করে দিয়েছিল সর্বজনীন মনোজ্ঞ। এই বছরের ২৬ আগস্ট ফাঁরে পি এল টি'র 'মুংগুসের নগরী' করতে দেখনি যুব কংগ্রেসিরা হাফা করে। তারপর বাসভক্তের প্রথম বাসভট্ট সরকার ক্ষমতায় না আসা পর্যন্ত নাটক ও নাট্যকীর্তির ওপর আক্রমণ খেতেই চলে ছিল ক্রমাগত। জঙ্গির অবস্থায় তা ভাব্যবহ রূপ নিয়েছিল।

প্রতিনিধি নাট্য আন্দোলনের এই ধারাবাহিকতার অপেক্ষাকৃত অনুকূল পরিস্থিতিতে একটি রাষ্ট্রনৈতিক নাটক উপস্থাপনের দমিষ্ণ যখন নাট্যকার নিয়েছেন তখন প্রাসঙ্গিক দায়টুকুও তিনি স্বীকার করেন না তা কি হতে পারে? বিশেষ করে সে নাট্যকার যখন নিত্যশ্রম নবীন নান। বহাং বলা যায় যে মধ্য-ভিত্তির যখন মনোখাশাখায় বাঙালি নাট্য ভগতে ইতিমধ্যেই বেশ 'স্বাধীন'। অন্তত তাঁর 'কারিগরগণ' সে কথাই বলেছে। এমনভাবেই সুবিধাত ১৯৩০ নাট্যকার-নির্দেশক অল্প মুখোখাশাখায়ের প্রজা (মজা ১৯৩৬) হওয়ার সুবাদে তিনি দৌড় শুরু করেছেন বেশ কিছুটা এগিয়েই, কিন্তু সেটা বড় কথা নয়।

পুন্ডরীক 'গুপ্তধার' জনাই সন্মান ড্রামা আকারেই ইন্ডিয়া পুরস্কার, প্রমথেন বহুদায় শ্রুতি পুরস্কার, এশিয়ান পোট্টেস্ট শিরোনাম পুরস্কার ও পলিশমেন্ট নাট্য আকারেই পুরস্কার পেয়েছেন ১৯৯৯। সে বছরেই আমেরিকার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বার্নার্ড কলেজের আন্তর্জাতিক নাট্যবিভাগে 'দ্য মেক্সার টেকেন' নাটকটি নির্দেশনার দায়িত্ব পালন করেছেন। অভিনয় তথা নাট্যশিল্পের ব্রহ্ম ব্রহ্ম করেছেন পালিন ব্রিগ্গসট্রাট্ট, ছাড়াও কানাডা, জার্মানি, ইংল্যান্ড, বাংলাদেশ। বাংলার সমৃদ্ধ নাট্য ইতিহাসে 'গুপ্তধার' কোনও বিশেষ ভূমিকা দাবি করতে না পারলেও তরুন এই নাট্যনির্দেশকের যোগে তার উল্লেখ গুরুত্ব পেঁচেছে। তাকে ত কোনও সন্দেহ নেই। সেই অবস্থিতি থেকেই তিন্তা পারের রাষ্ট্রনৈতিক দায়িত্ব তিনি অস্বীকার করতে পারেন না। আর যখন সে কোনও বিষয়ই নয়, তখন বাঙালি নাট্যের প্রেক্ষাপট।

উৎপল দত্ত (১৯২৯-১৯৯০) যখন 'অসার' করেছিলেন তখন তাঁর বাসে মধ্য ভিত্তির বহাং, তারও আগে 'নীলমহল', 'ধান্যকী', 'নন্দা' প্রযোজনার সময় শব্দ মির (১৯১৫-১৯৯৭) এবং বিজন ভট্টাচার্য (১৯১৫-১৯৮০) দু'জনেই মধ্য উনতিপরের যুবক, মনোহর মির (১৯০৮) যখন 'মৃত্যুর চোখে জল' দেখিয়েছেন এবং সুন্দরদের প্রযোজনায় সে নাটকে অভিনয় করেছিলেন তখন তাঁর বয়স মাত্র একুশ বছর।

একটি নাট্য আন্দোলনার প্রসঙ্গে এই সব কথা বলার দরকার হয় না, যদি না সেটা দেশের রায়ের কালীনি হয়, কিংবা তখন মুখোখাশাখায়ের গুপ্তসংস্কৃতায় সুমন মুখোখাশাখায়ের সুমন না হত অথবা 'ভেতনা' প্রযোজনা না হত। কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় একটি সুবিধাতারী নাগরিক দর্শকগোষ্ঠীর তৎকালিক মনোহরসম্মান জনাই কি তাঁরা এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বিষয় সম্পূর্ণ এক নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উপস্থাপিত করলেও? যাস, কেননা এতদুটাই? নই কি আত্মবিশ্বেষণের নমুনা? নিরুৎসাহ কিছু লোককে হাসির খোরাক জোগানো?

আন্দোলনা নাটকে তিন্তাপারের বৃত্তান্তটাই এইমত :

ক্রান্তির হাটে সরকারি আমলা সূহাস তার দল নিয়ে কাম্পন বসিয়েছে জমিহা মাগজোক করে। যে অভিজাতর ঠিকজাত থেকে বেঝা যায় মোটামুটি তিন্তা পারের যে মোটামুটি তারা মাগে সেগুলি হল ২১ নং ইংসপালি, ৮০ নং আনন্দপুর, ৮৫ নং গাজলজোবা, ৮৬ ও ৮৮ নং আমলগাঁও, ৮২ ও ৮৩ নং ইংসপালি... এর মধ্যে জমির বেশ কিছু অংশ এখন তিন্তার গর্তে। ক্রান্তিরহাটের লুণ্ঠা কাম্পনকে কেন্দ্র করেই যেন তিন্তাপারের বহমান জীবনে টেউ উঠতে শুরু করে। জোবায়াদ গদানায়, বাস জমির বহমানর সূহাসের, জা মাদানের মালিক মক্কাব, চরমালী মানুষেরা সবাই নিজে নিজে অধিকার কারার কাছে সক্রিয় হয়ে ওঠে। জানা যায় সূহাস না কি নকশাল ছিল একসময়, সে জোবায়াদের আতিথ্য গ্রহণ করে না এবং জমির মালিকানা নিরুত্ক করার আগে মাদারি করে দেশে নেয় মালিক হুল চলাপেত জানে কি না। এর মধ্যে একমাত্র ব্যতিক্রম বাফার। অর্থাৎ ফরেষ্টারচর বাফার কর্মন। আরও সুনির্দিষ্টভাবে 'সূহাস'র চেহারা কুড়ালিয়া কোটা বাফারক ফরেষ্টার চর বর্ণন। সে 'গদানায় বেহা'। আত্মপ্রত্যয় প্রদানকালে বাফার একান্তে যোগনা করে-'মোর একতন ড জমি আছিল।' অপরভাষে ফরেষ্টার গো-লো-লো। কোক এতটা পাঠায় গদানায় জোবায়াদ। হুল বহল বিজন সাগর ওরা। মুই হাটুপা আছিল বহলক মজা। অ্যালায় আর নাই। মোর নামকান কাটা বাও। এ জমিহা লিখি বাও গদানায় জোবায়াদের নামহ। বহল গার, বিজন গার, হালায় গার, ধান গার-জমি তো তারো হ্যা নাগে হুজুর। তাও জমিহা মুই, ফরেষ্টার বাফারকর্মন, ছাড়ি কিছু। লিখি বাও, শ্রী ফরেষ্টার চর বাফারকর্মনক এই জমিহে উচ্চের মোগে গো এ এ ই হা।

এবং ঘটনা হল এই নাটকের কেন্দ্রীয় বিষয়। জমি ও জমির

অধিকার। জমি কার? জোতদারের, কৃষকের, মজুরের, ভূমিপুত্রের, না কি তিন্তার? এই প্রশ্নকে গিহেই তিন্তা পারের জীবন বৃত্তান্তে আলোড়ন ওঠে। তিন্তার চরিত্রে বাফার। যার না আছে কিছু বাবা নেই। তার অশ্রা কানোও প্রশ্নও নেই এ বিষয়ে। কেউ তাকে এ সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসাও করে না। সে প্রকৃতিতে সন্তান। তার জীবনে একমাত্র পুত্রম তার ডেউনিয়া গদানায়। এম এল এ-র সশ্রম আশ্রাশ্রয়িত সে জানায় 'মোর মাওপন ড গদানায়ের আছিল, কাঠকার্য করিবে, খোয়া খাইত আর ফরেষ্টার ভিতরে থিয়া শুরা কট ডাণ্ডাপালা কুড়ি আনিবার লাগিত।' শিত্তিপলিহাট, পশুৎ শেণীসর্বধ প্রায়-জড়কুড়ি বাফারকে নিরুপর্ণের প্রতীক হিসাবে উপস্থাপিত করে আত্মপ্রতিবিম্বিত এম এল এ-র নেতিবাচক অন্তিমক প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা শেষ পর্যন্ত কিছু ব্যর্থ হয়েছে। বাফার হারিয়ে গেছে অনিশ্চয়ের যাত্রায়। কলসোলের সন্ধানে সূহাস তার বিলীন হয়েছে। সে এটাও এক ধরনের উচ্চপরিষদ অর্থহীনতা বা নিম্নপরিষদে স্মৃতিশ্রুতির শরিক হতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত প্রাস করে ফেলে তার। তার অন্তিমটাই মুছে ফেলতে চায়।

সূহাস নকশাল ছিল, অসহ্য সং। আপাতত সে সরকারের সংহার প্রতিজ্ঞার একনিষ্ঠ সেবক। একটু যেন ডাবের মোহের থাকে। মাদে মাদে যন্ত্র টপটপ শেখ-বন্দুক, মশাল এসবের। বন্দুকের নল শক্তির উৎস কথ্যটা দীঘ্য দেখা না নতুন কোনও যন্ত্র দেখায়, বাঝা যায় না। তবে আলাকা হিসাবে সে যে বেশ অসমর্থ গোয়েছে তা বাঝা যায়। তার অস্বীকৃত কর্মী প্রিয়নাথ চোখের নিমেষে তাকে, আরও সুনির্দিষ্টভাবে সরকারকে, সাড়োকাঠি কিয়েনে। যে নিমেষে কর্মচারীর এই সহজ চুরিটা ধরতে পারে না সে জোতদারের জমি চুরি করে কী করে? আর যদি সে বুঝেও সেটা মনে নিয়ে থাকে, তবে বুঝতে হবে সে কেবল বন্দুকই নয়, দুর্নীতিপায়ও। অতঃ নিরুজ জায়গাটা ঠিক রাখতে দুর্নীতিক প্রয়োগ দেখে তার বড়। এত কিছু প্রমাণের জন্য সূহাসকে নকশাল হিসাবে প্রচার করে যেওনাটা বুঝ দরকার ছিল কি? তবে পার্লামেন্টে সূহাসের খোঁজা কিনা মিলিয়ে নেয়ায় একটা সহজ উদ্যোগ সে অবিস্মার করে। এম এল এ-কে বিনয়নসতার অভিজ্ঞতা জিজ্ঞাসা করে জানতে পারে সেখানে নাকি দান্য ঘুরে পায়। ঘুর কাটার পরে শো যে পর্যন্ত এম এল এ-কে মাদাজাস বলে ফেলতে হয়েছে। এমন তিনি ভাতের বলে লিখি রাখেন।

কলসো গল্প এ রকম নানা বীর ধরে এগোতে থাকে। মোটের ওপর আমরা জানতে পারি এম এল এ-টা ক্ষমতালোভী ধাপাবাহা, গদানায় জমিহাটো বাফার, রাধাবল্লভ ও তার সঙ্গীসংস্কারী কৃষক সমিতির পুনরাবিলি নিজে আসলে ধাপাবাহিক করবে, চরমালী মানুষেরাও ধাপাবাহা-প্রথমে রিসিগের নৌকা দিতে অস্বীকার করছিল, টাকার গড়া পেয়ে সেমন সব চট করে পাণ্ডি শেষ, শ্রোলা কৃকসমিতির সেবাটি সেমানা ধাপাবাহা-টুক করে সেমন

শাসকদলের শাঁচ বস্তা সিংহাট কেলেছাচির কেবল কথার জালে তিন্তার জলে ভাসিয়ে দিল। কাম্যাপুরি আন্দোলন তা শ্রেয় জোতদারেরে যথাস্থ্যে পুষ্ট ধাপাবাহি।

বিষয়গুলি কি এতই সোজাসামটা? শোহিত মানুষের আপাত-অসংলগ্ন আচরণের মধ্যে কোনও যন্ত্রনা নেই? অস্তিত্বের সম্বন্ধ নেই? টুক টুক থাকে লড়াই নেই? নাগরিক নিরাপত্তায় সে সব অনুভব করা যায় না বুঝি, কিছু তা নিয়ে যেকোনো বাফার অধিকার আসে কী করে? জাতিভাতার আন্দোলন ঠিক না বৈঠক তা নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে, কিন্তু এরকম বিতর্কভাবে সমস্যাটি তুলে ধরাটা কোনও সুচরিত্র পিচির? একদিকে বাফারকে নাকচ বানানো হবে অন্যদিকে কাম্যাপুরি আন্দোলনকে একটা খিঁকুপ যন্ত্রাশ্রয় হিসাবে তুলে ধরা হবে এই বিচারিতা কি আসলেই ক্ষমার বোয়োগ? স্বেচ্ছাবলী মানুষদের অস্তিত্বের সম্বন্ধ নিয়ে এমন সঙ্গরসিগার উদ্দেশ্যটি বাঝা গেল না।

এই নাটকটির কেন্দ্রীয় চরিত্র বাফারের শিত্তিকের উত্তরাধিকার বহন করার কোনও দায় নেই। সে পূর্ণহৃদে এক নারীসংস্রাম। অতন নাটক নারী চরিত্র আত্মভাবের অনুপ্রাণিত। তিন্তা পারের জীবন বৃত্তান্ত এমন নারী বিবর্তিত হয় কী করে! বিশেষ করে মোটামুটি প্রায় অর্ধেকই যখন এখনও পশ্চিমে তো নারী! এবং বিশ্বকুলে যত বহল-ভ্রম প্রতিনিয়ত নিয়ন্ত্রিত হয় তার মূই তৃতীয়াংশই নারীর অবদান। এই নাটকে নারীচরিত্র এসেছে জনতার মুখর একটা অংশ হিসাবে। বানজিরা মনুষ্য যখন চর ছেড়ে নিরাশ্রয় আত্মপ্রের সন্ধানে পালাচ্ছে তখন শাস্য কটা এলো চরমার পুঁজ নারীকে দেখা গেছে। আরও পুঁজকরা। এবং সবচেয়ে বড় গদানায় এসেছে যখন শ্রমিকরা তিন্তার বীর তৈরি করছে তখন সেই হুই নারীরা একমুখ রঙিন কাম্যাপুরি কিনে, কল আনানায় মুখ দেখতে দেখতে গোটে রও লাগাচ্ছে। সিংহভাণ্য প্রমদায়িনী মনসীর প্রতি যোগ্য সম্মান প্রদর্শন করে।

পুন্ডরীক নিয়ে নাটকটিতে কিছু পরীক্ষানিরীক্ষা আছে। চরিত্রানুগ সাজসজ্জা করানোর চেষ্টা আছে। বিশেষ করে অনেক অভিনেত্রীও একদিক চরিত্রে অভিনয় করেছেন বলে প্রয়োজনটাও অনুভব হয়েছে বেশি। সুতরাং প্রথম সূহাস এবং বি এস এম অধিকারের ভূমিকায় অভিনয় করতে কোন আশ কলসোলে এমন যে চোট কেনো মূলশক্তি। রূপসজ্জা হিসাবে সামগ্রিকভাবেই রবি মোহরকে প্রশংসা করতে হবে। কিন্তু বাফারকে নিয়ে 'পরীক্ষাটি' একটু বেশিমানা হয়ে বাওয়ায় চরিত্রটির স্বকীয়তা নষ্ট হয়েছে। প্রথমে তাত 'জিহানার্ন-কাট', বৈঠক এবং তার অশ্রাশ্রয়ী পরিত্র যন্ত্রক দৃশ্যানন নির্দোষ নিরুপস্থ ও পঞ্চদশমান যাদান টিডির মডেলদের কথা মনে পড়িয়ে দিচ্ছিল। আত্মপ্রতির প্রদানকালে উজ্জল আলোয় বাফার নেভাবে তার প্রায় ভল্লভ 'পালার প্রাক্ষত' শরীর প্রদর্শন করছিল তাকে ফ্যানড জিহানাররা

ভেদেই শক্তি, সৌন্দর্য, আঙ্গিক এবং ছন্দের সমন্বয়ের কথা। বিশ্ব নির্বাচনে নতুন ব্যাক্যন দিয়েছে বিষয়বস্তুকে, নতুন ভাবে উপস্থাপিত করেছে। নতুন শব্দ দিয়েছে নির্গত অর্থকে প্রকাশ করার জন্য। "মীরা" নৃত্যটিই ধরা যাক। মীরার বিদ্যাহাজি মঞ্জুরী সমাজের রীতিনীতি ও ধর্মের বিরুদ্ধে নারী বিদ্রোহ হিসাবে উপস্থিত করেছে। মীরা, তার ব্যক্তিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় উদ্যমী যখন কিনা কলকাতা না তাকে সম্পূর্ণভাবে আত্মত, আচ্ছন্ন করেছে। কোনও বাবা, সামাজিক কোনও বন্ধন তাকে আটকে ফেলতে পারেনি। সীতারতা বা বুদ্ধ তার সহজ নিজের লক্ষ্যভিত্তিক হতে পেরেছিলেন মীরার পক্ষে তা সম্ভব হয়নি সে নারী বলে। মঞ্জুরী বেশ উত্তেজিতভাবে, কখনও বা মীরার অপরূপ বাগীর ও সালিতাম্বর গীতির বিদ্যাসম্পর্কে অভিভূত হয়ে কখন দিয়েছে, আলোচনা করেছে মীরা প্রোডাকশনের আগে, নৃত্যানুষ্ঠানকাল এবং পরে। যে কোনও নৃত্যানুষ্ঠানের আগে বা পরে নানা রাজসি জিহবার ক্ষুধার দৈন্যতাম আমরা যারা কাছে পিঠে হিসাল। এ সব সময়ে সাক্ষাৎকাল বিদ্যাস নিয়ে আলোচনার ফলে রবীন্দ্র শতাব্দীকি উপলক্ষে ফিলাডেলফিয়া প্রোগ্রামে মঞ্জুরীর এবং তার দলের নৃত্য শিল্পীদের পোশাকের আমূল পরিবর্তন হল। এ বিষয়েও সে নানা পরীক্ষানিরীক্ষায় বাধ্য থাকত। একবার শিল্পীদের কাগজগুটিকি সিন্ধের পোশাকের পরিবর্তে বাজার তালের শাড়ির পোশাকে ফেঁকে উঠত হল। প্রতিটি নৃত্যনটী নৃত্যনভাবে পোশাক ও অন্যান্য সজ্জার নিয়াম এবং স্টেজসজ্জার পরিকল্পনা হয়েছিল। কেউ কেউ তার সমালোচনা করেছে "চণ্ডালিকা" নৃত্যনটীকে "তোমারি মারির কন্যা" নাম দেওয়াতে আমরা মনে হল "তোমারি মারির কন্যা" মধ্যে চণ্ডালিকার যে পুণ্ড্রপ্রকাশ হয়েছে তাতে এ সমালোচনা অপ্রাসঙ্গিক এবং অপ্রয়োজনীয়। মঞ্জুরীর প্রতিটি কণা বা তৈত নৃত্যে তখন নৃত্যনটী একটি বকুলা প্রকাশের প্রচেষ্টা থেকেছে যেটির ভিত্তি তার গভীর তথ্যানুশীলন, ব্যক্তিগত শিল্পানুভবনা এবং নৃত্যশিল্পশৈলী। এনিক থেকে তার নৃত্যে দীর্ঘকালীন আধ্যাতিক ও অন্যান্য কথামের প্রভাব তার নৃত্যে নব্বয় দানের নন্দনাত্মকী প্রতিষ্ঠা করেছে। কন্যা রঞ্জিতাবীর তির্যাকন এই নন্দনাত্মকী বহননতা ব্যাহত হতে পারত। তবে ভালোবাসা গিহস্ত নৃত্যশিল্পীদের সক্রিয় প্রচেষ্টায় আলা করা যায় এ শৈলী বহনমান থাকবে।

শেনলিগভেনিয়ার লকহেইডেন ইউনিভার্সিটিতে মঞ্জুরীর নৃত্য প্রচারণা হয়। ইউনিভার্সিটি আধ্যাতিক ও অন্যান্য কথামের প্রথম প্রুট ছিল, "এই কন্যে stunning beauty কে কোথায় পেলে?" মঞ্জুরী মনে হেসেছে। রঞ্জিতাবী কুঁচকে বাড়িস করেছে এ সব কথা। মুখা কথা ওর সৌন্দর্য দেখেছিল তাই আঙ্গিকে হসে জারিত হসে কুঁচকি আঙ্গিকে হসে কুঁচকিত রূপ। মঞ্জুরীর মতো মূহুরে ভাব প্রকাশনার এমন ব্যক্তনা ও গভীরতা বৃহৎ কম দেখা যায়।

বরাবর লেখাপড়ায় ভাল মঞ্জুরী কন্যামি ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় ভূয়সী প্রদর্শনা পেয়েছিল। বিশেষ সম্মান (Distinction) দিয়ে যেখনি পি এছ.ডি ডিগ্রি শেল কলমিয়া থেকে বকরী প্রথম সোনার সৌভাগ্য হাজিরি আমায়। আধ্যাতিক ও সতীর্থেরা বললেন "she received her Ph.D. with flying colour!" মেথা ও বুদ্ধিমত্তার বহুল পরিচয় দিয়েছে মঞ্জুরী। নৃত্যর, সমাজতত্ত্ব এবং ইংরেজি ও বাংলা সাহিত্যে তার মজীর অনুরাগ গিল। আলাপআলোচনা এবং যোগজোবার এটার সুস্পষ্ট পরিচিতি পাওয়া গেছে। ধর্মীয় আচারঅনুষ্ঠানে মদ্যপুত্রি মেয়েদের ভূমিকা নিয়ে মঞ্জুরী একটি গবেষণা করে। এ বিষয়ে একটি গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে। বোলপুরের গ্রামে কনটেকিট ইউনিভার্সিটির অধীনে শিশুদের সমাজীকরণ (socialization) রীতি নিয়ে যে গবেষণা করে সেটিও পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়েছে। মঞ্জুরী পলপ্রথার উপরও একটি গবেষণা করেছে। ২০০০ সালের বইমেলার "আমরা সে চিত্র মনে" বইটি প্রকাশ করেছে। এতে লিপিবদ্ধ হয়েছে নৃত্যশিল্পী হয়ে গড়ে ওঠার কাহিনী। নানা চেপের সঞ্ছতি এবং বহু বিদ্যক শিল্পী ও সঙ্গীতকারের সংস্পর্শে তার শিল্পীজীবনের বিকাশ। রবীন্দ্রনাথ সজ্জক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে ট্যাগোর সোসাইটি প্রকাশিত প্রবন্ধ সংকলন "On Tagore" পুস্তিকায়। তার বহু প্রবন্ধ নানা পত্র পত্রিকায় স্থান পেয়েছিল। লেখাপুলি ইংরেজি এবং বাঙলা দুটি ভাষাতেই।

মঞ্জুরীর সম্পর্কে যারাই এসেছে তারাই মুগ্ধ এবং অভ্যস্ত হয়েছেন তার রঙবরং সবেজনশীল কাব্যপদকমে। সে খুবই আলাপ প্রিয় এবং বহু বসন্ত। একটা ভিনার পাণ্ডিত্যে একবার তাকে কবিতা হয় নিউইয়র্কের ড. রোজ ম্যাক্গির্লিশ পাশে। পাণ্ডিত্য মেয়ে মঞ্জুরী বেশ ফোড়ের সঙ্গে বলল, "রোজকে আমার পাশে বসতে দিয়েছে। আমি কখনও কখনও ভালবাসি, আজ একবারও মনু বসতে পারিনি।" অমনি এবং ওর হুমি পার্বতীকুমার ছেলেছিলেন। কিছু বসতে এতটুকু অসুবিধা হয়নি যেমঞ্জুরীর বাচনকমতা এবং বিষয়ভিত্তিক অল্প চাপা পড়ে যা থেকেই রোজ ম্যাক্গির্লিশ মায়েরন চেয়ে। অনুভূতির অপ্রকাশ যে কষ্ট আছে সেটা বৃহত্তর আমদের সঙ্গে লাগেনি। বক্তা হিসাবে ও নৃত্যভিত্তিক আলোচনার এবং অন্যান্য সভাসমিতিতে প্রচুর প্রশংসা পেয়েছে মঞ্জুরী।

অনেকেই হাত জানে না যে পেশোয়ার নৃত্যশিল্পী হলও রজনশিল্পে মঞ্জুরীর অসুখ দক্ষতা। বহুরার বহুরূপে শোনা যেতে তার আভিভাবার তৃপ্তী প্রদর্শনার সঙ্গে অসম্ভাব্য মায়ার কথা। সোবানও বেশি-বেশি মায়ার পরীক্ষা চলেছে। কখনও বা অফ্রিকান, কখনও বা মধ্যপ্রাচ্যের মাযার আবার কখনও বা ইটালিয়ান, ফরাসি, চিনা, ইন্দোনেশিয়ান অথবা গাই মাযার পরিবেশন করেছে মঞ্জুরী। এর সঙ্গে যুক্ত থাকত চেপের মেথোলাই বা দরোয়া সজ্জার রীতি। কখন একবার গোয়াল শিঠের কথা

উল্লেখ করেছিলাম মনে নেই। সেবার ওদের বাড়িতে গিয়ে দেখলাম মঞ্জুরী শিটে করেছ। "কী বানাছো?" জিজ্ঞেস করলাম মূহু হেসে, উত্তরে জানাল "গোয়াল শিটে!" একটা আশ্চর্য হয়েছিল যে নৃত্যরচনা, নৃত্যপরিবেশনা, পড়ানো ইত্যাদির ব্যস্ততার মধ্যেও সে তিন-বছর ইচ্ছার পূর্তির কথা ভেবেছে। আমেরিকান বহু "বেথ" এর বাড়ির পাণ্ডিত্যে উজ্জসিতভাবে প্রদর্শনিত হিম্মতিময়র মালাইকারি রেখা পরিবেশন করতে থাকা করেনি। বিশেষিরা ভারতীয় রজনশিল্পের স্থান পাশে এটাই কাশ্য। ওর কলকাতার বাড়িতেও কল সে-শি-বেশি-বেশি বহুবাক্যর অভিজ্ঞতাভাগ্যে মঞ্জুরীর মায়ার স্থান পেয়েছে। আমেরিকায় থাকা কালেও একই কথা, মায়ার প্রদর্শন।

মঞ্জুরী অনবয়স থেকেই নারীবাদী। আগেই উল্লেখ করেছি যে মেয়ে বলে কাশ ডিস খুত হবে এর প্রতিবাদে সে বাড়ি ছেড়ে গালিয়ে যায় মন বংসর বসলে। বক্তব্য শব্দটি। মেয়ে বলেই এ কাশ মেয়ে কেন? সে গাছে চড়েছে পাত্রে, বাগান করতে গারে সে সব নর কেন? বিবাহের পর হুমি মুক্ত হয়েছিলেন, নিজের নামের পাশে সরকার না লিখে মনু চাকী লেখা কেন? তখন প্রশ্ন হল "তুমি নামের পাশে চাকী লিখবে কি?" পার্বতীকুমার কথাতা আগে কখনও ভাবেননি। যা হোক মীমাংসা হল চাকী সরকার পদবিতে। পার্বতীকুমার নিজেরও নারীবাদী ছিলেন। ঘরের কাজে অংশ নিতে পারতেন মেয়েও আগন্তি ছিল না। আমেরিকার নারীমুক্তির (Women's Lib) মহামিছিলে ১৯৭০ সালে নিউইয়র্কে মঞ্জুরী এবং পার্বতীকুমার যোগ দিয়েছিলেন। মঞ্জুরীর "নৃত্যশিল্পী" পোশাক কাশে বাধা আসেনি হুমির কি মেয়ে। উৎসাহ এবং সেয়ে। বিরের পর ছোট বই বা নতুন বই হিসাবে হেঁশেরে তার নেওয়ারায় প্রচেষ্টা একেবারে সফল হয়নি। মায়ারে তার আগন্তি বই। কিছু মেয়ে বলে মনু "সেইসেই জীবনপাত" এ বাধাখণ্ডন তার আগন্তি। শুরুরাড়ির সবাই আরও অস্বস্তি হলে যখন সে হুমির এটো পাত প্রচার প্রচার বণ্ডিত করে দেয়। দ্বীপ এটো পাত প্রচার। হুমির প্রচার প্রচার মেয়ে মেয়ে হা হা, মেয়েদের সে প্রচার সেওয়া অনায়া। মনু কথায় নয় নিজের জীবনে সে নারীবাদ মেয়েছে সবসময়। হুমির মৃত্যুর পর শোকাবহু মঞ্জুরী কখনও বৈবাহিক সাজ নিয়ে মেয়েকে ভাবেনি। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য উদাহরণ চাই সামাজিক অন্যান্য আকাবেরের বিরুদ্ধে।

নৃত্য নিয়ে পড়ার সময় মন, আমেরিকায় শৌচর্যর সঙ্গে সঙ্গেই সে নিজে দেশের নারীমুক্তি আন্দোলনে যুক্ত হয়। ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রসংঘ আয়োজিত আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলনে ভারতের

প্রতিনিধি হিসাবে মঞ্জুরী যোগ দেয়। তখনই তার মনে দূরতরভাবে দানা বেঁধে নৃত্যের মাধ্যমে মেয়েদের প্রতি সমাজের অন্যান্য অকার্যকর তুলে ধরার ভাবনা। আমেরিকা ছেড়ে আসার আগে আমাকে বলে "দেশে আসুন, আমরা সবাই মিলে নারীমুক্তির কাজে গণে যাই।" দেশে ফেরার পর মঞ্জুরীর কাছেই কলকাতায় প্রকাশিত নারীর সমস্যা ও সমাজে তার অবস্থান সবুজ বহু বই পত্রের বোঁধ পেলাম। কলকাতায় বিভিন্ন ব্যক্তি এবং সংস্থা নারা মেয়েদের সঙ্গে কাজ করেছে, মেয়েদের সবুজ লিখেছে বা আলোচনা করেছে মঞ্জুরী প্রত্যক এবং পেরোক্তভাবে তাদের সকলের সঙ্গে জড়িত ছিল।

মঞ্জুরীর সবুজ কলতে গিয়ে তার মানবিকতার এবং সবেজনশীলতার উল্লেখ করতেই হয়। হুমি ও কন্যা নিয়ে সুখী পরিবার। কিন্তু অনেরা মুখশূদ্রনা, কখনা তাকে সব সময় কাকের করেছে। নিউপলরন, নিউইয়র্কে বহু বিশদ পত্র ছাড়াই তার কাছে আসত মন ফুলে মুখশূদ্রনা প্রকাশ করেছে। কখনও কাউপলিং দিয়েছে অবস্থার বিয়োগ্যন করে। কখনও বা অর্থ সাহায্য দিয়ে, কখনও বা উপস্থিত সংস্থা বা ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে তাদের সহায়তা করেছে। দেশে ফেরার পর বাড়ির ছোট কাজের মেয়েটিকে পড়ানো করিয়ে, উৎসাহ পাতা খুঁজে বিবাহের ব্যবস্থাও করেছে। বাড়ির মালির ছেলে এবং মেয়ে দু'জনেরই এবং কাজের মেয়ের শিশুনি ছোট্ট ভাইপাটির ভাল মুখে ভালভাবে পড়ার ব্যবস্থা করেছে। বিবাহপূর্ব প্রায়ের কয়েকটি মেয়ের অর্থসহায়না এবং তাদের ছেলেমেয়ের পড়ার শিক্ষাও নারন রেখেছে। অনেক মেয়ে, হস্তশিল্পকার, শাড়ি ও অন্যান্য জিনিস বিক্রয়ত পুখু ও পেটুকে অর্থসহায়না করতে নানা ভাবে সহায়তা করেছে। আসল কথা, বৃহত্তর বা বিদেশে কোনও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি মঞ্জুরীর কাছে এসে তার দক্ষিণ্য না পেয়ে কখনও ফিরে যাননি। নারীমুক্তি চিহ্না ও মানবতাবোধকেই আর একটা প্রকাশ। "বেশি কিছু তো করতে পারিনি। যতটা পারছি করছি", মঞ্জুরী বলত।

নৃত্যের জগৎ থেকে, শিল্পের জগৎ থেকে, সমাজের মাধ্যম থেকে প্রাপক, সম্মানানুর্প একটি প্রতিভার অকলে অসময় হল। এটা আমাদের জাতীয় ক্ষতি। স্বাধীদায়কন, উজ্জ্বল, বুদ্ধ, মনর একটি মানুষকে দেহোত্তীর্ণ এ সুন্দর জীবনটিকে অবিনশ্বর বলা যায় বিনা দ্বিষায়।

লেখক: বিশ্বাস

প্রসঙ্গ : রবীন্দ্রনাথ ও রামকৃষ্ণ

[illegible]

নাচ শ্যামা, তালে তালে ॥

ক্রনু ক্রনু ক্রনু বাজছে নপুর মদু মদু মধু উঠছে গীতিসুর,
 বলয়ে বলয়ে বাজে খিনি খিনি তালে তালে উঠে করতালিধনি

নাহু শ্যামা, নাচ তবେ ॥

आणक मेख

চতুর্থ মাঘ-চৈত্র ১৪০৬ সংখ্যা ‘বদীন্দ্রনাথ ও রামকৃষ্ণ’ শীর্ষক নৈদিক শ্রী অমরেন্দ্র নাথ্যুপ রায়ান্ন চট্টোপাধ্যায়ের লেখা দেবেন্দ্রনাথ-শ্রীরামকৃষ্ণ সাধাব্যবসার সম্পর্কিত বীরাব্রাহ্মণের যেটি সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন:—“নিবেদিতার মুখের ভাবে বদীন্দ্রনাথ যে অসমুদ্রি দেখছিলেন, তা নিবেদিতার নিজের, শ্রীরামকৃষ্ণের নয়।” চিত্রিতচিত্র দেবীদামাণ্ডা যে-ভাবে বাগদপ্তর করেছেন “নিবেদিতার মুখের ভাবে অনুমান করেছিলেন যে তিনি সঙ্গীত-রাগ” তা থেকে এমন কথা নিঃসংশয়ই বলা যায় কি না সন্দেহ। কারণ, এই চিত্রিত ‘বদীন্দ্র’ বলতে বদী নিবেদিতারই বোঝানো হয়ে থাকে, তা হল অমরেন্দ্রনাথভাবের প্রসঙ্গ, তাই, শ্রীরামকৃষ্ণের বাল্যকাল থেকেই বদীন্দ্রনাথ ও শ্রীরামকৃষ্ণের সাধাব্যবসার সম্মান নিবেদিতার উগ্ৰহিত থাকার প্রসঙ্গ ওঠে না, কাজেই তাঁর মুখের ভাব থেকে এই অসমুদ্রি অমরেন্দ্রনাথের অর্থই বাক্য, আর তা সম্পর্কিত নিবেদিতার অসমুদ্রিও তাই বলাই যে কি। এই চিত্রিত সম্পর্কিত বৈদ্যকৃষ্ণকবর আগে ‘দেশ’ পত্রিকায় বিদ্যুদ্ভাস রায়ের এক বিবরণে দেখে এই প্রতীতি নিয়েই আলোচনা করেছিলাম। শ্রীদাম্যুপ এই প্রতীতি এড়িয়ে যেমন বলেন, দেখা গেল না। বদীন্দ্রনাথ কি অবস্থানকে ‘নিবেদিতা’ নামটি দিয়েছিলেন, বা নিবেদিতার সঙ্গ তেওঁর এ-বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন? এ সব কি স্পষ্ট নয়।

এর পর এ-বিষয়ে শ্রীদামপুস্তকের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলো দেখা
 যেতে পারে, যথা : (১) ওয় সাধারণতঃর সমস্ত দেহাভ্যন্তরীণ
 শ্রীদামকৃষ্ণের “খ্যাতি” দ্বারা নবোদয়কার ক্রম ব্রীহদ্রথ্যন্য
 কেউ কেউ বললেও “খ্যাতি” শব্দকম কিছুই হয়নি। বরং শ্রীদামকৃষ্ণের
 তরুণ উজ্জ্বলিত প্রাক্কণর এক উৎসাহই (যেখানে শ্রীদামকৃষ্ণ ও
 তরুণ ব্রীহদ্রথ্যন্য উজ্জ্বলিত ছিলেন।) দ্বারা তাঁর প্রতি “সাধারণতঃর
 সৌন্দর্য্যকৃষ্ণ” দেখানো হয়নি, (২) রামানন্দকে লেখা “চিঠি”
 যেহেতু শ্রীদামকৃষ্ণের কোনও ব্যক্তিগত সমালোচনা নেই, তাই
 ওই চিঠি প্রকাশ করলে “অন্যায় ও কেতাবজ্ঞ” কোনজনও
 আশাবাদেবের সম্ভবনা ছিল না এবং (৩) প্রতিপাদ্যের সত্যতা
 দ্বারা কেউই তরুণ শ্রীদামকৃষ্ণ সম্পর্কে বিবর্তন থেকে ব্রীহদ্রথ্যন্য

শেষ জীবনে অনেক দূরে সরে এসেছিলেন।
 শ্রীদামপুত্রের প্রথম প্রতিপাদ্যের মন্তব্যটি মনে হয়, রোলা-
 প্রভাবিত। কারণ, ২ মে, ১৮৮৩ তারিখে নন্দনবাগানে ব্রাহ্মসমাজ
 মন্দিরের যে-উৎসবে বাইশ বছরের যুবা রবীন্দ্রনাথ সমবেত
 ব্রাহ্মসমাজ পরিচালনা করেন, সেখানেও উদ্যোক্তারা যে

গ্রীষ্মকক্ষকে 'যদি যত করিবা' নিমন্ত্রণ করে এনেছিলেন, 'কথাত' চতুর্থ বার তাঁর স্পষ্ট উল্লেখ আছে। তন্মতের সঙ্গে গ্রীষ্মকক্ষের স্মৃতিয়া প্রসঙ্গ কখনো, আত্মিমা-ভুলে গানো সেউ কেউ তাঁর সামনে বসে উপদেশও শোনেন—মহাবি দেবেজনাথের অন্তঃকরণে গানোনিয়া বোলাওও গ্রীষ্মকক্ষের। সুতরাং এ পর্যন্ত জানাচ্ছে কেনে বলা যায় যে সেদিন গ্রীষ্মকক্ষের প্রতি 'অসৌজন্য' প্রকাশ করা হয়েছিল, যা তাঁর প্রতি অবজ্ঞাসূচক কোনও মতামত বা মতামত ছিল। স্টেটসম্যানের এমিটে উৎসবের যে বিবরণ বের হয়েছে, তদন্তেও গ্রীষ্মকক্ষের উল্লেখই করা হয়েছে। গ্রীষ্মকক্ষের সর্বস্বত্ব করা সন্ধ্যারের ভিত্তিতেই ওই সন্ধ্যাপ্রতি বিবরণী ছাপা হয়ে থাকবে, তাই গ্রীষ্মকক্ষের প্রতি সৌজন্য পূর্বন করা নয়। চাইলেই এই সন্ধ্যার তাঁর উল্লেখ থাকবে কি না সন্দেহ। কেবল উৎসবেরশেষে ভোজন ও আশ্রয়নের সময় ও বাড়ি ফেরার ছাড়া গ্রীষ্মকক্ষকে গাড়ি তাঁর ঘরের ব্যাপারে গ্রীষ্মকক্ষের বিদ্রোহ অনুমানোনা সৌচিত্রিয়ছিল, তবে ঋতুপূর্ণের বিবরণ শেষে মনে হয় যে গ্রীষ্মকক্ষ নিজে এতে বিশেষ ক্ষুব্ধ হননি। এটি অবশ্যই অবশ্যই জানিও তাঁরা—পরিকল্পিত বা ইচ্ছাপূর্ণ কোনও ব্যাপার নয়। গ্রীষ্মকক্ষের সন্দেহ মনে ও পথের জটিলতায় মনে থাকে তাকে যথোচিত শ্রদ্ধা না করার মতো ব্যাপারের সন্দেহ এটি তুলনীয়। নয়—বল্য অনেক প্রাক্তি সেদিন গ্রীষ্মকক্ষের উপদেশ দাখিলিয়ে নেন।

শ্রীদামপুত্রের দ্বিতীয় প্রতিপাদনী সম্পর্কে বিচার করতে গেলে রামানন্দকে লেখা বহিঃস্মরণীয় ১১২১ সালের চিঠির সত্যভাবে অনুধাবন করা প্রয়োজন। এতে শ্রীদামক্ক সম্পর্ক সোচ্চারিত অস্বাভাবিক বা নড়া হলেও মনে রাখতে হবে—চিঠিটিতে আগাগোড়া শেষেদেখের দ্বারা তাঁকে মধ্যস্থিত করা না করার বাপ্যারতির শঙ্কায় মুক্তি বাড়া করার চেষ্টা হয়েছে। এর মতই এসেছে, পিতার 'শ্যাম' নামের অস্বাভাবিকভাবে সন্ধানের পাত্রি (স্বাভাবিক) প্রদত্তি স্বর্থনেন সুর আর শব্দ ও বৈকর ধর্মভেতর (মহা একটির প্রদত্তি শ্রীদামক্ক) ভাবোদঘাতন ওয়া এমটি ও কাহিনির অসম্ভাব্যতা ও বুলতা সম্পর্ক অজ্ঞান্য। এর মধ্য দিয়ে প্রত্যাকভাবে শ্রীদামক্ককে সমালোচনা না করা হলেও শেখাবাৎনে যে ভাবোদঘাতন করা হয়েছে তেও ওয়া সন্দেহের সূচক্যপ নেই। তা ছাড়া শ্রীদামক্ক সমালোচিত হতেও পিতার একটির অনুগামী হলে ও কেশবচর্যের শ্রীদামক্কের প্রতি প্রভা ও তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার ইহাৎস মনে রাখলে শ্রীদামক্কও পরোক্ষভাবে ইহ সমালোচনার লক্ষ্য হলে পড়েন না কি? ইহ চিঠি সে-সময়ে প্রকাশিত হলে কোনও 'কোজাক্ক আলোচনেন'র সম্ভাবনা ছিল না—এ কথাও তাই প্রহেযাগ্য কি না সন্দেহ।

লেখকগণ তৃতীয় প্রতিপাদ্য গ্রন্থমঞ্চ সম্পর্কে স্বীকৃতিস্বার্থে মনোভাবের পরিবর্তন, যথা সম্পদে লিখিত। ১৯৩০-৩১ সালে গ্রন্থমঞ্চের পুনর্বিন্যাসটি উল্লেখ করছি বিনিময়বোধের কতিপয় এ বক্তব্যের প্রকাশিত প্রকাশসূচক মনোভাবের উল্লেখ করেছেন। এ ছাড়াও তিনি লিখেছেন যে 'মালক' উদ্দেশ্যে রক্তাধার নামটির যে-রামকল্প-ভিত্তি' দেখানো হয়েছে 'তাতে কোনও নামটির দূরত্ব থাকে, অতীতের আভাষা যথায় যথায়' (পৃ: ১৯৮) এখানে মনে রাখতে হবে যে এখানে উদ্দেশ্য থেকে লেখকগণ নিজস্ব ভাবের হিমালয় করত একটি সমগ্রই হতে হতে পালিত। প্রকাশ্য বিবৃতি যা অপরোক্ষে লেখা বক্তব্য যা অপরোক্ষে কতিপয়ও সহজবোধ্য কারণে প্রকৃত মনোভাবের ওপর প্রায়ই সামাজিক সীলনগত প্রভাব পড়ে যথার্থ ভাবেরই ফলস্বরূপ যায়। মনেও বদনশী ব্যক্তির প্রকৃত চেহারা অস্বাভাবিক অধিকৃতভাবে বহু দূর পড়ে ব্যক্তিগত চিত্রপটে যে আলাপ্যপরিচয়।

এখন কি গুরু গুঠে, শীমপুত্রের শিয়ারা যে-ভাব ভাব করে
গুরু, এমনি কি অত্যাচারীরা গুরু করে থাকে, সে-সম্পর্কে
শীমপ্রাণের মনেভাব কীরকম ছিল। গুরুবাব, অর্থাৎ গুরুকে
হিসাবজবানে পূজা বা তরুণ অলৌকিকতা আরোপ কীরকম
কিন্তুকার্যে গুরু করতেন। তিনি বিধি উপাসনার
আস্তরিকতাবৎ অশুশ্রব করতেন, কাশীতে বিন্মনাথের মন্দিরে
পূজা করার জন্য তিনি তপসী সন্ন্যাস দেবীও তর্কনা করত
ছিলেন, তাঁর কার্যে অন্যায়বাদের গুরুণে বিধি উপাসনার গুরু
করা বা তাঁর সামনে ভোগদান আরতিবি ব্যবস্থা যে কার্যত
বিষপুঞ্জের দানি, সে তো প্রাকৃতিক বাস্তব। এ সম্পর্কে
হরিদাসের মতে তিনি থেকে প্রসঙ্গিক হইয়া উঠুক করাই।

(ক) ইন্দ্রিরা দেখীকে লেখা ১০-১-৩০ তারিখের পত্র :
 “...মৃতের ভার বহন করতে আমি উৎসাহ পাইন—অতীতের
 প্রতি প্রদত্তা রাখা উচিত কিছু যেন সে অতীত নয় তার সঙ্গে এমন
 ব্যবহার করাতা অসম্ভব। ফলেও মঠে নেওড়া বিবেকানন্দের ছবি
 সামনে রেখে অশ্রু বিকসিত শোণে দুঃখ হা—এই স্বরচিত
 বাঁধে বিবেকানন্দের অসম্মান হতে না।...”

(খ) বিমলাকান্ত রায়চৌধুরীকে ২৩-১২-৩৭ তারিখে লেখা চিঠির অংশ:

“ধর্মের যে বিকটা বিশ্বকৃতাবে আধারায়িক, সেখানে ধর্ম
বুপ্রতি। যে বিকটা প্রাকৃতিক সেদিক ইতিহাস বা বিজ্ঞানের বিচার
করেই।...আধুনিককালে রামকৃষ্ণ পরমহংসকে ভক্তেরা
ভগবানের অবতার বলে ধরে নিয়েছেন তাই বলে তাঁর জন্ম ও
মৃত্যুটানা এবং তাঁর প্রতিদিনের দেখাযাত্রা অলৌকিকতার আরোপ
করতেই হবে এমন কোনো কথা নেই।...বিজ্ঞান বিরাধিতা
নাস্তিকতা কারণ স্বয়ং ঈশ্বরের সৃষ্টি বৈজ্ঞানিকতা—বিজ্ঞানেই তাঁর
লীলা অবজানিক হলেনমানবীয়তা।” উই পুরকে ভজনে করা

যায় যে, গ্রীষ্মকালের জীবনকথায় উল্লিখিত একটি 'অলৌকিক' ব্যাপার নিয়েও রবীন্দ্রনাথ লম্বা মন্তব্য করেছিলেন ইন্দিয়া মেবীকে লেখা চিঠিতে: "... টাকা ছুঁলেই রামকৃষ্ণ পরমহংসের ঘেরকম সর্বদা আক্ষেপ উপস্থিত হ'ত, কলম ছুঁতে গেলেই আমার সেরকম হয়।..." (২-১২-১৯২৫) লেখা সম্পর্কে তখনকার মানসিক বিকৃতা বোধাত্মক যিয়ে রবীন্দ্রনাথ এই উপমা ব্যবহার করেছিলেন।

১৯৩৬ সালে গ্রীষ্মকালের শতাব্দিকী উপলক্ষে বাণী ও বক্তৃতা মেবার আমন্ত্রণ রবীন্দ্রনাথকে জানানো হয়েছিল বেঙ্গলের রামকৃষ্ণ-সম্মেলনের তরফ থেকে। এর আগে যেতা প্রবৃত্তি ভাবেই রবীন্দ্রনাথ বক্তৃতা মধ্য এককে প্রকাশ করবার সাধনার প্রসঙ্গে ভারতের নানা মহাযাত্রার সঙ্গে গ্রীষ্মকাল ও বিবেকানন্দের নাম করেছেন ('পথ ও পাথর' থেকে শ্রী দাম্যন্তের নিবন্ধেও উদ্ধৃত)। সুতরাং অনুরোধের বেলা লেখা কবিতায় আর বক্তৃতায়ও গ্রীষ্মকাল সম্পর্কে তাঁর ওই পুরনো ও সাধারণ দীক্ষিতকৃত পুনরুজ্জীবন করতে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ বাধ্য ছিল না। প্রতিমাঞ্জনা ও শক্তি-উপাসনার জন্য গ্রীষ্মকালের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের স্বাভাবিক যে বিরোধ, তা তাঁর শেষজীবনে দূর হয়েছিল বা দূর্য্য পেয়েছিল—এমন কথা বলা যেত, যদি গ্রীষ্মকাল-শতবর্ষে আয়োজিত ধর্মসম্মেলনে তাঁর ভাষণের যে-অংশ শ্রীদাম্যন্ত উদ্ধৃত করেছেন, বা যে-অংশ করেননি, তার কোথাও মূর্তি-উপাসনার অনুকূলে তাঁর সামান্য দীক্ষিত ও উজ্জ্বলিত হত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ওই বক্তৃতার প্রথমার্ধে পরমহংসমন্দের ভাষণের উবারতা, সরলতা ও বহুরূপে মধ্য ভারতের চিরন্তন একসাধনার জন্য শ্রদ্ধাবিবলনের অতিরিক্ত কিছু বলেননি। পুণ্য তা-ই নয়, বক্তৃতার শেষ অংশে (যা আলোচ্য চিঠিতেও উজ্জ্বলিত হত) রবীন্দ্রনাথ তাঁর কটাক্ষ করেছেন সেইসব নিবন্ধে উদ্ধৃত হযনি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কটাক্ষ করেছেন সেইসব নিবন্ধে উদ্ধৃত হযনি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কটাক্ষ করেছেন সেইসব নিবন্ধে উদ্ধৃত হযনি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কটাক্ষ করেছেন সেইসব নিবন্ধে উদ্ধৃত হযনি।

এই শতাব্দিকী বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথ গ্রীষ্মকাল সম্পর্কে দৃষ্টান্ত বলেছিলেন, তা'ও যে স্বতঃপ্রসঙ্গিত হয় নয়, একরকম ভাবে পড়েই—তার প্রমাণ রয়ে গেছে তাঁর সমকালের চিঠিতে। এরকম হয়ে পড়ে 'প্রজ্ঞা নিবেদনের' দৃষ্টান্ত অবশ্য রবীন্দ্রনাথের জীবনে আরও আছে। ১৯২৫ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনর দেহান্তের পর রবীন্দ্রনাথ পুর রবীন্দ্রনাথ ও ঘনিষ্ঠ প্রশান্ত

মহলানবিশকে লিখেছিলেন যে, যদিও চিত্তরঞ্জন তাঁর প্রতি নিরন্তর অপ্রচা প্রকাশ করেছেন, তবু তাঁর কাছে যেসব লোক এ-সময় কিছু শোকবার্তা আনা করে। তাই তিনি চান চিত্তরঞ্জনর বাড়িতে গিয়ে তখনই 'যথানিহিত অভিশ্রুচন' প্রকাশ করতে তা হলে পরে সভাপতিত্ব ইত্যাদির 'বালাই' থেকে অব্যাহতি পাওয়া যাবে। আমার জানি যে চিত্তরঞ্জন সম্পর্কে ছন্দ দুটি কবিতা রচনা করে ও তাঁর শ্রদ্ধাবাসরে সংক্ষিপ্ত বাণী পাঠিয়েই রবীন্দ্রনাথ রেহাই পেয়েছিলেন 'সভাপতিত্বের বালাই' থেকে।

গ্রীষ্মকাল-শতবর্ষেও রবীন্দ্রনাথের রচিত বাংলা কবিতাকটি 'উদ্ভাষন' আর তাঁরই বহুপ্রকাশিত ইংরিজি পাঠটি 'প্রসূদ্ধ ভারত' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু এতেও 'সভাপতিত্বের বালাই' থেকে তিনি রেহাই পাননি—রামকৃষ্ণ-শতাব্দিকী উপলক্ষে আয়োজিত ধর্মসম্মেলনের পঞ্চম দিনের অধিবেশনের সভাপতি হিসাবে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে তাঁকে ওই ভাষণটি পাঠ করতে হয়েছিল (৫ মার্চ, ১৯৩৭), এবং তাঁর পক্ষে এই কারণে তিনি 'অসম্মত' বলে মনে করেছিলেন। হেমন্তবালা মেবী এক সমসাময়িক চিঠিতে বেঙ্গলের সন্ন্যাসীসংঘের এই অন্তঃস্থত তাঁর আমন্ত্রণের উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ লেখেন: "...বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা দায় নিয়েছি, ছাত্রদের সমাবেশের দিন বক্তৃতা করতে হবে...হাতো বেগুড়েও আমকে টানবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি যেমন অসম্মত, বেগুড়েও তেমনি। আমার নামটাকে নিয়ে সবাই আপন আপন চাক বানাতে চায়, কাটি পড়ে আমারি পুটে।..." (২-২-১৯৩৭)

এরই সমসাময়িক কালে যমী শ্যামানন্দের 'গ্রীষ্মকাল কাবালহরী' বইটির ভূমিকা লেবার অনুরোধ রবীন্দ্রনাথের ওপর এসে পড়ে। এখানেও দায়সারা ভাবে দুটি মাত্র বাস্তব রবীন্দ্রনাথ বইটি সম্পর্কে লেখেন:—

"হাজার যথার্থ মূল্য সরল ভক্তির, ততকরা ইহা প্রত্যাশার্বক প্রথন করিবেন।"

(৪-১-৩৮) ইত্যাদি, কিন্তু সহজবোধ্য কারণেই গ্রীষ্মকাল সম্পর্কে তিনি একটি কথাও উচ্চারণ করেননি। তাই গ্রীষ্মকাল সম্পর্কে তাঁর শ্রদ্ধার অভিব্যক্তি সর্বদাই যে রকম স্বতঃস্ফূর্ত ছিল না, এতে কোনও সন্দেহ নেই, এবং গ্রীষ্মকাল সম্পর্কে তাঁর পূর্বের মূল্যায়ন থেকে 'অনেক দূরে সরে আসার'ও প্রমাণ নেই। অদম্যি

অলকরন বসুচৌধুরী
জামশেদপুর-৬

ENJOY Arambagh's chicken

SERVED FRESH-N-CHILLED
WITHIN MINUTES OF YOUR ORDER
FROM ANY OF OUR EXCLUSIVE
COUNTERS AT CALCUTTA

ARAMBAGH HATCHERIES LIMITED

59B, CHOWRINGHEE ROAD, CALCUTTA-700 020
DIAL : 240-2179/2760/1930/0873. FAX : 91-332474137
Sales Offices. 351 5037/350 3089